মুণ্ডকোপনিষদ্

স্বামী ভূতেশানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

মুণ্ডকোপনিষদ্

স্বামী ভূতেশানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

[হে] দেবাঃ (দেবগণ), কর্ণেভিঃ (=কর্ণৈঃ, শ্রোত্রসমূহের দ্বারা) ভদ্রম্ (কল্যাণবচন) শৃণুয়াম (শুনতে যেন সমর্থ হই); [হে] যজত্রাঃ (যজনীয় দেবগণ), অক্ষভিঃ (=অক্ষিভিঃ, চক্ষুর দ্বারা) ভদ্রম্ (সুশোভন দ্রব্য, পুষ্পাদি) পশ্যেম (দর্শন করতে যেন সমর্থ হই); স্থিরৈঃ (দৃঢ়, অচঞ্চল) অঙ্গৈঃ (হস্তপদাদি অবয়ব) [এবং] তনূভিঃ (শরীরের সহিত [যুক্ত হয়ে আমরা]) তুষ্টু বাংসঃ (আপনাদিগের স্তব করে) দেবহিতম্ (প্রজাপতির দ্বারা বিহিত, অথবা দেবকর্মে রত) যৎ (যে) আয়ুঃ (জীবনকাল) [তাহা] ব্যশেম (যেন প্রাপ্ত হই)। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক)।

হে দেবগণ, আমরা কর্ণসমূহের দ্বারা যেন কল্যাণ-বচন শ্রবণ করি; হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষুসমূহের দ্বারা যেন শোভন বস্তু দর্শন করি; দৃঢ় অবয়ব এবং শরীর-বিশিষ্ট হয়ে আমরা যেন আপনাদিগের স্তব করে দেবকর্মে নিরত আয়ু প্রাপ্ত হই। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ভূমিকা

মুণ্ডকোপনিষদ্ অথর্ববেদের অন্তর্গত বিভিন্ন উপনিষদের অন্যতম। 'মুণ্ড' শব্দটির অর্থ মুণ্ডিত মস্তক। মুণ্ডক শব্দের দ্বারা মস্তক থেকে কেশ অপসারিত করা বোঝায়। এই নামের তাৎপর্য হলো এই উপনিষদের দ্বারা অবিদ্যা-কার্য ও সর্বপ্রকার ভ্রান্তি জীবাত্মা থেকে অপসারিত হয়। ভ্রান্তির মূল কারণ অজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এই অজ্ঞানের নাশ হয়। এজন্য এই উপনিষদের বিষয় ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানের আদি উৎস বেদ যা অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন ব্যক্তির রচিত নয়। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রবক্তা ঋষিরা এই জ্ঞানের স্রষ্টা নন, অনাদি পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদের তাঁরা দ্রষ্টা এবং প্রবক্তা মাত্র।

উপনিষদের প্রারম্ভে এই প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছে যে, 'কাকে জানলে সমস্ত জগৎকে জানা হয়ে যায়' এবং উত্তরে বলা হয়েছে, 'এক ব্রহ্মকে জানলেই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানা হয়ে যায়' —কারণ, সবই ব্রহ্মের কার্য। কারণকে জানলেই কার্যকে জানা হয়, যেহেতু কারণ থেকে কার্যের অতিরিক্ত কোন সত্তা নেই। প্রসঙ্গক্রমে সেই ব্রহ্মের স্বরূপ, সেই জগৎরূপ বিবর্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তির উপায় বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে। সকল উপনিষদেরই বিষয় এই ব্রহ্মজ্ঞান এবং অজ্ঞান থেকে মুক্তির উপায়রূপ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য যত্নবান মুমুক্ষু ব্যক্তিরাই ঔপনিষদজ্ঞানের অধিকারী। প্রয়োজন অবিদ্যার নিবৃত্তি। যখন মুমুক্ষু কোন ব্যক্তি সংসারের প্রতি বৈরাগ্যবান হয়ে সর্বত্যাগরূপ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন তখন এই উপনিষদোক্ত বিদ্যার অভ্যাস তাঁর অভীষ্ট-সাধনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়রূপে পরিগণিত হয়। সমগ্র মুণ্ডকোপনিষদের এই তাৎপর্য বুঝতে হবে। মন্দবৈরাগ্যবান জিজ্ঞাসুরাও এই গ্রন্থের অধ্যয়নে লাভবান হবেন, কারণ এই প্রকার অধ্যয়নের দ্বারা তাঁদের বুদ্ধি মার্জিত হওয়ায় পরবৈরাগ্য লাভে তাঁদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

মুণ্ডকোপনিষদের সূচনায় ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায় প্রবর্তকদের পারম্পর্য বর্ণনা করা হয়েছে। গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মা থেকে এই বিদ্যা আগত। সম্প্রদায়ের দ্বারা বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়, এই বিদ্যা যে শ্রেষ্ঠ তার কারণ স্বয়ং ব্রহ্মা থেকে এই বিদ্যা চলে এসেছে।

উপনিষদ্ প্রথমেই বলছেন এবং শঙ্করাচার্যও বার বার প্রতিপন্ন করেছেন জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর বিরোধী— 'বিদ্যা-কর্ম-বিরোধাচ্চ'। মনে রাখতে হবে, কর্ম বলতে শঙ্কর সকাম কর্মকেই লক্ষ্য করেছেন। বেদে যেসব সকাম কর্মের বিধান আছে, ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় নির্দিষ্ট প্রণালীতে যেসব কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকেই শঙ্কর সকাম কর্ম বলেছেন। সেই কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের যে অত্যন্ত বিরোধ, শঙ্কর নানা যুক্তি দিয়ে তা দেখিয়েছেন। প্রথমতঃ, জ্ঞানের দ্বারা মানুষ জানে যে, সে অকর্তা আর যার কর্তৃত্ববোধ নেই তার জন্য কর্মের বিধান হয় না। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের দ্বারা মানুষ কামনাশূন্য হয়ে পূর্ণত্ব লাভ করে, আর কামনা না থাকলে কর্মের প্রবৃত্তি হয় না। তৃতীয়তঃ, কর্মের বিশেষ কাল নিয়ম আছে যা জ্ঞানের নেই, তাই জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর বিরোধী। শঙ্করের দৃষ্টিতে কর্মের অর্থ— বেদবিহিত সকাম কর্ম, এটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। যদি নিষ্কামভাবে কর্ম করা যায় তাহলে তাকে কর্ম আখ্যা দেওয়া যাবে না— 'ন তৎ কর্ম'। একজন ফলাকাঙ্ক্ষা করে একটি যজ্ঞ আরম্ভ করল, যজ্ঞ অনুষ্ঠানকালে তার মন থেকে যদি ফল কামনা চলে যায় তাহলে সে যজ্ঞটি সম্পন্ন করল নিষ্কামভাবে। এটি তখন কর্ম পদবাচ্য হলো না।

নিষ্কাম-কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। জ্ঞানী ব্যক্তি লোককল্যাণের জন্য যে কর্ম করেন তা নিষ্কাম-কর্ম। গীতায় ভগবান বলেছেন—

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।' (৩।২২)

—ত্রিলোকে আমার কিছু কর্তব্য নেই এবং অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্তু কিছুই নেই, তবুও লোককল্যাণের জন্য আমি সর্বদা কর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছি। এই নিষ্কাম-কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের বিরোধ নেই। অনেক সময় আমরা এই ভুল করি যে, যিনি জ্ঞানী তিনি পূজার্চনা যাগযজ্ঞাদি কর্ম করবেন না। শুধু তাই নয়, তিনি কোন কর্মই করবেন না, করলে দোষের হবে— এইরকম একটি সাধারণ ধারণা হয়ে গিয়েছে। একবার উত্তরকাশীতে এক সাধু কলেরা রোগগ্রস্ত হলে সাধুরা সেই স্থান ত্যাগ করলেন কারণ রুগ্ন সাধুটির সেবায় মন দিলে ধ্যানের বিক্ষেপ হবে। কর্ম সম্বন্ধে ধারণা এমনই বিচিত্র! জ্ঞান

ও ভক্তি সম্বন্ধেও অনেকের মনে এই রকম ভুল ধারণা রয়ে গিয়েছে। উপাসনায় ঈশ্বর ও আমি এই পৃথক বুদ্ধি থাকছে আর জ্ঞানে ঈশ্বর ও আমি অভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর বিরোধী— এটি আমাদের বুঝবার ভুল। আমি যদি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হই তাহলে কে কার উপাসনা করবে? উপাসনা সেখানে সম্ভব নয়। কিন্তু যতক্ষণ কারও আমিত্ব রয়েছে ততক্ষণ জ্ঞানের অনুশীলন বা উপাসনার প্রয়োজন আছে, পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে আর অনুশীলনের বা উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। উপাসনার দ্বারা যদি আমিত্বের লোপ হয় তাহলে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির বিরোধ কোথায়? যতক্ষণ আমরা ব্যবহারিক জগতে রয়েছি ততক্ষণ জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম সবেরই অবকাশ আছে, একটি অপরটির বিরোধী নয়। শঙ্কর স্পষ্টভাবে বলেছেন, এই ব্যবহারিক সত্তাকে অবলম্বন করে সব উপাসনাদির বিধান আছে। বলছেন—

'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য, "অহম্ ইদম্", "মম ইদম্" ইতি নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ' লৌকিক এবং বৈদিক সবরকম ব্যবহার সত্য আর মিথ্যাকে জড়িয়ে করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ আরোপিত যে আমি, যে আমি উপাধি থেকে নির্মুক্ত নই, সেই আমির জন্য সাধনা, উপাসনা, লৌকিক এবং বৈদিক সর্বপ্রকার কর্ম। কিন্তু যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাঁর কোন সাধনারই অবকাশ নেই— 'তত্র...বেদা অবেদাঃ ভবন্তি' (বৃ. উপ., ৪।৩।২২)—তাঁর কাছে বেদ সব অবেদ হয়ে যায়। মাণ্ডুক্যকারিকাতে যেমন বলছেন—

'ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।।' (২।৩২)

—মনের নিরোধ নেই, জ্ঞানের উৎপত্তি নেই, বন্ধন নেই, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নেই, মুক্তিও নেই। বন্ধন সত্য হলে তবে তো মুক্তি হবে। যেখানে বন্ধনই সত্য নয় সেখানে মুক্তি কথাটিও প্রযোজ্য নয়। এই হলো পারমার্থিক সত্য।

কিন্তু সেই পারমার্থিক সত্যে যতক্ষণ প্রতিষ্ঠিত না হই ততক্ষণ ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ সবই করতে হবে। ব্রহ্মজ্ঞানের ধুয়া ধরে যেন না বলি যাগযজ্ঞ পূজা অর্চনাদি এসব নিম্নাধিকারীর জন্য। এটি শাস্ত্রের দোষ নয় আমাদের বুঝবার ভুল। তৎকালীন মীমাংসকদের সঙ্গে বেদান্তবাদীদের বিরোধের জন্য আচার্য শঙ্কর জ্ঞানের সঙ্গে সকাম-কর্মের বিরোধ বিষয়ে এত কথা বলেছেন।

মীমাংসকরা সমগ্র জীবনকে বেদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বেদের প্রমাণ দিয়ে বলছেন— 'যাবজ্জীবং অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ'— যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করতে হবে। সন্ন্যাস করবে কি করে? সন্ন্যাস আর যজ্ঞ একসঙ্গে হয় না। সুতরাং তাদের মতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ। তবে শাস্ত্রে কোথাও কোথাও যে সন্ন্যাসের কথা বলা হয়েছে মীমাংসকদের মতে সে হলো কেবল তাঁদের জন্য যাঁরা কর্ম করতে পারেন না, যেমন অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু অর্থাৎ যাঁরা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে অক্ষম। এছাড়া সকলকেই বিধিমত যাগযজ্ঞ করতে হবে, এক মুহূর্তও মানুষের যেন স্বতন্ত্রতা নেই, সবই বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। স্বামীজী বলেছেন, We sleep religiously, eat religiously, even sin religiously। আমাদের সবকিছুই ধর্মের অর্থাৎ বেদবিধির ভিতর দিয়ে করতে হবে।

এই বিধিবাদের বিরুদ্ধেই শঙ্কর বললেন, মানুষ স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ স্বরাট, তার এরকম পরাধীনতা কেন থাকবে? শাস্ত্রের অদ্ভুত শিকলে বেঁধে তাকে যে পরাধীন করে রাখা হয়েছে সে বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। এইজন্যই শঙ্কর এত তীব্রভাবে কর্মকে আক্রমণ করেছেন— 'বিদ্যা-কর্ম-বিরোধাচ্চ'। কিন্তু সব কর্ম নয়, শুধু সকাম-কর্মকে তিনি জ্ঞানবিরোধী বলে প্রতিপন্ন করেছেন। অথচ উল্টো বুঝে আমরা ভাবি সন্ন্যাসী অগ্নি স্পর্শ করবেন না, নিরগ্নি হবেন কারণ অগ্নিমাত্রই যজ্ঞের প্রতীক। যেন অগ্নি স্পর্শ করলে জ্ঞান বিনষ্ট হবে। এই যে বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রার্থকে বিকৃত করা তার ফলে আসল কর্তব্য যা তা হারিয়ে যায়। গীতায় বলছেন— 'স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ'॥ (৬।১) —যিনি নিরগ্নি সে ব্যক্তি সন্ন্যাসী নন এবং অক্রিয় ব্যক্তিও সন্ন্যাসী নন। সর্বকর্ম পরিত্যাগী নন, যিনি সর্ব কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগী তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। এইটিই শঙ্কর জোর দিয়ে বলেছেন।

যাই হোক, জ্ঞান বা উপাসনার ধারা যাতে শুদ্ধ থাকে তার জন্য সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রয়োজন। শুদ্ধ আধারের দ্বারা পরিবেশিত না হলে শাস্ত্রের তাৎপর্য সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হয় না, তাতে বিকৃতি প্রবেশ করে। যার ফলে ধর্মের নামে নানা অনাচার-ব্যভিচার চলে। সেইজন্য সম্প্রদায় রক্ষার বিষয়ে এত সতর্কতা।

যে পরম্পরাক্রমে এই ব্রহ্মবিদ্যা এসেছে এখানে তা বলা হলো।

—স্বামী ভূতেশানন্দ

মুণ্ডকোপনিষদ্

এক.

'ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্
অথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।।' (১।১।১)

বিশ্বস্য (নিখিল জগতের) কর্তা (স্রষ্টা) ভুবনস্য (উৎপন্ন বিশ্বের) গোপ্তা (পালয়িতা) ব্রহ্মা (পিতামহ ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ) দেবানাম্ (জ্যোতির্ময় ইন্দ্রাদি দেবগণের) প্রথমঃ (প্রধান হয়ে, কিংবা সর্বাগ্রে) সংবভূব (সম্যকপ্রকারে অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে, অভিব্যক্ত হলেন)। সঃ (তিনি) সর্ব-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্ (সকল বিদ্যার আশ্রয়) ব্রহ্ম-বিদ্যাম্ (পরমাত্মবিষয়িণী বিদ্যা বা ব্রহ্মার দ্বারা প্রোক্ত বিদ্যা) জ্যেষ্ঠপুত্রায় (জ্যেষ্ঠ-পুত্র) অথর্বায় (অথর্বকে) প্রাহ (বলেছিলেন)।

নিখিল জগতের স্রষ্টা এবং পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদের মধ্যে প্রথম ও সকলের আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে জন্মেছিলেন। তিনি অথর্বা নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সর্ববিদ্যার আকর ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেছিলেন।

—যিনি প্রথম অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি ব্রহ্মা। তিনি হলেন 'বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা'— নিখিল জগতের স্রষ্টা এবং পালয়িতা। এই ব্রহ্মা ধর্ম জ্ঞান ঐশ্বর্য বৈরাগ্যে সকলকে অতিক্রম করে যান, এইজন্য ব্রহ্মাকে প্রথম ও প্রধান বলা হয়েছে— 'ইন্দ্রাদিনাং প্রথমো'। তিনি গুণের দ্বারা প্রথম ও সকলের আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে জন্মেছিলেন। 'ন তথা, যথা ধর্মাধর্মবশাৎ সংসারিণোঽন্যে জায়ন্তে'— অপরাপর সংসারিগণ যেরকম ধর্মাধর্মপরবশ হয়ে জন্ম লাভ করে তিনি সেভাবে জন্মাননি। কারণ শ্রুতি বলছেন— 'যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ' —যিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত, জ্ঞানের অবিষয়, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, তিনি স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছিলেন, কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নয়। সেই ব্রহ্মা অথর্বা নামক জ্যেষ্ঠপুত্রকে সর্ববিদ্যার আকর ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেছিলেন। 'স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাম্' —সকল বিদ্যার অভিব্যক্তির কারণ, সকল বিদ্যার আশ্রয় যে বিদ্যা তাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলে।

শ্রুতি বলছেন, 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্'— যাকে জানলে অশ্রুত যা তা শোনা হয়, অচিন্তিত বস্তু চিন্তিত হয়, অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হয়ে যায়। অন্যান্য বিদ্যার দ্বারা যা যা জ্ঞাতব্য এই বিদ্যা দ্বারা সে সবও জানা যায়। এজন্য 'সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা' বলা হয়েছে। এটা সেই বিদ্যার স্তুতি করবার জন্য। এই বিদ্যা ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বাকে বলেছিলেন। ব্রহ্মার অনেক সৃষ্টি আছে। তার মধ্যে কোন একটি সৃষ্টির আদিতে অথর্বা প্রথমেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বাকে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা দান করেছিলেন।

'অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽ-
থর্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥' (১।১।২)

ব্রহ্মা (ব্রহ্মা) যাম্ (যে ব্রহ্ম-বিদ্যা) অথর্বণে (অথর্বকে) প্রবদেত (বললেন) অথর্বা (অথর্বা) তাম্ (সেই) ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) পুরা (পূর্বে) অঙ্গিরে (অঙ্গির নামক ঋষিকে) উবাচ (বললেন)। সঃ (অঙ্গির) ভারদ্বাজায় (ভরদ্বাজ-গোত্রীয়) সত্যবহায় (সত্যবহকে) প্রাহ (বললেন) ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজ-গোত্রীয় সত্যবহ) পর-অবরাম্ (পর, অর্থাৎ উত্তম গুরু, হইতে ক্রমে অবর বা অনুত্তম শিষ্যকর্তৃক প্রাপ্ত বিদ্যাটি, অথবা পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার বিষয়সমূহ যে বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়, (সেই বিদ্যা) অঙ্গিরসে (অঙ্গিরাকে) [বললেন]।

ব্রহ্মা যে বিদ্যা অথর্বা ঋষিকে দান করেছিলেন তিনি আবার সেই বিদ্যা সর্বপ্রথম অঙ্গির ঋষিকে বলেন। অঙ্গির তা ভরদ্বাজবংশীয় সত্যবহকে বলেন। ভারদ্বাজ সত্যবহ অঙ্গিরস ঋষিকে বলেছিলেন। পূর্ব পূর্ব গুরু থেকে পরবর্তী শিষ্যগণক্রমে এই বিদ্যার ধারা চলে এসেছে, অথবা পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত সর্ববিষয় এই বিদ্যার মধ্যে আছে।

ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্তক সম্প্রদায়ের ক্রম অনুসারে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মা যে বিদ্যা অথর্বা ঋষিকে দান করেছিলেন তিনি আবার সেই বিদ্যা সর্বপ্রথম অঙ্গির ঋষিকে বলেন। অঙ্গির তা ভরদ্বাজবংশীয় সত্যবহকে বলেন। ভারদ্বাজ অঙ্গিরস ঋষিকে বলেছিলেন। পরাবরা অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব গুরু থেকে পরবর্তী শিষ্যগণক্রমে এই বিদ্যার ধারা চলে এসেছে অথবা পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত সর্ববিষয় এই বিদ্যার মধ্যে আছে। এই পর্যন্ত বলে এই বিদ্যা সম্প্রদায় শেষ করলেন।

প্রাচীন নিয়ম অনুসারে কোন বিদ্যা যখন আলোচনার বিষয় হয় তখন তার গুরুশিষ্য সম্প্রদায় অনেক সময় উল্লিখিত হয়। এর কারণ বিদ্যার মাহাত্ম্য তাহলে পাঠকের বা সাধকের বোধগম্য হয় এবং পরিণামে পাঠক এই বিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনন করতে প্ররোচিত হয়।

'শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ— কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥' (১।১।৩)

মহাশালঃ (গৃহস্থশ্রেষ্ঠ) শৌনকঃ (শুনক-পুত্র) হ বৈ [প্রসিদ্ধার্থে] বিধিবৎ (যথাশাস্ত্র) অঙ্গিরসম্ উপসন্নঃ (অঙ্গিরার সকাশে উপস্থিত হয়ে) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করলেন) ভগবঃ (হে ভগবন্), কস্মিন্ নু (কোন্ বস্তুটি, অথবা এমন কোন্ উপাদান কারণ আছে যাহা) বিজ্ঞাতে (বিশেষ ভাবে অবগত হইলে) ইদম্ (এই) [কার্যস্থানীয়] সর্বম্ (অখিল বস্তু) বিজ্ঞাতম্ (সুবিদিত) ভবতি (হয়) ইতি।

শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ শৌনক বিধিপূর্বক অঙ্গিরসের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ বস্তুকে জানলে সমস্ত বিজ্ঞেয় বস্তু বিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়?'

মহাশাল অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ শৌনক বিধিপূর্বক আচার্য অঙ্গিরসের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কাকে জানলে এই সমস্তকে বিশেষভাবে জানা যায়?'

'বিধিবৎ' শব্দটি অঙ্গিরস ও শৌনকের গুরুশিষ্য সম্বন্ধের আগে পাওয়া যায়নি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে এখানেই প্রথম উপসদন অর্থাৎ বিদ্যালাভের জন্য গুরুর সমীপে যাওয়ার বিধি আরম্ভ হলো— 'মর্য্যাদাকরণার্থং বিশেষণম্'। অথবা উপসদন প্রথা আগেও ছিল পরেও আছে মাঝখানে কেবল উল্লেখ করা হলো। এই প্রথা সর্বত্রই প্রযোজ্য এই অর্থে 'মধ্যদীপিকা' ন্যায়ে 'বিধিবৎ' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে। শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী শিষ্য রিক্ত হস্তে গুরুসমীপে যাবেন না, সমিৎপাণি হয়ে অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ নিয়ে যাবেন। কথাটির তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মবিদ্যা সাধারণ অর্থকরী বিদ্যার মতো নয়। গুরুসেবা করে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করে বিনম্র ভাবে তাঁর কাছে প্রশ্ন নিবেদন করতে হয়। গীতাতেও বলেছেন— 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' (৪।৩৪)— প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা এইগুলি হচ্ছে শিষ্যের ধর্ম। গুরু প্রসন্ন হলে তবে এই বিদ্যা লাভ হবে, না হলে হবে না। তাই বলছেন, শৌনক বিধিপূর্বক গিয়ে গুরুর কাছে প্রশ্ন করলেন। কি প্রশ্ন? 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে' —কোন্ বস্তুকে জানলে সমস্ত বিজ্ঞেয় বস্তু বিজ্ঞাত অর্থাৎ

বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। প্রশ্নটিও বিচিত্র। এই জগতে জানবার বিষয় কত রয়েছে। অনন্তকাল অনন্ত জীবন ধরে মানুষ এক একটা করে বিষয়গুলি জানবার চেষ্টা করে গেলেও শেষ করতে পারবে না। সুতরাং একটি একটি করে জানবার চেষ্টা না করে এমন একটা কিছু জানতে হবে যাকে জানলে জগতের সব জানা হয়ে যাবে। মূল তত্ত্বকে জানতে হবে।

প্রশ্ন ওঠে শৌনক কি জানতেন যে, এমন কোন বিষয় আছে যাকে জানলে সব জানা হয়ে যায়? তিনি শুনেছেন, শাস্ত্রে পড়েছেন, এরকম সাধারণ ধারণাও আছে— এক জ্ঞানে সর্বজ্ঞান হয় অথবা 'লোকসামান্যদৃষ্ট্যা জ্ঞাত্বৈব পপ্রচ্ছ'— সাধারণ দৃষ্টিতে জেনেই প্রশ্ন করেছেন। সোনাকে জানলে সোনার তৈরি সব জিনিসই জানা হয়ে যায়। তাদের আকারগত পার্থক্য থাকলেও উপাদান এক। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে— 'যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।।' (৬।১।৪) মাটির ডেলাকে জানলে মাটির তৈরি যাবতীয় বস্তুকে জানা হয়ে যায় কারণ সেগুলির নাম ভিন্ন ভিন্ন মাত্র, মাটি ছাড়া তাদের পৃথক সত্তা নেই। মাটিই সত্য, বিকার শুধুমাত্র শব্দাত্মক।

শাস্ত্র নানা উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, উপাদানকে জানলে সেই উপাদানে প্রস্তুত সব বস্তুকে জানা যায়। আকার অনুসারে তাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে কিন্তু তাদের উপাদান এক। উপাদান ছাড়া তাদের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই, থাকলে তারা সত্য হতো। বিকারের পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তাই তা মিথ্যা। যেমন দড়িতে সাপ দেখা যাচ্ছে; রজ্জু-সত্তা ছাড়া সাপের পৃথক সত্তা নেই। সুতরাং রজ্জুকে জানলেই সেই রজ্জুতে যা কিছু প্রতীত হচ্ছে সবই জানা হয়ে যায়। রজ্জুকে কেউ সাপ, কেউ লাঠি, কেউ ফুলের মালা, জলের ধারা বা মাটিতে ফাটল বলে দেখে। বিভিন্ন রকম দেখালেও রজ্জু ছাড়া পৃথক সত্তা তাদের নেই। এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত। যখনই উপাদানকে জানা হলো তখনই তার কার্যগুলি সব জানা হয়ে যায়। অর্থাৎ একমাত্র কারণই আছে, কার্যগুলি সব তাতে আরোপিত। এগুলির পৃথক সত্তা থাকলে, তাদের কারণ থেকে আলাদা করে দেখলে তবে তাদের অস্তিত্ব থাকত। মাটির খেলনা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়ে খেলনা থাকবে কি? সেইরকম অলঙ্কার থেকে সোনাকে বাদ দিলে কি রইল। কিছুই রইল না। কোন একটি বস্তুর উপাদান বা অধিষ্ঠান থেকে তার পৃথক সত্তা যখন

কল্পনা করা যায় না তখন তাকে বলি মিথ্যা। সুতরাং এ জগতে যা কিছু বিকার বস্তু দেখছি সব মিথ্যা, একমাত্র যা উপাদান অর্থাৎ আদি কারণ তাই-ই সত্য। সেই কারণটি হলেন ব্রহ্ম বা সৎ। আদিতে জগৎটি সন্মাত্র ছিল, সৎ ছাড়া আর কিছু ছিল না। সুতরাং ব্রহ্মকে যখন জানা হলো তখন সবই জানা হয়ে গেল। ব্রহ্ম শব্দের মানে ব্যাপক। সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে যে মূল তত্ত্ব, জগতের ভিতর যা অনুস্যূত হয়ে রয়েছে সেই বস্তুটিকে জানলে জগতের সব জানা হয়ে গেল, আর কিছু বাকি রইল না। জগতে কতরকম বস্তু আছে কত বৈচিত্র্য, পৃথকভাবে তাদের আর জানার প্রয়োজন কি? জ্ঞাতব্য বস্তুর সংখ্যা অনন্ত, জেনে কখনো শেষ করা যাবে না।

শাস্ত্র বলছেন, অত বিস্তারের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই, মূল কারণটিকে জান যার উপরে এই জগৎ-বৈচিত্র্য অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। নাম এবং রূপ সব মিথ্যা।

সেই মূল উপাদান কারণকে জানবার জন্য শৌনক আচার্যের কাছে প্রশ্ন করছেন। প্রশ্ন করছেন, 'কস্মিন্' অর্থাৎ কোন্‌টিকে? শুনেছেন যে, একটি বস্তুকে জানলে সব জানা হয়ে যায়। এখন সেই বস্তুটি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করার জন্য প্রশ্ন করছেন।

অঙ্গিরা তদুত্তরে বলছেন—

'তস্মৈ স হোবাচ— দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি— পরা চৈবাপরা চ॥' (১।১।৪)

তস্মৈ (শৌনককে) সঃ (অঙ্গিরা) উবাচ হ (বললেন)— দ্বে (দুটি) বিদ্যে (বিদ্যা) বেদিতব্যে (জানবার আছে) ইতি হ স্ম যৎ (এই যে কথাটি, [তাহাই]) ব্রহ্মবিদঃ (বেদার্থাভিজ্ঞ, অর্থাৎ পরমার্থদর্শিগণ) বদন্তি (বলে থাকেন)— উক্ত বিদ্যাদ্বয়) পরা চ এব অপরা চ (পরা ও অপরা নামে প্রসিদ্ধ)।

অঙ্গিরা শৌনককে বললেন, 'ব্রহ্মবিদ্‌রা বলেন, পরা ও অপরা এই দুটি বিদ্যা জানতে হয়।'

ব্রহ্মবিদ্‌রা বলেন পরা ও অপরা এই দুটি বিদ্যা জানতে হয়। পরমাত্মবিদ্যা হচ্ছে পরাবিদ্যা— ধর্ম ও অধর্মের অনুষ্ঠান ও ফলবিষয়ক বিদ্যা অপরাবিদ্যা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অঙ্গিরা যেন প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর দিলেন না। শৌনক প্রশ্ন করেছিলেন, কোন্‌টিকে জানলে? তার উত্তরে অঙ্গিরা কাকে জানলে সব জানা যাবে না বলে দুটি বিদ্যা বলছেন। এতে দোষ হয়

না, উত্তরটি ক্রমসাপেক্ষ। অপরাবিদ্যা অবিদ্যা, সেই অবিদ্যাকে নিরাকরণ অর্থাৎ দূর করতে হবে। অপরাবিদ্যার বিষয়কে জানলে কোন জিনিসকেই তত্ত্বপূর্বক স্বরূপেতে জানা হলো না। পূর্বপক্ষকে নিরাকরণ করে নিবৃত্ত করে তারপর সিদ্ধান্ত যা তা বলতে হবে। সিদ্ধান্ত নির্দেশ প্রথমে করেননি, প্রত্যাখ্যেয় বিষয় বলে পরে সিদ্ধান্তের কথা বলছেন— আগে অপরাবিদ্যা কি জান, জেনে তার থেকে নিবৃত্ত হয়ে পরাবিদ্যার অনুসরণ কর। সেজন্য পরাবিদ্যার আগে অপরাবিদ্যা বিস্তার করে বলছেন।

'তত্রাপরা— ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা— যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥' (১।১।৫)

তত্র (উক্ত বিদ্যাদ্বয়ের মধ্যে) —ঋক্ বেদঃ (ঋগ্বেদ), যজুঃ বেদঃ (যজুর্বেদ), সামবেদঃ (সামবেদ), অথর্ব বেদঃ (অথর্ববেদ), শিক্ষা, কল্পঃ, ব্যাকরণম্, নিরুক্তম্, ছন্দঃ, জ্যোতিষম্ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ) —ইতি (এই সকল) অপরা (অপরাবিদ্যা)। অথ (অতঃপর) পরা (পরা, বিদ্যা) [এই] যয়া (যে বিদ্যাদ্বারা) তৎ (অনন্তর বক্ষ্যমাণ) অক্ষরম্ (অক্ষর, ব্রহ্ম) অধিগম্যতে (অধিগত বা প্রাপ্ত হন)।

উক্ত বিদ্যাদ্বয়ের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ— এগুলি অপরা বিদ্যা; অতঃপর পরা বিদ্যা, যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়।

তখনকার দিনে যত বিদ্যা শিক্ষণীয় ছিল সব বললেন এখানে। চারটি বেদ এবং ছয়টি বেদাঙ্গ হচ্ছে অপরাবিদ্যা। আর পরাবিদ্যা কি? যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। ঋগ্‌বেদ হচ্ছে ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রসমূহ— যজ্ঞের সময় যেগুলি পাঠ করা হয়। যজ্ঞকালে গান করা হয় যে মন্ত্রগুলি তা সামবেদের অন্তর্ভুক্ত। গদ্য অংশ নিয়ে রচিত মন্ত্রাদি হলো যজুর্বেদ। এছাড়া আর যা কিছু আছে তা অথর্ববেদ। বেদপাঠের যোগ্যতা অর্জনের জন্য যে ছয়টি বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয় তাকে বলে বেদাঙ্গ। বর্ণ কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে যে অংশে বলা হয়েছে তা হলো শিক্ষা। কল্প— শ্রৌতকর্ম অনুষ্ঠান জ্ঞাপক সূত্রগ্রন্থ। পদের সম্বন্ধ নির্ণায়ক গ্রন্থ— ব্যাকরণ, বৈদিক শব্দসমূহের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ— নিরুক্ত। বৈদিক মন্ত্রগুলিতে ব্যবহৃত গায়ত্রী আদি ছন্দের আলোচনা আছে ছন্দশাস্ত্রে। যাগযজ্ঞ করবার সঠিক কালাদি নির্দেশক গ্রন্থ— জ্যোতিষ। বেদ এবং এই বেদাঙ্গসমূহ অপরাবিদ্যা। বেদ সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা ছিল শাস্ত্রকার তা যেন এক কথায় ভূমিসাৎ করে দিলেন।

পরাবিদ্যা হলো যার দ্বারা অপরিণামী তত্ত্বকে জানা যায়। দুটি বিদ্যাই জানতে হবে। অপরাবিদ্যা অবিদ্যা হলেও পরাবিদ্যা লাভের সহায়ক। মোক্ষপথে প্রবর্তিত হওয়ার জন্য অপরাবিদ্যা চর্চার প্রয়োজন। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্কর বলেছেন, 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' —বেদ পাঠের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শুরু হবে। বেদ পাঠের প্রয়োজন আছে, না হলে বিচার হবে কি নিয়ে? মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন, আগে যাগযজ্ঞাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করে তারপর যদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করতে হয় তো কর। যখন অথর্ব হয়ে যাবে কর্ম করতে পারবে না তখন জ্ঞান চর্চা করবে। তাঁদের মতে ব্রহ্মবিচার মানে উপাসনা।

কেউ যদি শুদ্ধচিত্ত হন তাঁকেও কি তাহলে যাগযজ্ঞাদি করে ব্রহ্মবিচার করতে হবে? তা নয়। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হতে হবে। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পদ এবং মুমুক্ষুত্ব এইসব সাধনসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য গুরুর কাছে যেতে হবে। বৈরাগ্যবান হয়ে ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা করতে হয়।

এখন প্রশ্ন ওঠে, বেদাদি অপরাবিদ্যা যদি নিকৃষ্ট হয় তবে সেটি ত্যাজ্য, তাহলে তাকে গ্রহণ করব কেন? দ্বিতীয়তঃ, পরাবিদ্যা তাহলে বেদের বাইরে হলো। এদিকে শাস্ত্র বেদের বাইরের বস্তুকে নিন্দা করেছেন। বলেছেন—'যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ' —বেদ বহির্ভূত যা কিছু শাস্ত্রাদি তা ভ্রান্ত, অতএব নিষ্ফল, এবং সেগুলি তমোগুণাশ্রিত, মিথ্যা। এই যুক্তি অনুসারে পরাবিদ্যা বেদবাহ্য বলে নিষ্ফল, এ আপত্তি ওঠে। ভাষ্যকার এর উত্তরে বলছেন, বেদ তো শব্দরাশি। কেবল সেই শব্দরাশি অধ্যয়ন এবং তার মর্ম গ্রহণ করে মূল্যায়ন করলেই পরমতত্ত্ব লাভ হয় না। তত্ত্বলাভের জন্য বিবেকবৈরাগ্য প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, বিবেক-বৈরাগ্য না থাকলে পণ্ডিতকে খড়কুটো মনে হয়। শাস্ত্র থেকে যা জানা গেল মাত্র তার দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না— এটি শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত। বিবেকাদির সহায়ে সেই বিদ্যার অনুভূতি হলে তা হলো, পরাবিদ্যা।

অনুভূতি শব্দটি এখানে অলৌকিক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এই শব্দটির শাস্ত্রীয় পারিভাষিক অর্থ হলো শাস্ত্র অধ্যয়নাদির পর বিবেকাদি সহায়ে শাস্ত্রীয় তত্ত্বের উপলব্ধি। তত্ত্বের জ্ঞানকে বলে অনুভূতি। এই অনুভূতির দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়, কেবল শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা যা হয় না। শাস্ত্র পাঠে

মনের বহুবিধ বিকাশ ঘটে কিন্তু যথার্থ অনুভূতি হয় না। সর্ব সংশয়ের নাশ হয়ে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হলে তখন অনুভূতি হবে। অনুভূতি আর বৌদ্ধিক জ্ঞানে অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা অর্জিত জ্ঞানে পার্থক্য রয়েছে। বৌদ্ধিক জ্ঞানে অজ্ঞানের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। সংশয়বিপর্যয়রহিত জ্ঞান শুধু শাস্ত্রপাঠের দ্বারা হয় না।

বড় বড় পণ্ডিতরা যখন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন তখন বুদ্ধির কসরৎ প্রদর্শনের জন্য একটি শ্লোকের কেউ তিনটি কেউ পাঁচটি কেউ দশটি অর্থ করেন। কিন্তু কোন্‌টি আসল অর্থ, কোন্‌টির তাৎপর্য সংশয়াতীত জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সদুত্তর দিতে পারবেন না। কারণ 'বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'— বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নেই যাঁর মত ভিন্ন নয়। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নিয়েও নানা তর্কজাল, মতপার্থক্য। এঁদের কথায় মানুষের সংশয় যায় না, বাড়ে। এইজন্য উপনিষদ্ বলছেন—'নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ'। (বৃ. উ., ৪।৪।২১) —বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে না, তা বাক্যকে চিন্তাকে মলিন করে। 'শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণ কারণং'— শব্দজাল বিশাল অরণ্যের মতো, মন পথ হারিয়ে ঘুরে মরে, দিগ্‌ভ্রান্ত হয়। অথচ বলছেন, স্বাধ্যায় এবং প্রবচন থেকে কখনো বিরত হবে না, কারণ শাস্ত্রপাঠ এই পথে সাহায্য করে। শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে প্রয়োজন বিবেক-বৈরাগ্য যার দ্বারা বুদ্ধির শোধন হয়। তারপর ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কাছে গিয়ে এই বিদ্যা প্রার্থনা করতে হবে।

শাস্ত্র এখানে দুটি কথা বললেন, বিবেক-বৈরাগ্যসহ ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর কাছে যেতে হবে। স্বতন্ত্রভাবে বেদ অধ্যয়ন করে তাৎপর্য বোঝা যাবে না, সংশয় থেকে যাবে। যিনি তত্ত্বকে অনুভব করেছেন এমন ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর শরণাগত হতে হবে। নারদ সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করে সনৎকুমারের কাছে গেলেন। কেন? কারণ, সনৎকুমার ব্রহ্মজ্ঞ, শাস্ত্রের তাৎপর্য জীবনে অনুভব করেছেন। নারদ জানতেন তিনি কেবল মন্ত্রবিদ্, আত্মবিদ্ নন— 'মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ' (ছা. উপ., ৭।১।৩)। যে আত্মাকে জানে সে শোকের পারে যেতে পারে— 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' (ছা. উপ., ৭।১।৩)। নারদ অনাত্মবিদ্ বলে শোকগ্রস্ত হচ্ছেন। চতুর্বেদ বেদাঙ্গ ইতিহাস পুরাণ তর্কশাস্ত্র গন্ধর্বশাস্ত্র ভূতবিদ্যা সর্পবিদ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি সমুদয় শাস্ত্র পাঠ করেও নারদের আত্মজ্ঞান হয়নি। অতঃপর সনৎকুমার তাঁকে আত্মজ্ঞান দিচ্ছেন।

গুরু হবেন 'শ্রোত্রিয়ো অবৃজিনো অকামহত যো ব্রহ্মবিত্তম'— বেদজ্ঞ নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্র বলছেন এইসব লক্ষণ দিয়ে বিচার করতে হবে গুরু উপযুক্ত কিনা। তাঁর আচরণ কেমন, শিষ্যের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নিঃস্বার্থ কিনা এগুলি বিচার করতে হবে। গুরুর যেমন লক্ষণ আছে তেমনি শিষ্যেরও লক্ষণ আছে যা গুরু বিচার করে দেখে নেন। গীতায় বলছেন—

'ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥' (১৮।৬৭)

—তপস্যাহীনকে এই শাস্ত্র বলবে না। তপস্বী হলেও গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিরহিত ব্যক্তিকে কখনো বলবে না। ভক্ত ও তপস্বী হলেও শ্রবণেচ্ছু না হলে বলবে না। আবার যে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী তাকেও বলবে না। ভগবানের প্রতি অসূয়াশূন্য তপস্বী ভক্ত ও শুশ্রূষু ব্যক্তিকে এই শাস্ত্র বলবে।

গুরুর যেমন গুরুর পদাধিকারী হবার যোগ্যতা চাই শিষ্যেরও তেমন শিষ্যযোগ্যতা থাকা চাই। যত্র তত্র ব্রহ্মবিদ্যা হয় না, ব্রহ্মবিদ্যার বৈশিষ্ট্য এই। তাই দেখা যায় শিক্ষার্থী বিশেষ বিশেষ গুরুর কাছে যাচ্ছেন বিদ্যালাভ করার জন্য। কেবল বেদপাঠের দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। এই দৃষ্টিতে দেখলে সমস্ত বেদ অপরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। কেবল শব্দসমূহ অধিগত হলেও গুরুসমীপে গমনাদিরূপ প্রযত্ন এবং বৈরাগ্যলাভ ব্যতীত যে অক্ষরব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভবই হয় না, এইটি প্রতিপাদন করার জন্যই ব্রহ্মবিদ্যার পৃথককরণ এবং পরাবিদ্যা নামকরণ হয়েছে।

এই পরাবিদ্যার দ্বারা অবিনাশী পুরুষকে অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধিক জ্ঞানের পারে এই অনুভূতি, যে অনুভূতি মানুষকে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত করে অক্ষয় ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করে। সেই অক্ষরপুরুষ সম্পর্কে বিস্তার করে বলছেন পরবর্তী শ্লোকে।

'যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্
অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥' (১।১।৬)

তৎ যৎ (সেই যে) অদ্রেশ্যম্ (= অদৃশ্যম্, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য), অগ্রাহ্যম্ (অগ্রহণীয়, কর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অগোত্রম্ (মূলরহিত, অনন্বিত), অবর্ণম্ (রূপহীন, আকারহীন),

অচক্ষুঃ-শ্রোত্রম্ (চক্ষুকর্ণহীনকে, জ্ঞানেন্দ্রিয়-বর্জিতকে); তৎ (সেই) অপাণিপাদম্ (হস্তপদবিহীন, কর্মেন্দ্রিয়শূন্য), নিত্যম্ (অবিনাশী), বিভুম্ (প্রাণীভেদে বিবিধাকার), সর্বগতম্ (সর্বব্যাপী), সুসূক্ষ্মম্ (সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মকে, স্থূলত্বের কারণ শব্দাদিগুণ-রহিতকে); তৎ (সেই) অব্যয়ম্ (ক্ষয়শূন্যকে)— যৎ (এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত) ভূতযোনিম্ (ভূত-সমষ্টির কারণকে) ধীরাঃ (বিবেকীরা) পরিপশ্যন্তি (সর্বতোভাবে, অর্থাৎ সকলের আত্মস্বরূপে দর্শন করেন)।

সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, মূলরহিত, আকারহীন, চক্ষুকর্ণহীন, হস্তপদবিহীন, অবিনাশী, ব্যাপক, সর্বত্র অনুস্যূত, অত্যন্ত সূক্ষ্ম অবিকারী তত্ত্ব যিনি, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জগতের, সর্বপদার্থের উৎপত্তিস্থল— সেই তত্ত্বকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্বত্র সর্বকালে দেখেন।

সেই অদৃশ্য অগ্রাহ্য অমূল অরূপ চক্ষুকর্ণহীন হস্তপদবিহীন অবিনাশী ব্যাপক সর্বত্র অনুস্যূত, অত্যন্ত সূক্ষ্ম অবিকারী তত্ত্ব যিনি, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জগতের, সর্ব পদার্থের উৎপত্তিস্থান। সেই তত্ত্বকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্বত্র দেখেন। শ্রুতি এখানে 'পশ্যন্তি' না বলে বলছেন 'পরিপশ্যন্তি'। 'পরিসমন্তাৎ সর্বত্র'— সর্বকালে সর্বস্থানে ভূতগণের উৎপত্তিস্থান পরমতত্ত্বকে জ্ঞানিগণ সর্বতোভাবে দেখেন।

'তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং'— যিনি অবিকারী অক্ষয় তত্ত্ব আবার তিনিই ভূতযোনিসর্ববস্তুর উৎপত্তিস্থান, কারণ। কিন্তু যা অব্যয় অপরিণামী তার পরিণাম কেমন করে হবে? এখানে এই কারণ যে অন্য কারণের মতো পরিণামী নয় সেটি বোঝবার জন্য বলা হলো 'তদব্যয়ম্'। সেই অব্যয় অপরিণামী বস্তু 'যদ্ভূতযোনিং'— অব্যয় হয়েও ভূতসমূহের কারণ, এই দুটি জিনিস একসঙ্গে বলার সার্থকতা এইখানে। সেই তত্ত্বকে 'ধীরাঃ পরিপশ্যন্তি' —জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্বত্র সর্বকালে দেখেন।

এই অপরিণামী জগৎ-কারণকে জানলে সব জানা হয়ে যায় কিন্তু পরিণামী হলে সব জানা হতো না। দুধকে জানলে দইকে জানা হয় না, কারণ দই দুধের বিকার মাত্র। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে সর্ববস্তু তাঁরই বিবর্ত, তাঁর উপর আরোপিত বা তাঁরই উপর বিভিন্ন রূপের কল্পনা। সুতরাং যাঁর উপর কল্পনা, সমস্ত কল্পনার যিনি অধিষ্ঠান তাঁকে জানলে আর কিছু জানার মতো অবশিষ্ট রইল না। কারণ আরোপিত বস্তুগুলি কল্পিত মাত্র, পৃথক সত্তাবিশিষ্ট নয়। সেইজন্য তাদের জানবার আর প্রয়োজন নেই। এগুলি যাঁর সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট তাঁকে জানলে জানার আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না। যেমন, মাটিকে জানলেই মাটির যত খেলনা সব জানা হয়ে যায়।

কারণ মাটি ছাড়া তাদের আর কোন পৃথক সত্তা নেই। মাটির হাতি ঘোড়া উট ভিন্ন বটে কিন্তু মাটিই তাদের একমাত্র সত্তা। পৃথক সত্তা না থাকায় এদের জ্ঞানের বিষয়রূপে আলাদা করে ভাবতে পারি না। কারণই সত্য, কার্য কারণে কল্পিত। আদি কারণকে জানলে অন্য জ্ঞাতব্য বস্তু আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না—'যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে'। (গীতা, ৭।২) আমরা অনন্ত প্রকার জগতের কল্পনা দেখছি, এ নিয়ে মশগুল হয়ে আছি অথচ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এগুলি পরিণত হচ্ছে এক সৎ মাত্রতে। সেই সৎকে জানলে এই কল্পনাগুলি কি ভেঙেচুরে এক হয়ে যায়? তা বলছেন না। এক দড়ির উপরই যদি সাপ লাঠি মালা ফাটল জলধারা প্রভৃতি নানারকম কল্পনা হয় তাহলে দড়িটিকে জানলে এই কল্পিত বস্তুগুলি জানবার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। এরা দড়ি থেকে পৃথক সত্তাবিশিষ্ট নয়। এই দার্শনিক যুক্তি অবলম্বন করে বলা হয়েছে এক কারণকে জান, আর সব অনন্ত কার্য, তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। তাদের শব্দমাত্র অবলম্বন, তারা অনিত্য বস্তু এবং কারণ থেকে ভিন্ন সত্তা নেই বলে অ-সৎও। সুতরাং সর্ববস্তুর উৎপত্তিস্থান কারণকে জানলে সব জানা হয়ে যায়।

এই কারণ থেকে জগৎকার্য কি করে এসেছে সে বিষয়ে বলা হচ্ছে—

'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥' (১।১।৭)

[ব্রহ্ম কিরূপে ভূতযোনি তাই বলা হচ্ছে।] —উর্ণনাভিঃ (মাকড়সা) যথা (যদ্রূপ) সৃজতে (উৎপাদন করে) গৃহ্ণতে চ (= গৃহ্ণাতি চ, এবং আত্মসাৎ করে) পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) যথা (যদ্রূপ) [তদনতিরিক্ত] ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদি) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), সতঃ (সজীব) পুরুষাৎ (পুরুষদেহ হতে) যথা (যদ্রূপ) [বিজাতীয় অর্থাৎ জড়] কেশ-লোমানি (কেশ ও লোমসমূহ) [নির্গত হয়] তথা (তদ্রূপ) অক্ষরাৎ (ব্রহ্ম হতে) ইহ (এই সংসারমণ্ডলে) বিশ্বম্ (সমস্ত জগৎ) সম্ভবতি (উৎপন্ন হয়)।

মাকড়সা যেমন নিজের শরীর থেকে জালকে সৃষ্টি করে, আবার আত্মসাৎ করে, অথবা যেমন পৃথিবীতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, যেমন জীবন্ত পুরুষের দেহে কেশলোমাদি উৎপন্ন হয় সেইরকম অক্ষর থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হচ্ছে।

মাকড়সা যেমন নিজের শরীর থেকে জালকে সৃষ্টি করে, আবার

'গৃহ্ণতে চ' —আত্মসাৎ করে, গ্রহণ করে নেয় অথবা যেমন পৃথিবীতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, যেমন জীবন্ত পুরুষের দেহে কেশলোমাদি উৎপন্ন হয়— 'সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি', সেইরকম অক্ষর থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হচ্ছে। এই দৃষ্টান্তগুলি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে, অন্য কোন উপাদানের দ্বারা মিশ্রিত হয়ে নয় একমাত্র সেই অক্ষর থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। মাকড়সা যেমন বাইরের কোন বস্তুর অপেক্ষা না রেখে নিজের ভিতর থেকে সুতো তৈরি করছে সেইরকম। বিশেষ করে অনিত্যত্ব বোঝাবার জন্য ওষধির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যে গাছ একবার ফল দিয়েই মরে যায় তাকে ওষধি বলে। ওষধি পৃথিবী থেকে উৎপন্ন হয় আবার তাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেইরকম অক্ষর থেকে উৎপন্ন হয়ে অক্ষরেই লয় প্রাপ্ত হয়। 'সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি'— জীবন্ত পুরুষের দেহ থেকে কেশলোমাদি উৎপন্ন হয়; প্রাণবন্ত বলার কারণ মৃতব্যক্তির কেশলোম উৎপন্ন হয় না— পুরুষ জীবন্ত কিন্তু কেশলোমগুলির লক্ষণ বিপরীত। অন্য কোন নিমিত্ত কারণের অপেক্ষা না রেখে যেমন এরা সৃষ্ট হয়েছে সেইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড— 'ইহ বিশ্বম্'— সেই অক্ষর পুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সমগ্র জগৎ একসঙ্গে উৎপন্ন হয় না— 'ন যুগপৎ', উৎপত্তির একটা ক্রম আছে যা পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে—

'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্॥' (১।১।৮)

ব্রহ্ম (অক্ষর) তপসা (উৎপাদনোপযোগী জ্ঞানের দ্বারা) চীয়তে (স্ফীত হন); ততঃ (তাঁহা হইতে) অন্নম্ (সর্বজীবের ভোগ্যস্বরূপ অব্যাকৃত প্রকৃতি) অভিজায়তে (অভিব্যজ্যমানরূপে উৎপন্ন হয়)। অন্নাৎ (মায়াতত্ত্ব হইতে) প্রাণঃ (হিরণ্যগর্ভ, ব্যষ্টিজগতের সমষ্টিরূপ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট জগদাত্মা) মনঃ (সমষ্টি অন্তঃকরণ), সত্যম্ (আকাশাদি পঞ্চভূত), লোকাঃ (ভুরাদি লোকসমূহ) কর্মসু (কর্মমধ্যে) অমৃতম্ চ (কর্মফলও)।

তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মের চয়ন অর্থাৎ স্ফীতি হয়, সেই ব্রহ্ম থেকে অন্ন উৎপন্ন হলো, সেই অন্ন থেকে (সেই অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত উপাদান থেকে) প্রাণ উৎপন্ন হলো, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে সত্য, সত্য থেকে লোকসমূহ উৎপন্ন হলো, লোকসমূহে প্রাণিবর্গের সৃষ্টি হলো, তাদের কর্মের সৃষ্টি হলো। কর্মে অমৃত উৎপন্ন হলো।

'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম'— তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মের চয়ন অর্থাৎ স্ফীতি হয়। 'তপসা' শব্দের অর্থ জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা। জ্ঞানরূপ তপস্যা মানে কি? প্রথমে ব্রহ্মের মনে জগৎসৃষ্টির ক্রম উৎপন্ন হয়। জগতের কল্পিত

জ্ঞান তাঁর মনে চিন্তারূপে উদিত হয়, তখন ব্রহ্ম স্ফীত হন। এই জগৎজ্ঞানকে বলা হচ্ছে তপস্যা— 'জ্ঞানময়ং তপঃ'। ব্রহ্মের মনে এই কথাটি আমরা বলছি ব্যবহারিক দৃষ্টি দিয়ে, তাঁর আবার মন কি? মন তো এই জগতের অন্তর্ভুক্ত বস্তু। জগতের কল্পিত জ্ঞান ব্রহ্মের মনে চিন্তারূপে এসেছে; যেমন ভাস্কর একটি মূর্তি রচনা করতে গিয়ে প্রথমে সেই মূর্তিটির কল্পনা করে নেয়, পরে যন্ত্রের সাহায্যে বাইরে তার রূপ দেয়। এইরকম জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মের ভিতরে জগৎ রচনা করবার পূর্বে জগৎ কল্পনাটি উৎপন্ন হয়। 'তপসা' কথাটির তাৎপর্য এইখানে। তপস্যা মানে কিছু শ্রম করা নয়, ব্রহ্মের মনে এই জগৎ জ্ঞানটি উৎপন্ন হওয়া। এই জ্ঞান তাঁর ভিতর কল্পনারূপে উদিত হলে তিনি স্ফীত হন— 'চীয়তে ব্রহ্ম'। স্ফীত হন বলার তাৎপর্য এই যে, একটি বীজ থেকে অঙ্কুর উদগমের সময় বীজটি একটু ফুলে ওঠে। তখনো অঙ্কুরের প্রকাশ নেই, পরে সেখান থেকে অঙ্কুরটি উদ্ভিন্ন হবে। সেইরকম ব্রহ্মের মনে জগৎ কল্পনা উদিত হলে তাঁর ভিতরে যেন একটু স্ফীতি হলো। 'যেন' বলছি কারণ এগুলি উপমা মাত্র। ব্রহ্ম নিরবয়ব বস্তু তাঁর স্ফীতি হয় না। বোঝাবার জন্য বলা হলো স্ফীত হন অর্থাৎ তিনি জগৎ সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হলেন। এই ভাবটি বোঝাবার জন্য বলা হলো 'চীয়তে ব্রহ্ম'।

'ততোঽন্নমভিজায়তে'— সেই ব্রহ্ম থেকে অন্ন উৎপন্ন হলো। অন্ন বলতে বোঝাচ্ছে যা কিছু ভোগ্য পদার্থ— 'অদ্যতে ভুজ্যতে ইতি অন্নম্।' সেই ভোগ্য পদার্থ কিরকম? সর্ববস্তুর আদি উপাদান অব্যাকৃত প্রকৃতি যা তখনো অনভিব্যক্ত অর্থাৎ বিভিন্নরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়নি। প্রথমে অব্যক্তরূপে আবির্ভূত হলো পরে সে বস্তুটি ভিন্ন ভিন্ন আকার নেবে। যেমন কুম্ভকারের মাটির তালটি হলো আদি উপাদান, সে যে বিভিন্ন আকারগুলি দেবে তা তখনো হয়নি, শুধু মূল উপাদানটি রয়েছে। সেইরকম অন্ন যা সর্ববস্তুর আদি উপাদান প্রথম আবির্ভূত হলো। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে— 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।' (৬।২।২) 'তদৈক্ষত বহু স্যাম্'... (৬।২।৩) আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন। তিনি ঈক্ষণ করলেন আমি বহু হব। কেমন করে হবেন? এই ক্রমে হবেন। 'অন্নাৎ প্রাণো'— সেই অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত উপাদান থেকে প্রাণ উৎপন্ন হলো। প্রাণ মানে হলো জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত সমস্ত জগতের যে সাধারণ

রূপ, প্রথম জীব যা ইচ্ছা ও জ্ঞান শক্তিবিশিষ্ট, বেদান্তের ভাষায় যাকে বলে হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্য অর্থাৎ সুবর্ণময়, জ্যোতির্ময় অর্থাৎ প্রকাশমান। তার থেকে সকল বস্তুর উৎপত্তি হবে এইজন্য গর্ভ বলা হয়। এই হিরণ্যগর্ভ আবার জগদাত্মা, সমস্ত জগতের সূক্ষ্মস্বরূপ তিনি। তাকে আরও বলা হচ্ছে—'অবিদ্যা কামকর্মভূতসমুদয় বীজাঙ্কুরো'— অবিদ্যা কামনা ও তদনুগত কর্মসমষ্টিরূপ বীজের অঙ্কুরস্বরূপ। ক্রমটি বলা হলো— অবিদ্যা অজ্ঞান থেকে কামনা বাসনা, তার থেকে ভূত সমুদয় কর্মভোগ ফলভোগের জন্য। তার বীজ যে অব্যক্ত তার অঙ্কুর হিরণ্যগর্ভ। হিরণগর্ভই সর্বজগতের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা, অবিদ্যা কামনা ও সেই কর্মফলরূপ বীজের অঙ্কুর এবং জগদাত্মা। তারপর সেই হিরণ্যগর্ভ থেকে মন উৎপন্ন হলো— 'অন্নাৎ প্রাণো মনঃ'— সঙ্কল্প বিকল্প সংশয় নির্ণয়াদি স্বভাব-বিশিষ্ট মন। মন বলতে এখানে সমষ্টি অন্তঃকরণ বিশ্বমনকে বোঝানো হচ্ছে, সাধারণ মনের কথা বলা হচ্ছে না। অন্ন থেকে সৃষ্ট হলো প্রাণ এবং মন। মন থেকে সৃষ্ট হলো সত্য— 'মনঃ সত্যং'। সত্য মানে পদার্থ পঞ্চভূত। আকাশাদি পঞ্চভূতকে সত্য বলা হয়েছে। কেন না সেখানে সত্তার ভাব অর্থাৎ প্রকাশ রয়েছে।

'লোকাঃ' —পঞ্চভূতরূপ সত্য থেকে লোকসমূহের উৎপত্তি হলো—'অণ্ডাদি ক্রমেণ সপ্তলোকা ভূরাদয়ঃ।' অণ্ডোৎপত্তিক্রমে সৃষ্টি হলো পৃথিবী প্রভৃতি সপ্তলোক। হিরণ্যগর্ভ থেকে যেন অণ্ড উৎপন্ন হলো, অণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বীজ। যেমন ডিমের ভিতর পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তা থেকেই পাখি হবে। ডিম পাখির কারণাবস্থা। তেমনি ব্রহ্মের যে জগৎকারণাবস্থা তা থেকে লোকসমূহ সৃষ্টি হলো।

'নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।'

(গীতাভাষ্য, শঙ্কর)

—অব্যক্ত থেকে অণ্ড, অণ্ড থেকে এই সমস্ত লোক সৃষ্টি হয়েছে। সত্য সৃষ্ট হলো ভূঃ ভূবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোকের এবং অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল ও পাতাল সহ এই চতুর্দশ ভুবনের।

এই সমস্ত লোকে প্রাণিবর্গের সৃষ্টি হলো, মনুষ্যাদি বিভিন্ন প্রাণীর বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্তব্য কর্ম সৃষ্টি হলো। 'কর্মসু চামৃতম্'— কর্মে অমৃত

উৎপন্ন হলো। অমৃত অর্থাৎ কর্মফল, তার বিনাশ হয় না বলে অমৃত বলা হচ্ছে। আমরা যে কর্ম করি ফলোদয় না হওয়া পর্যন্ত তা সূক্ষ্মরূপে থাকে। কর্মফল এল, তা ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত হলো নতুন নতুন কর্ম। আবার এল কর্মফল, জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে চলবে।

সৃষ্টির এই ক্রম। জগতের উৎপত্তির একটা শৃঙ্খলা আছে। বিশৃঙ্খলভাবে জগতের সৃষ্টি হয়নি সেইটি বোঝাবার জন্য বললেন, এই ক্রম অনুসারে জগতের সৃষ্টি— 'তদনেন ক্রমেণোদ্যতে'। ভাষ্যকার বলছেন, 'ন যুগপদ্‌বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপবৎ' —একমুঠো কুল হাঁড়ি থেকে ছড়িয়ে দেবার মতো জগৎ সৃষ্টি হয়নি। Let there be light, there was light— আলো হোক আর আলো হয়ে গেল ঠিক এভাবেও নয়। সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে, কারণ থেকে কার্যে, এই ক্রমে জগতের উৎপত্তি। আগে বলা হয়েছে প্রথমে ব্রহ্মের মনে জগৎ কল্পনা এল তারপর সিসৃক্ষা জাগল। সেই সৃষ্টির ইচ্ছাসম্পন্ন বা সৃষ্টি-উন্মুখ ব্রহ্ম থেকে অন্ন অর্থাৎ অব্যাকৃত নির্বিশেষ তত্ত্ব উৎপন্ন হলো। তার থেকে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রাণ হিরণ্যগর্ভ, মন, পঞ্চভূত, লোকসমূহ, কর্ম ও কর্মফলের সৃষ্টি হলো। এইভাবে জগৎ পরম্পরা অনন্তকাল ধরে চলছে প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

কল্পনা করা হয় এই সৃষ্টিতে ভগবান যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বললেন আর দরকার নেই গুটিয়ে ফেলো। কোথায় গুটোবেন? মাকড়সার মতো নিজের ভিতরে এই জগৎকে আবার সঙ্কুচিত করে নিলেন, টেনে নিলেন কিন্তু জগৎ সেখানে ব্রহ্মের ভিতরে অভিন্নরূপে রইল। বীজাকার নষ্ট হলো না আবার পরে সৃষ্টি হবে। ঠাকুর বলছেন, যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি থাকে আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি শশার বীজ আর সব পাঁচরকম বীজ তুলে রাখে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐরকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। আবার তার থেকে নতুন সৃষ্টি হবে। এই আমাদের কল্পনা— সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি— এই ধারা চলছে।

প্রশ্ন ওঠে, যখন এই ধারাতে আবার সৃষ্টি করবেন 'যথাপূর্বমকল্পয়ৎ'—যেমনটি ছিল তেমনটি করবেন তখন আমাদের আর গতি কি? আমাদের তো বারে বারে ফিরে আসতে হবে। শাস্ত্র এর উত্তরে

বলছেন, তুমি যে ব্যক্তিটি আছ এই ব্যক্তিটির আর না ফিরলেও চলবে। যদি অভিমান দূর করতে পার তখন ব্রহ্মেরও আর সাধ্য নেই তোমাকে আবার জীবরূপে ফেরান। তোমাকে ছেড়ে দিতেই হবে, এইখানেই নিবৃত্তি। কিন্তু অহং যদি দূর না হয় তাহলে ঐ বীজ কুড়িয়ে রাখবেন আবার সৃষ্টি হবে। সুতরাং বীজটি যতক্ষণ না যাচ্ছে, অহং না যাচ্ছে, ততক্ষণ নিষ্কৃতি নেই।

প্রশ্ন ওঠে, যে হিরণ্যগর্ভ তার কি গতি হবে? হিরণ্যগর্ভের মুক্তি হবে। কারণ সে জ্ঞানস্বরূপ। তাহলে আর হিরণ্যগর্ভ আসবে না? আসবে। যে সমস্ত জীব বহু সৎকর্ম করেছে তারাই আবার হিরণ্যগর্ভরূপে আসবে। কিন্তু একজন হিরণ্যগর্ভের তো অনেক কাল স্থায়িত্ব, তাহলে হিরণ্যগর্ভত্ব পেতে হলে কি অনেক কাল অপেক্ষা করতে হবে? একজন হিরণ্যগর্ভ শেষ হলে আর একজন সুযোগ পাবে? তা নয়। কল্পনাটি ভারি চমৎকার। একশটি মানুষ যদি শুভকর্ম করে থাকে তবে একশটি মিলেই একটি হিরণ্যগর্ভ হবে, অনেক হিরণ্যগর্ভ নয়। বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্ব মিলে এক হয়ে যায়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের, বহুত্বের বিনাশ হয়, সর্বাত্মক হয়ে গিয়ে হিরণ্যগর্ভরূপে থাকে। তখন 'আমি অমুক' 'আমি এরকম' এভাবে থাকে না। অন্যদিক দিয়ে দৃষ্টান্ত— জীব তার সীমিতরূপ নিশ্চিহ্ন করতে পারলে ব্রহ্ম হয়ে যায়। পাঁচটি জীব যদি ব্রহ্ম হয়ে যায় তাহলে পাঁচটি ব্রহ্ম হবে? তা নয়। তাদের পৃথকত্ব থাকে না, সব ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

বিভিন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে মৌমাছি চাক করে। সেই চাকে যে মধু আছে তা একই মধু। বিভিন্ন জীব যখন সর্বাত্মতা প্রাপ্ত হয়ে যায় তখন এক হয়ে যায়, বহু থাকে না। সেইরকম যখন হিরণ্যগর্ভ হয় তখন যেন তাঁতে একেবারে একীভূত হয়ে যায়। তার ক্ষুদ্র সত্তা হিরণ্যগর্ভের সত্তায় বিলীন হয়ে যায়। যেমন জীবসত্তা ব্রহ্মসত্তাতে বিলীন হয়।

'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥'

(কঠ উ., ২।১।১৫)

—শুদ্ধ জলবিন্দু যেমন শুদ্ধ জলাশয়ে পড়লে একরূপতা প্রাপ্ত হয় তেমনি মননশীল ও একত্বদর্শী ব্যক্তির আত্মাও একত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম সকল জীবের

পরমগতি, সেখানে পৌঁছালে পৃথকত্ব থাকে না। 'সর্বাসাং অপাং সমুদ্র একায়নম্' —(বৃ.উ., ২।৪।১১) সকল নদীর পরমা গতি হলো সমুদ্র, সেই রকম সকল জীবের একমাত্র গতি ব্রহ্ম। সেখানে পৌঁছালে পৃথকত্ব থাকে না। তার পূর্বের অবস্থা হিরণ্যগর্ভত্ব, সেখানেও জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। জীবের হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তির জন্য অনন্ত সৃষ্টি-ক্রমের অপেক্ষা করতে হবে না। যখনই জীব হিরণ্যগর্ভস্বরূপতা প্রাপ্তির যোগ্য হবে তখনই তার হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তি হয়ে যাবে। আমাদের পৃথকত্বটি কতকগুলি গণ্ডি দিয়ে সৃষ্টি করা। যখন সাধনার দ্বারা গণ্ডিগুলো ভেঙে যায় তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবত্ব থাকে না, সর্বাত্মক হয়ে ওঠে। সর্বাত্মক মানে কি? না, তাদের আর পৃথকত্ব থাকে না।

এই হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তির তাৎপর্য কি এবং ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরই বা তাৎপর্য কি তা আমাদের একটু বিচার করে বুঝে নিতে হবে। ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি, হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তি বা দেবত্ব প্রাপ্তি যাই বলি সবগুলি সম্বন্ধেই মনে রাখতে হবে এগুলি এক একটি জীবের মাত্র হচ্ছে তা নয়; বিভিন্ন জীবের এককালে প্রাপ্তি হতে পারে। সাধনার ফলে সর্বাত্মকতা লাভ হতে পারে, তখন পৃথক সত্তার নাশ হয়। সর্বাত্মকতা প্রাপ্তির পরও ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব থাকবে তা হয় না, হতে পারে না।

জগৎ সৃষ্টির ক্রম দেখিয়ে উপসংহার করছেন—

'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥' (১।১।৯)

যঃ (যিনি) সর্বজ্ঞঃ (মায়োপাধিসহায়ে সমষ্টিরূপে সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান) সর্ববিৎ (অবিদ্যোপাধিসহায়ে ব্যষ্টিরূপে সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান), যস্য (যাঁহার) জ্ঞানময়ম্ তপঃ ([সত্ত্বপ্রধানা মায়ার জ্ঞানাখ্য বিকারে উপহিত হওয়া রূপ] সর্বজ্ঞত্বই তপস্যা) তস্মাৎ (তাঁহা হইতে) এতৎ ব্রহ্ম (এই হিরণ্যগর্ভ) নাম (নাম), রূপম্ (রূপ), অন্নম্ চ (ও ব্রীহিযবাদি অন্ন) জায়তে (জাত হয়)।

যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্, জ্ঞানময় যাঁর তপস্যা, সেই ব্রহ্ম থেকে নাম, রূপ ও অন্ন জন্মায়।

যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্, জ্ঞানরূপ যাঁর তপস্যা সেই অক্ষর পুরুষ থেকে এই হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়। যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্—'যিনি' বলতে সেই অক্ষর পুরুষ তার থেকেই উৎপন্ন এই বিশ্ব। 'জ্ঞা' ধাতুর

মানে 'জানা' আবার 'বিদ্' ধাতুর মানেও 'জানা', তাহলে দুটি শব্দ কেন বললেন? এদের পার্থক্য কি? সমস্ত জগতের সামান্য জ্ঞান এবং সমস্ত জগতের বিশেষ জ্ঞান, এইটি বোঝাবার জন্যই দুটি পৃথক ধাতু ব্যবহার করলেন। এই জগতের মূল উপাদান যা দিয়ে জগৎ সৃষ্টি হবে তার জ্ঞান আছে তাই সর্বজ্ঞ, আবার সৃষ্ট বস্তুকে পৃথক পৃথক রূপেও তিনি জানেন তাই সর্ববিদ্। 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ'— যাঁর তপস্যা জ্ঞানময়, জ্ঞানরূপ, সেই অক্ষর পুরুষ থেকে 'তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে।'

এখানে হিরণ্যগর্ভ বলতে ব্রহ্ম শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র এই হিরণ্যগর্ভকে প্রাণও বলা হয়েছে। অক্ষর হলেন কারণ, তাঁর প্রথম কার্য হলেন হিরণ্যগর্ভ। এখানে অব্যাকৃতের আর উল্লেখ না করে বললেন 'তস্মাৎ'— সেই অক্ষর পুরুষ থেকে 'এতৎ'— এই ব্রহ্ম, যাঁর অপর নাম হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হলেন। তারপর আগে যে ক্রম বলেছিলেন এখানে সংক্ষেপ করে বললেন, নাম রূপ এবং অন্ন জাত হলো। নাম বলতে বিভিন্ন বস্তুর সূক্ষ্মতম বৈশিষ্ট্য, এক একটি বস্তুর যে সূক্ষ্মরূপ— যেমন ইনি যজ্ঞদত্ত, ইনি দেবদত্ত ইত্যাদি লক্ষণকে বোঝায়। রূপ হলো আরও একটু অভিব্যক্তি। এটি সাদা, এটি নীল এমনি বিভিন্ন রূপ। সমস্ত জগতের যেন দুটি স্বরূপ— নাম ও রূপ। নামরূপাত্মক জগৎ বলা হয়। পরে অন্ন অর্থাৎ ধানযবাদি উৎপন্ন হলো। জীব উৎপন্ন হলে ভোজ্যবস্তু চাই। প্রাণী যা কিছু ভোগ করে তাকেই অন্ন বলা হয়েছে। সূক্ষ্ম থেকে স্থূল এই ক্রমে জগৎ সৃষ্টি হলো।

এক অক্ষর পুরুষ থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে, তিনি ব্যতীত জগতে আর কিছুই নেই। সব তাঁরই অভিব্যক্তি, তিনি নিজের ভিতর থেকে এই জগৎ সৃষ্টি করেন আবার নিজের ভিতরেই একে সংহার করেন, ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বোঝানো হয়েছে। এই মূল কথাটি মনে রাখতে হবে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত— তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। আর এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আগে বলা হয়েছে যে, সেই এককে জানলে সব জানা হয়ে যায়। শৌনক অঙ্গিরাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন— 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি' (মু.উ., ১।১।৩) —হে ভগবন্, কাকে জানলে সব জানা হয়ে যায়, তার উত্তর এইভাবে দেওয়া হলো। সেই অক্ষরকে জানলে জানার আর কিছু বাকি থাকে না। কারণকে জানলে কার্যকে জানার

দরকার হয় না। কার্য কারণ থেকে ভিন্ন নয়, পৃথক কোন সত্তা নেই—'তদনন্যত্বাৎ।' সূত্রে আছে— 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' (ছা. উ.,৬।১।৪) —বাক্য হয়েছে অবলম্বন, যে বিকারের সেটি নামমাত্র, তার কোন পৃথক সত্তা নেই, মৃত্তিকাই সত্য।

সৃষ্টির বৈচিত্র্যের দিকে তাকালে দেখব অনন্ত জীবন দিয়েও জানা শেষ হবে না। পিঁপড়ের চিনির পাহাড় বয়ে নিয়ে যাবার মতো এ জানা অনন্ত কাল ধরে চলবে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এক-কে জান। এক-কে জেনে যদি সব জানা হয়ে যায় তাহলে সেই জানার কৌশল এটি হবে। অক্ষর পুরুষকে জানলেই সব জানা হয়ে যায় কারণ যা কিছু হয়েছে তা তাঁরই অভিব্যক্তি মাত্র।

দুই

'তদেতৎ সত্যম্—মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥' (১।২।১)

কবয়ঃ (কবিরা বা জ্ঞানী ব্যক্তিরা) মন্ত্রেষু (ঋগ্বেদাদিতে প্রকটিত) যানি (যে-সকল) কর্মাণি (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম) অপশ্যন্ (দেখেছেন) তৎ এতৎ ([অপরাবিদ্যার বিষয়ীভূত] সেই ইহাই) সত্যম্ (নিশ্চিতরূপে পুরুষার্থের হেতু); তানি (সেই কর্মসমূহ) ত্রেতায়াম্ (ঋক্, যজুঃ ও সামসমূহে; কিংবা ত্রেতাযুগে) বহুধা সন্ততানি (বহু প্রকারে প্রবৃত্ত আছে, প্রায়শঃ আচরিত হয়); [তোমরা] সত্যকামাঃ (যথাভূত কর্মফল কামনা করে) তানি (সেই কর্মসমূহ) নিয়তম্ (নিত্য) আচরথ (আচরণ কর);বঃ (তোমাদের) সুকৃতস্য (স্বয়ংকৃত কর্মের) লোকে (ফললাভার্থে) এষঃ (ইহাই) পন্থাঃ (উপায়)।

কবিগণ বা জ্ঞানী ব্যক্তিরা ঋক্ বেদাদিতে যেসব বিহিত কর্মকে জানেন তা এই (অপরাবিদ্যার বিষয়ীভূত কর্ম) সত্য, এই সত্য বহুভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তোমরা নিয়ত সেই যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান কর। কর্মফল প্রাপ্তির এই হলো তোমাদের— ফলকামীদের পথ।

এই সেই সত্য—অবশ্য ফলদায়ী সেই কর্মসমূহ যা বেদের মন্ত্রভাগে অভিব্যক্ত হয়েছে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেই কর্মসমূহকে জানেন। বিভিন্নভাবে সেগুলির নির্দেশ করা হয়েছে। ত্রেতা শব্দের ব্যাখ্যা তিনরকম হয়। এক

অর্থ ত্রেতা যুগ অথবা ঋক্, সাম ও যজুঃ— বেদের এই তিনটি বিভাগ কিংবা হোতা, উদ্গাতা আর অধ্বর্যু এই তিন শ্রেণীর ঋত্বিক্ যাদের দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়। যজ্ঞকালে হোতা ঋক্‌বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ পাঠ করেন। অধ্বর্যু যজ্ঞের উদ্যোক্তা আর উদ্গাতা সামবেদ গান করেন। তিনটি বেদে বহুভাবে যজ্ঞবিধি প্রকাশিত হয়েছে। বলছেন, 'তানি আচরথ নিয়তং সত্যকামা'—তোমরা সেই যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান কর। সত্যকামা বলতে যাদের কামনা সার্থক হয়েছে তাদের বোঝাচ্ছে। বস্তু প্রাপ্তির কামনা সিদ্ধ হবে যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা। 'এষঃ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে' —কর্মফল প্রাপ্তির এই হলো তোমাদের—ফলকামীদের পথ অর্থাৎ যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান।

ভাষ্যে এটি একটু বিস্তার করে বলা হয়েছে। প্রথমে অপরাবিদ্যার অন্তর্গত চার বেদ ও ছয় বেদাঙ্গ এবং পরে পরাবিদ্যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যাঁর থেকে নাম রূপ সব উৎপন্ন হচ্ছে, যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, সেই অক্ষর-পুরুষকে যে বিদ্যার দ্বারা জানা যায় তা পরাবিদ্যা। দুটি বিদ্যাই জানতে হবে। অপরাবিদ্যা হলো যাগযজ্ঞাদি যার থেকে ফল পাওয়া যাবে। অবশ্য ফলদায়ক কর্মগুলিকেও জানতে হয় আর তারপরে যাঁর এসবের আকাঙ্ক্ষা নেই তিনি এস্থানে উল্লিখিত কর্মসমূহ পরিত্যাগ করে পরাবিদ্যার অনুশীলন করবেন, যে বিদ্যার দ্বারা অক্ষর-পুরুষকে জানা যাবে। এখন প্রশ্ন ওঠে, অপরাবিদ্যা জানতে হবে কেন? না, অপরাবিদ্যায় উল্লিখিত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ফলরূপ ভোগাদিতে বৈরাগ্য এলে মানুষ পরাবিদ্যার দিকে যাবে। সেইজন্য প্রথমে অপরাবিদ্যার কথা বলা শেষ করে সেগুলির উপর বৈরাগ্য উৎপন্ন করে পরে পরাবিদ্যার উপদেশ করবেন। বলছেন, বিভিন্ন প্রকার কর্ম-অনুষ্ঠানের সাধন এবং বিভিন্ন কর্মের ফল— সেইগুলি হচ্ছে অপরাবিদ্যা যাকে বলা হয় সংসার, যা অনাদি অনন্ত। সংসার দুঃখপূর্ণ, প্রত্যেক দেহধারীরই চেষ্টা হবে সংসারকে পরিত্যাগ করা। সংসার মানে গৃহীর জীবনযাপন করা নয়, জন্মমৃত্যু পরম্পরার ভিতর দিয়ে যাওয়ার নাম সংসার— 'সং সরতি ইতি সংসারঃ'। এক এক দেহ উৎপন্ন হচ্ছে কর্মের ক্ষয়ের জন্য, আবার পরবর্তী দেহসমূহতেও নতুন নতুন কর্ম সঞ্চিত হচ্ছে। তার ফলে কতকগুলি কর্মের ভোগ হচ্ছে আবার কতকগুলি পরে ভোগ হবে বলে জমা হয়ে থাকছে। এজন্য বলছেন অনাদি অনন্ত। যতক্ষণ ভোগ শেষ না হয় ততক্ষণ এই সংসার অর্থাৎ জন্মমৃত্যু পরম্পরার শেষ নেই।

সংসার দুঃখপূর্ণ, কারণ তা নশ্বর এবং যখন আছে বলছি তখনও এটি মিথ্যা। কাজেই দুঃখপূর্ণ যে সংসার তাকে পরিত্যাগ করতে হবে।

এইভাবে সংসারের সব পরিণামগুলি বলে বলছেন, এই সংসারের জন্মমৃত্যু পরম্পরা থেকে যে নিষ্কৃতি তার নাম হলো মোক্ষ— সেটিই পরাবিদ্যার বিষয়। মোক্ষ উৎপাদ্য বস্তু নয়, মোক্ষকেও বলা হচ্ছে অনাদি অনন্ত অমৃত অভয়স্বরূপ। সর্ব অশুদ্ধি পরিবর্জিত সর্বদা প্রকাশশীল স্বীয় আত্মাতে প্রতিষ্ঠার নাম মোক্ষ। আমরা সকলেই দুঃখপূর্ণ সংসার থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। কারণ আমাদের স্বভাব সমস্ত বন্ধনকে অতিক্রম করে যাওয়া, সেই স্বভাবে ফিরে যেতে চাই। বন্ধনের যে অনুভব এখন হচ্ছে তা আগন্তুক, আমাদের নিত্যস্বরূপ নয়, এর থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। সুতরাং দুঃখরূপ বন্ধন থেকে মুক্তি আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। অজ্ঞান-মোহে আচ্ছন্ন থাকায় কারও কারও এ কামনা থাকে না। সুখ অনন্ত গুণ হোক, অস্তিত্ব অনন্ত এবং জ্ঞান অসীম হোক— এসব কামনা মানুষের আছে। কারণ সেটাই তার স্বরূপ, সে সমস্ত বন্ধন ও দুঃখরূপ পরিণাম থেকে মুক্ত। তাই সেই স্বরূপে ফিরে যাবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তার থাকে। মুক্তি সকলেই চায়, তা না পেলেই সাময়িক মুক্তিকে কাম্য বলে গ্রহণ করে। কিন্তু সাময়িক মুক্তির পর আবার বন্ধন আসবে তাই তা চরম কাম্য হতে পারে না। কখনো কখনো বন্ধন হবে না, কোন অজ্ঞান থাকবে না, অস্তিত্বের লয় হবে না— এইরকম স্বরূপপ্রাপ্তিই হবে চরম কামনা। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই স্বরূপে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষাই আমাদের সমস্ত কর্মে প্রেরণা যোগাচ্ছে। যা কিছু করছি এমন কি যেসব কর্ম বন্ধন সৃষ্টি করছে সেগুলিও করার পিছনে রয়েছে অনন্ত অস্তিত্ব, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষা। সেই স্বরূপে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিও হবে না। পূর্ণতালাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে চির অনির্বাণ। নিত্য বস্তুকে না পাওয়া পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নেই। একটু সুখ পেলাম পরে আবার দুঃখ এল, সেরকম সুখ আমরা চাই না, চাই অবিমিশ্র অনন্ত সুখ। কিছুকাল বাঁচলাম তারপর মৃত্যু হবে তা চাই না, চাই অনন্ত জীবন। কেন চাই? না, তাই-ই আমাদের স্বরূপ। যদি সেই স্বরূপের জ্ঞান না থাকত তাহলে আর ওগুলি পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগত না। অজ্ঞাত বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা হয় না। যে জিনিসটা আভাসে

জানি, যার একটু একটু স্বাদ পাওয়া আছে তাকে পরিপূর্ণরূপে আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা হয়।

এই আকাঙ্ক্ষার জন্য আমাদের সাময়িক সুখ সাময়িক অস্তিত্ব বা সীমিত জ্ঞানকে পরিহার করবার ইচ্ছা হয়। পরিহার না করলে সৎস্বরূপে পৌঁছাতে পারি না। ক্ষণস্থায়ী ভোগসুখের প্রতি যতদিন বৈরাগ্য না আসে এবং সব ছেড়ে অনন্ত স্বরূপের দিকে এগিয়ে না যাই— ততদিন আমাদের বদ্ধ অবস্থা এবং তা দুঃখের কারণ। ঠাকুর হোমাপাখির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, সে আকাশে উৎপন্ন হয়েছে তারপর নিচের দিকে পড়ছে, পৃথিবীতে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে তাই চোখ ফুটলেই মায়ের দিকে ছুটে চলে যায়। সেইরকম পৃথিবীর প্রতি বৈরাগ্যবান হয়ে অনন্তের দিকে যে যাত্রা তা স্বরূপের পুনঃপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাবশতই হচ্ছে। সে দিকে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যখন কোন বিষয় ভোগের জন্য উদ্গ্রীব হচ্ছি তখনো একই আনন্দের স্বাদ সেদিকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু ঐ আনন্দের সঙ্গে যে দুঃখ অনিত্যতা জড়িত সেগুলির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ঐ বিষয়গুলিকেই চাইছি। যতদিন সামান্য সুখের দিকে প্রবৃত্তি থাকবে ততদিন এই সংসারপরম্পরা জন্মমৃত্যু প্রবাহ থেকে নিস্তার নেই।

মুক্তি মানে কি? মুক্তি মানে সংসার প্রবাহ, জন্মমৃত্যু পরম্পরার কারণ যে অজ্ঞান তার নিবৃত্তি। মুক্তি কোন প্রাপ্তব্য বস্তু নয়। অর্থাৎ পেতে হবে তা নয়, মুক্তি আমাদের স্বরূপ। অজ্ঞানের যে আবরণ সাময়িক ভাবে আমাদের সত্তাকে ঢেকে রেখেছে তার অপসারণই হলো মুক্তি। মুক্তি বস্তুটি নতুন করে উৎপন্ন হবে না, আমরা স্বরূপতই মুক্ত। কেবল বদ্ধ অবস্থার যে কল্পনা করছি সেই কল্পনাকে পরিহার করতে হবে। অর্থাৎ স্বাত্মপ্রতিষ্ঠাই মুক্তি, যা পরমানন্দস্বরূপ অদ্বয় অদ্বিতীয় তত্ত্ব। আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হলে দেখব যে, বাস্তবিকরূপে আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। অতএব ভয়েরও কারণ নেই। আর আত্মা অপরিণামী বস্তু বলে আত্মার অনুভূতি সর্বদাই আনন্দস্বরূপ নিত্যস্বরূপ, সেই নিত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই মুক্তি।

আত্মজ্ঞানই হলো পরাবিদ্যা। 'অথ পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে'—পরাবিদ্যা তাকে বলে যার দ্বারা অক্ষর অবিনাশী সত্যকে পাওয়া যায়, জানা যায়। আর যে বিদ্যা আত্মজ্ঞান দিতে পারে না তা অপরাবিদ্যা। এমন কি বেদবেদাঙ্গকেও অপরাবিদ্যা বলা হয়েছে। কারণ কেবল

বুদ্ধির সাহায্যে বেদকে জানলে বা পণ্ডিতের কাছে পড়লে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। বেদে আত্মার স্বরূপ বলা আছে কিন্তু তার দ্বারা আমাদের সন্দেহ তো যাচ্ছে না। যদি কেউ হাজার বার আমাদের বলে 'তুমি ব্রহ্ম, তুমি নিত্য মুক্ত আনন্দস্বরূপ' আমরা বলব কোথায় আমরা নিত্য মুক্ত আনন্দস্বরূপ, আমরা নিত্যই দুঃখের সাগরে ডুবে আছি। এই বোধটি প্রত্যক্ষ, তাই পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা তা দূর করতে পারছি না।

শাস্ত্র বলছেন, যে বিদ্যার দ্বারা তত্ত্বকে নিঃসংশয়িতরূপে জানা যায় তার নাম পরাবিদ্যা। তা কেবল শাব্দজ্ঞান থেকে হবে না, সমস্ত শাস্ত্র পড়লেও হবে না। বিচারের সহায়ক হবে বলে শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন। কিন্তু হাজার শাস্ত্র পড়েও যে মনের সংশয় যাচ্ছে না তার কারণ মন শুদ্ধ নয়। মন শুদ্ধ হলে সংশয়রহিত জ্ঞান হতে পারে। কেবল আক্ষরিক জ্ঞান থেকে যে মুক্তি হয় না তা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। গুরু যখন শিষ্যকে বলেন তুমি ব্রহ্ম, শিষ্যের তখনই অনুভব হয়ে যাওয়ার কথা যে সে ব্রহ্ম, কিন্তু তা তো হয় না। সে মানেও বুঝল আমি ব্রহ্ম কিন্তু তার যুক্তি মাথা তুলে বলবে, কোথায় আমি ব্রহ্ম? ব্রহ্ম মানে সর্বব্যাপী, আমি সর্বব্যাপী নই ক্ষুদ্র সীমিত একটি জীব। এই যে প্রত্যক্ষ অজ্ঞান রয়েছে তার দ্বারা তথাকথিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাধিত হচ্ছে, আমরা তা অনুভব করতে পারছি না। বেদ সব শেখালেও তাতে কাজ হচ্ছে না কারণ মনের যে শুদ্ধ অবস্থা হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হবে সেই অবস্থা হচ্ছে না, তাই সংশয় যাচ্ছে না।

শুদ্ধ-জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান মানে সংশয়-বিপর্যয়রহিত জ্ঞান— যে জ্ঞানে সন্দেহ থাকবে না, ভ্রান্ত প্রতীতি আনবে না। আমরা ব্রহ্মকে সংশয়-বিপর্যয়রহিত রূপে দেখছি না, তদ্বিপরীত রূপে দেখছি। জগৎরূপে জড়রূপে দেখছি, সসীম পরিণামীরূপে দেখছি। এগুলি হচ্ছে বিপর্যয় অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান। বিপরীত জ্ঞান সামনে আসছে বলে মনে সন্দেহ উঠছে—কোন্‌টি সত্য, আমি অবিনাশী অপরিণামী সত্তা এটি, না আমি জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি যে ক্ষুদ্র জীব সেটি? সংশয় ও বিপর্যয়— এই দুয়ের থেকে নিষ্কৃতি না হলে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিচার আছে।

গুরু যখন বললেন, 'তুমি ব্রহ্ম' তখন শব্দদুটির আক্ষরিক অর্থ বুঝব। তুমি মানে কে আর ব্রহ্ম মানে কি শাস্ত্র তা বলেছেন। আমি ব্রহ্ম যখন

বলছি তখন তার অর্থ বোঝা গেল যে, আমিই হলাম সেই বস্তু যার থেকে জগতের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু কথাটির কোন মূল্য নেই কারণ সর্বদা আমাদের মনে সংশয় উঠছে— 'এ কেমন করে হয়?' এ সংশয় মনে স্থায়ীভাবেই রয়েছে কাজেই সংশয়-বিপর্যয়রহিত জ্ঞান হচ্ছে না। গুরু হাজার বার বললেও নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝতে পারছি না যে আমি ব্রহ্ম। এইরকম ব্রহ্মজ্ঞানকে শাব্দজ্ঞান বলে, যার দ্বারা মুক্তি হয় না। শাব্দ অর্থাৎ শব্দের থেকে উৎপন্ন জ্ঞান যা সংশয়-বিপর্যয়মুক্ত নয়। মনে সংশয় হচ্ছে—গুরু একথা বললেন বটে কিন্তু কই, আমি তো তা অনুভব করতে পারছি না। আর বিপর্যয় হচ্ছে— গুরু বললেন ব্রহ্ম একমাত্র সত্য কিন্তু আমি এই জগৎটা চোখের সামনে দেখছি, সব সত্য বলেই দেখছি। বিপর্যয় মানে যেটা যে বস্তু তাকে সেভাবে না দেখে অন্য ভাবে দেখা। যে ব্রহ্ম শুদ্ধ অপরিণামী বস্তু তাঁকে পরিণামী জগৎরূপে দেখা— এ হলো বিপর্যয়। আর সংশয় মানে কোন্‌টা ঠিক— ব্রহ্ম সৎ না এই জগৎ সৎ? সংশয়-বিপর্যয় যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান পরোক্ষের মতো জ্ঞান অর্থাৎ তাতে অজ্ঞান যাচ্ছে না। যে কোন ক্ষেত্রেই শাব্দজ্ঞান যদি সম্পূর্ণরূপে সংশয়রহিত হয় তাহলে তাকে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বলব। কিন্তু উপদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে সংশয়রহিত জ্ঞান হয় না। তাহলে কি করতে হবে? গুরু বললেন, তুমি ব্রহ্ম। বললেন, বিচার করে দেখ তুমি বলতে কি আর ব্রহ্ম বলতে কি বোঝায়। আমি বলতে বুঝি এই সার্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত একটি দেহ। বলছেন, এটি তোমার দেহ? তুমি যখন জন্মেছিলে বা বাল্যে তোমার যে দেহ ছিল সে দেহ এখন নেই তার থেকে বর্তমান দেহের কত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। শৈশবের দেহ আর এখনকার দেহ—এ কার দেহ? যে দেহের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে তার হতে পারে না কারণ সে তো নেই এখন। বৃদ্ধ বয়সে যে দেহকে আমার বলে বলছি তা শৈশবে ছিল না, যৌবনেও ছিল না। পরিবর্তনশীল বস্তুর মধ্যে আমি হচ্ছি সেই এক অপরিবর্তনশীল বস্তু। যেমন একটি দৃষ্টান্ত— নানা ফুলে তৈরি একটি মালা, তার ভিতরে লালফুল যেখানে আছে সেখানে সাদা নেই, সাদা ফুল যেখানে আছে সেখানে হলদে নেই, হলদে ফুল যেখানে আছে সেখানে নীল নেই। ফুলগুলি সব বদলে যাচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকটার ভিতরে সুতো একটিই আছে। প্রত্যেকটি পরিবর্তনশীল বস্তুর মধ্যে যে অপরিবর্তনশীল তত্ত্ব রয়েছে তা হলো সুতোটি। সুতরাং সুতো ফুলগুলি

থেকে ভিন্ন, কারণ তা পরিবর্তিত হচ্ছে না, ফুল পরিবর্তিত হচ্ছে। ঠিক সেইরকম এই যে আমি সেই আমিটি পরিবর্তিত হচ্ছে না। কিন্তু আমার পোষাকগুলি বদলে বদলে যাচ্ছে। কখনো ছোট একটি শরীর ছিল, কখনো বড় হয়েছে, বার্ধক্যে অপটু হয়েছে। আমি একসময়ে অজ্ঞ ছিলাম, এখন অনেক বিষয় জানি। এই যে জানা অর্থাৎ মনের পরিধি এও পরিবর্তনশীল সুতরাং আমি দেহও নই, মনও নই। তাহলে অমি কি?

তার উত্তর, বিশ্লেষণ করে এই পরিবর্তনশীল বস্তুগুলিকে বাদ দিয়ে যে অপরিবর্তনশীল বস্তু অবশিষ্ট থাকবে তা এক চৈতন্যস্বরূপ। সেটি সর্বত্র আছে, কোন অবস্থায় সেটির যদি অভাব হতো তাহলে সেই অবস্থার অনুভূতি হতো না। চৈতন্য ছাড়া অনুভব হয় না। 'আমি'র অনুভব সর্বত্র হচ্ছে আর তার পোষাকগুলি সব বদলে বদলে যাচ্ছে। সুতরাং সমস্ত পোষাকগুলি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই-ই আমি। সবগুলি বাদ দিতে দিতে একমাত্র অবশিষ্ট থাকে শুদ্ধচৈতন্য। অন্য জিনিসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেটি পরিবর্তিত হয় না কারণ সে এর থেকে পৃথক। এইজন্য এই যুক্তি দিয়ে বলা হয়, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ'— আত্মাকেই জানতে হবে। কেন জানতে হবে? না, আত্মাকে জানলে তবে মুক্তি হবে। কি করে জানব? 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো' —তাঁর সম্বন্ধে শুনতে হবে, মনন করতে হবে তারপর ধ্যান করতে হবে। শুনলাম, শুনে তার অর্থ বিপরীত আসছে, সংশয় আসছে তাই মনন করা, বিচার করা। বিচার করে করে যে বস্তুতে পৌঁছাব সেটি সংশয়রহিত। তার পরে সেই বিচারিত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে যাকে বলছেন নিদিধ্যাসন। এর ফলে কি হবে? না, আমি অব্রহ্ম, ক্ষুদ্র, পরিণামী, আমি জন্মমৃত্যুর অধীন বলে যে সংস্কার ছিল সেগুলি চলে যাবে। এইভাবে বিচার করে যখন সমস্ত সংশয় এবং বিপরীত বুদ্ধি থেকে মুক্ত হব তখনই সেই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হব। এর নাম মুক্তি।

এখন, এই যে তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা বা মুক্তি এটি যদি অর্জিত বস্তু হতো তাহলে তা নাশ হয়ে যেত, অর্জিত হলেই তার নাশ হয়। সেইজন্য বললেন, এটি অর্জিত নয়, এটি ছিল কিন্তু আমার এ সম্বন্ধে অজ্ঞান ছিল। আমার স্বরূপ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ছিল না। 'আমি ব্রহ্ম' শুনেছিলাম কিন্তু তার ফল তখনই পাইনি। যখন বিচার করে করে মনে একটা সিদ্ধান্ত স্থির

হলো তখন অনেকটা এগিয়েছি কিন্তু তখনো অশুদ্ধির যে সংস্কার তা একেবারে নিঃশেষিত হয়নি। এই সংস্কারগুলিকে বিপরীত চিন্তার দ্বারা দূর করতে হয়। নিরবচ্ছিন্ন ধারায় শুদ্ধ ব্রহ্ম সংস্কারকে প্রবাহিত করার নামই নিদিধ্যাসন। কাজেই শুনতে হবে বিচার করতে হবে তার পরে সেই বিচারের দ্বারা নির্ণীত যে বস্তু তাতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বিপরীত বুদ্ধি এবং সংশয় যতক্ষণ না দূর হচ্ছে ততক্ষণ হাজার বার 'আমি ব্রহ্ম' 'আমি ব্রহ্ম' বললেও ব্রহ্মজ্ঞান হবে না।

বেদান্তের সার কথা এই। আমাকে যে নতুন কিছু হতে হবে তা নয়, আমার যা স্বরূপ তাতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

নৈয়ায়িকরা বলেন, জ্ঞান গুণ আত্মাতে উৎপন্ন হয়। যেমন ঘটজ্ঞান। ঘট একটি আছে আমার জ্ঞান নেই তার সম্বন্ধে। ঘটকে চোখে দেখার পর বলি তাকে জানলাম। ঘটজ্ঞান আমাতে উৎপন্ন হলো, আমি ঘটজ্ঞানবান হলাম। এই জ্ঞান আত্মাতে উৎপন্ন হয়। আর যদি কিছু উৎপন্ন না হয় তবে আত্মাকে জানব কি দিয়ে? জ্ঞান দিয়েই তো জানতে হবে। প্রশ্ন ওঠে, যে জ্ঞান দিয়ে জানছি সেই জ্ঞানটির স্বরূপ কি? এখানে নৈয়ায়িক স্পষ্ট করে বিশেষ কিছু বলতে পারেন না। অদ্বৈতবাদী বলেন, যার দ্বারা সমস্ত বস্তু জানা যায় তাই হলো তোমার স্বরূপ, তা তোমার জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। কেন? না, সে সব সময় নিজে জ্ঞাতা। যে জ্ঞাতা সে কখনো জ্ঞেয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে না। আত্মা এইজন্য জ্ঞেয় নয়। বুদ্ধি আদি পরিবর্তনশীল বস্তু, সেগুলিকে অতিক্রম করে এক অপরিবর্তনশীল তত্ত্বে ফিরে যেতে হবে তবে সেই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হবে। বলছেন, বিচার করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছ সেই সংস্কারটি দৃঢ় করে রাখ। তার বিপরীত সংস্কার এসে যেন ঐ সংস্কারকে আচ্ছন্ন করতে না পারে। এই হলো নিদিধ্যাসন। এর ফলে পূর্ব-সংস্কারগুলি দুর্বল এবং ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তুমি নতুন কিছু হলে না, যা ছিলে তাই রইলে। আর নিজেকে যে অশুদ্ধ নশ্বর পরিণামী বলে কল্পনা করছিলে সে কল্পনা দূর হয়ে যাবে।

মুক্তি আমাদের চিরন্তন স্বরূপ, তার যদি উৎপত্তি হতো তাহলে নাশও হতো। ঘটটা উৎপন্ন হলে ঘটের নাশ হয়। অবিনাশী ঘট বলে কোন কথা নেই। সমস্ত জগতের লয় হয় সুতরাং ঘটেরও লয় হবে। মুক্তি সংস্কার্যও

নয়, কারণ তা শুদ্ধ স্বরূপ নিত্য, কোন গুণ তাতে নেই সুতরাং অবগুণও নেই। সংস্কার করব কি ভাবে? কোন শুদ্ধ বস্তুতে অশুদ্ধির অনুভব হলে সেই অশুদ্ধি দূর করার নাম সেই বস্তুর সংস্কার বা শোধন। ঘটটায় ময়লা লেগেছে, ময়লাগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করলাম, ঘটের সংস্কার হলো। আত্মাতে কোন ময়লা লাগে না সুতরাং আত্মা সংস্কার্য নয়। বিকার্য নয় কারণ এর পরিণাম প্রাপ্তি হয় না। দুধ যেমন দই হয় আত্মা তেমন পরিণামী হয়ে গেল, অন্যপ্রকার হয়ে গেল, তা হয় না। আপ্য নয় কারণ আত্মাকে পেতে হয় না। যা নিত্যপ্রাপ্ত তাকে আবার পাব কি? কাজেই কর্মের যে চার রকম ফল— উৎপাদ্য, সংস্কার্য, বিকার্য, আপ্য— মুক্তি এর কোনটাই নয়। তাই সমস্ত কর্মফলের অতীত আমাদের নিত্য স্বরূপ যে মুক্তি তাতে প্রতিষ্ঠার জন্যই যত সাধনা। অদ্বৈত সাধনার এই-ই হলো মূল কথা।

বিষয়টির সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায়— প্রথমে গুরুর কাছে শুনতে হবে। তৎকালে পড়া ছিল না তাই শোনা। কেউ না বললে আমি বিচার করব কি দিয়ে? কতকগুলি চিন্তার সঙ্গে তুলনা করে বিচার করতে হয়। সেই চিন্তাগুলি যোগাবে কে? শব্দ থেকে চিন্তা আসে। তারপর বিচার করতে হবে কারণ ভিতরে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে যে, আমি ব্রহ্ম হতে পারি না। বিচারের দ্বারা যখন দেখা যাবে যে গুরু এমন কোন কথা বলেননি যা পরস্পর বিরোধী তখন যে তত্ত্ব বলেছেন সেই তত্ত্বে মনকে স্থির রাখতে হবে। তার নাম নিদিধ্যাসন। এর ফলে পূর্বের সংস্কারগুলি ক্ষয় হয়ে যাবে, মনকে মার্জনা করা, ধোয়া হবে। তার উপরে যে আবরণ পড়েছিল তা যখন অপসারিত হবে, শুদ্ধ হবে, তখন যাকে মন বলছি সে আর মন থাকবে না। ব্রহ্ম হয়ে যাবে। মনকে শুদ্ধ করলে শুদ্ধ ব্রহ্ম হয়। শুদ্ধ মন শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক— এটি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা।

এখানে বললেন, পরাবিদ্যা হলো সেই বিদ্যা যার দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় আর অন্যান্য সব বিদ্যা হলো অপরাবিদ্যা। এদের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান নিত্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে না। এইজন্য তা 'অ-পর' বা নিকৃষ্ট। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভের স্তর অবধি অপরাবিদ্যার অন্তর্গত কারণ সেগুলিতে অজ্ঞান নিঃশেষে দূর হয় না। পরাবিদ্যার দ্বারা অসন্দিগ্ধ অবিপর্যস্ত জ্ঞান হবে। যাকে আমরা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বলি সেইরকম জ্ঞান হবে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। আত্মার

স্বরূপ সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান হবে, কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না, তার নাম মোক্ষ।

তাহলে মোক্ষ কোন উৎপন্ন বস্তু হলো না। মোক্ষ হলো স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি যেখানে সংশয়-বিপর্যয় থাকে না। আমরা কথায় কথায় বলি মুক্তি পাব। যে মুক্তি পেতে হয় সে মুক্তি স্থায়ী হয় না। বলছেন—

'তৎ যথা ইহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।
এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে॥'

—এই জগতে কর্মের দ্বারা অর্জিত ভোগ যেমন ভোগ করতে করতে ক্ষয় হয়ে যায়, সেইরকম যাগযজ্ঞাদি দ্বারা অর্জিত স্বর্গাদি ফলও ক্ষয় হয়ে যায়। সেগুলি ক্ষয় হয়ে গেলে আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হয়। সমস্ত কর্মফলের উপর যখন বৈরাগ্য আসে তখন নির্বিশেষে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়।

পূর্বোক্ত শ্লোকে অবশ্য ফলদায়ক যেসব যজ্ঞকর্মাদি অনুষ্ঠান করতে বললেন, পরবর্তী শ্লোকগুলিতে সেই কর্মসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছেন—

'যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ॥' (১।২।২)

সমিদ্ধে হব্যবাহনে (সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নিতে) যদা হি (যখনই) অর্চিঃ (অগ্নিশিখা) লেলায়তে (লেলিহান হয়) তদা (তখন) আজ্যভাগৌ (আজ্যভাগদ্বয়ের) অন্তরেণ (মধ্যে, আবাপস্থানে) আহুতীঃ (আহুতিসমূহ) প্রতিপাদয়েৎ (দেবতার উদ্দেশে প্রক্ষেপ করিবে)।

অগ্নি সম্পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত হলে তার শিখাগুলি যখন লেলিহান হয়, তখন আজ্যভাগদ্বয়ের মধ্যে আহুতিসমূহ অর্পণ করবে।

'সমিদ্ধে হব্যবাহনে'—অগ্নি সম্পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত হলে তার শিখাগুলি যখন লেলিহান হয়, জ্বলজ্বল করে তখন আজ্যভাগদ্বয়ের মধ্যে আহুতিসমূহ অর্পণ করবে। অগ্নি সর্বদেবতার মুখস্বরূপ। অগ্নিকে আহুতি দিলে উদ্দিষ্ট দেবতাকে অর্থাৎ যে দেবতাকে উদ্দেশ করে দেওয়া হচ্ছে সেই দেবতাকে তিনি তা পৌঁছে দেন। অগ্নির শিখা যে জ্বলজ্বল করছে, কাঁপছে, সেটি বোঝাতে বলছেন অগ্নি জিভ বাড়িয়ে আছেন। সাতটি জিভ আছে। অগ্নি সেই জিভ দিয়ে আহুতিকে গ্রহণ করবেন বলে অগ্নি জ্বলে উঠেছেন। বলছেন, অগ্নি যখন জ্বলে উঠেছে তখন সেই শিখাগুলিতে আহুতি দিতে হবে। দিতে হবে কোথায়? 'আজ্যভাগৌ অন্তরেণ আহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ'

—আজ্যভাগের উত্তর দক্ষিণ দুইভাগ, তার মাঝখানে অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে। এখানে অগ্নিহোত্র যাগের কথা বলা হয়েছে, যে যাগে অগ্নিকে দুটি ভাগে কল্পনা করা হয়। তার মাঝের ভাগে আহুতি দিতে হয়। অগ্নির শিখারূপ যে সাতটি জিভের কথা বলা হলো তাদের নামও আছে পরবর্তী শ্লোকে। এই অগ্নিহোত্র যাগ অনুষ্ঠান করা সহজসাধ্য নয়, ত্রুটিবিচ্যুতিহীন নিখুঁতভাবে অনুষ্ঠিত না হলে তার দ্বারা যজমানের অকল্যাণ হয়। তাই পরবর্তী শ্লোকে সতর্ক করে দিচ্ছেন—

'যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসম্
অচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতম্
আসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি॥' (১।২।৩)

—যস্য (যে অগ্নিহোত্রিয়) অগ্নিহোত্রম্ (অগ্নিহোত্রযাগ) অদর্শম্ (দর্শযাগ রহিত), অপৌর্ণমাসম্ (পূর্ণমাসযাগ-রহিত), অচাতুর্মাস্যম্ (চাতুর্মাস্য- কর্ম -বর্জিত) অনাগ্রয়ণম্ (শরদাদিতে নবান্ন দ্বারা করণীয় ক্রিয়া-রহিত) অতিথিবর্জিতম্ চ (এবং প্রত্যহ অতিথি-পূজা শূন্য), অহুতম্ (যথাসময়ে আহুতি- প্রদান-রহিত) অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব-কর্ম -শূন্য) অবিধিনাহুতম্ (অশাস্ত্রীয়রূপে আহুত) [হয়], [সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম] তস্য (সেই যজমানের) আসপ্তমান্ লোকান্ (ভূরাদি সত্যান্ত সপ্তলোক, অথবা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, যজমান, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র) হিনস্তি (বিনষ্ট করে)

অগ্নিহোত্রের সঙ্গে সঙ্গে যিনি দর্শযাগ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্যযাগ এবং আগ্রয়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করেননি, অতিথিসেবাশূন্য, যথাকালে এবং যথাবিধি আহুতি দেননি, যাঁর যজ্ঞে বৈশ্বদেব যাগরূপ অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়নি, সেই যজমানের সপ্তলোক পর্যন্ত বিনষ্ট হয়।

যেমন ভাবে বলা আছে ঠিক সেইরকম ভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হবে। অগ্নিহোত্রের সঙ্গে সঙ্গে যিনি দর্শযাগ আর পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্যযাগ এবং আগ্রয়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করেননি, যথাকালে এবং যথাবিধি আহুতি দেননি, যাঁর যজ্ঞে বৈশ্বদেব যাগরূপ অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়নি সেই যজমানের সপ্তলোক পর্যন্ত বিনষ্ট হয়। দর্শযাগ কৃষ্ণপক্ষে এবং পৌর্ণমাসযাগ শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠেয়। দুটি যাগের আলাদা আলাদা আহুতি বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞ দুটি অগ্নিহোত্রের অঙ্গ না হলেও অবশ্য করণীয়। সুতরাং এ দুটি যিনি না করেন তাঁর যজ্ঞ 'অদর্শমপৌর্ণমাসম' —দর্শ ও পৌর্ণমাসবিহীন। সেইরকম অগ্নিহোত্রের সঙ্গে সঙ্গে চাতুর্মাসযাগ করতে হয়, সেই যাগের অনুষ্ঠান যিনি করেননি তাঁর যজ্ঞ 'অচাতুর্মাস্যম্'। 'অনাগ্রয়ণম্' —বর্ষায় শরতে বসন্তে তিনবার আগ্রয়ণ

ব্রত করতে হয়। যিনি তা করেননি তাঁর ব্রত 'অনাগ্রয়ণম্'। বৎসরকে তিনটি চর্তুমাসে বিভক্ত করে প্রতি বিভাগের প্রথম পূর্ণিমায় এই যাগ করতে হয়। যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে আরও এইগুলির কথা আছে—'অতিথি বর্জিতং চ'— অতিথি এলে তার সেবা করা, সেটিও এই যজ্ঞের অংশ। যদি কেউ তা না করে থাকে তবে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না। এরপর 'অহুতম্' অর্থাৎ যথাকালে যে আহুতি দেয়নি, 'অবৈশ্বদেবম' যে বৈশ্বদেবযাগ করেনি, 'অবিধিনা হুতম্'— আহুতি দিয়েছে অথচ তা যদি বিধিপূর্বক না দিয়ে থাকে তাহলে 'আসপ্তমান্ লোকান্ হিনস্তি' —তার সপ্তলোক পর্যন্ত নষ্ট হয়। অর্থাৎ যজ্ঞের ফলে তার সপ্তলোক লাভ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা হয় না। কাজেই তার যজ্ঞ আয়াস মাত্র হলো, কোন ফল হবে না যেসব ভোগের স্থানে তার যাবার সম্ভাবনা ছিল সেগুলি সব নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলছেন, এই যাগযজ্ঞ করা সহজ কথা নয়। আমরা দেখেছি যখন পূজা হয়, দুর্গা পূজা বা কালী পূজার সময় বিশেষ করে যখন বলিদান হয় সব একেবারে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে মা মা করে যেন কোন বিঘ্ন না হয়, হলে সর্বনাশ। এই ভয় সেই বেদের কথা থেকে আসছে। বললেন, করলে ঠিকভাবে করো তা নাহলে ক্ষতি হবে।

বেদে অনেক জায়গায় এই ভয়ের কথা বলা আছে। এক জায়গায় বলছেন, অসুররা ইন্দ্রকে বিনাশ করবার জন্য যজ্ঞ করছেন। এই যজ্ঞ থেকে যে পুরুষ উৎপন্ন হবে সে ইন্দ্রশত্রুকে বিনাশ করুক, মানে আমাদের শত্রু যে ইন্দ্র তাকে বিনাশ করুক। কিন্তু বলবার সময় ইন্দ্রশত্রু কথাটার উচ্চারণ একটু ভিন্নভাবে হয়েছে। তার ফলে হলো ইন্দ্র যার শত্রু হবে অর্থাৎ ইন্দ্র যাকে বিনাশ করবে সে উৎপন্ন হোক। অতএব ফল বিপরীত হয়ে গেল। নিখুঁতভাবে না করা হলে বিপরীত ফলের আশঙ্কা আছে। পুরাণকারদের কথায়ও ঐরকম পাওয়া যায় যে, রামকে পরাজিত করে জয়লাভের জন্য রাবণ যজ্ঞ করছে। এই উপলক্ষে চণ্ডীপাঠ হচ্ছে। পাঠক এত সুন্দরভাবে পড়ে যাচ্ছেন যে, কোথাও ত্রুটি হচ্ছে না। অতএব হনুমান মাছি হয়ে গিয়ে সেই পুঁথির উপরে বসলেন যাতে পাঠে ভুল হয় কিন্তু পাঠক পড়তে অভ্যস্ত বলে ভুল হলো না, ঠিক পড়ে গেল। হনুমান যখন দেখলেন এভাবে উদ্দেশ্য সফল হলো না তখন নিজ মূর্তি ধরে তার হাত থেকে পুঁথি কেড়ে নিলেন, ফলে যজ্ঞ পণ্ড হয়ে গেল। এই রকম অনেক গল্প

আছে। এখনো যাগযজ্ঞ করতে হলে লোকে সশঙ্কিত হয়ে করে। না হলে যে দেবীকে মা বলছে তাঁর কাছে আবার ভয় কি? ভয়ের কারণ হচ্ছে এই পূজা সকাম। সকাম পূজার ভিতরেই ভয় আছে, ত্রুটি হলে যথোচিত শাস্তি পেতে হবে। এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যজ্ঞ করতে যাচ্ছ তার যে ফল হবে না তা বলছি না কিন্তু সাবধান, একটু ত্রুটি হলেই বিপরীত ফল হবে।

'সপ্ত লোকান্ হিনস্তি' কথাটির আরও অর্থ আছে। সপ্তলোক মানে সাত পুরুষ। উর্ধ্বতন তিন পুরুষ —পিতা পিতামহ প্রপিতামহ, অধঃস্তন তিন পুরুষ— পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র, মাঝখানে যজ্ঞকর্তা নিজে— এই সাতলোকের অনিষ্ট হয়। এদের লোক বলা হলো কেন? না, এদের দ্বারা যজমানের কল্যাণ সাধিত হয়। পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এঁদের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করলে তাঁদের আশীর্বাদে কল্যাণ লাভ হয় আর পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি যজমানের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করে, বৃদ্ধ বয়সে তাকে পালন করে তাই এদের দ্বারা কল্যাণ লাভ হয়।

'কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ।।' (১।২।৪)

কালী, করালী চ, মনোজবা চ, সুলোহিতা, যা চ (এবং যিনি) সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, দেবী (জ্যোতির্ময়ী) বিশ্বরুচী চ [অগ্নির এই] সপ্ত (সাতটি) লেলায়মানাঃ জিহ্বাঃ।

অগ্নির এই সাতটি লেলায়মান জিহ্বা— কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং বিশ্বরুচী।

অগ্নির এই সাতটি জিহ্বা। কালী— কৃষ্ণবর্ণ বলে কালী বলছেন, করালী— ভয়ঙ্করা, মনোজবা— মনের মতো গতিশীল, সুলোহিতা—সুন্দর লাল রং, সুধূম্রবর্ণা— ধূমের মতো বর্ণ, স্ফুলিঙ্গিনী— যাঁর ভিতর থেকে স্ফুলিঙ্গ ঝরছে আর বিশ্বরুচী দেবী— চারদিক থেকে সৌন্দর্যময়ী যে দেদীপ্যমানা অগ্নিশিখা। এই হলো অগ্নির সাতটি শিখা। অগ্নির সাতটি শিখা কম্পিত হচ্ছে, জ্বলছে, বলা হচ্ছে ও শিখা নয়, ও অগ্নি দেবতার জিহ্বা, তিনি তোমার আহুতি গ্রহণ করবার জন্য তাঁর সাতটি জিভ বাড়িয়েছেন। তার

পরের শ্লোকে বলছেন—

'এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ॥' (১।২।৫)

ভ্রাজমানেষু (দেদীপ্যমান) এতেষু (এই অগ্নিজিহ্বাসমূহে) যঃ (যে অগ্নিহোত্রী) চরতে (কর্মানুষ্ঠান করেন), এতাঃ (এই) আহুতয়ঃ চ (আহুতিসমূহও) সূর্যস্য রশ্ময়ঃ (সূর্যরশ্মি হয়ে এবং সূর্যকিরণ অবলম্বনে), যথাকালম্ হি (যথাকালেই) তম্ (সেই যজমানকে) আদদায়ন্ (=আদদানাঃ, গ্রহণপূর্বক) [সেখানে] নয়ন্তি (নিয়ে যায়) যত্র (যে স্বর্গে) দেবানাম্ (দেবগণের) একঃ পতিঃ (সর্বাগ্রণী অধিপতি ইন্দ্র কিংবা প্রজাপতি) অধিবাসঃ (অধিষ্ঠিত আছেন)

এই শিখাগুলি জ্বলে ওঠার পর যজমান যথাসময়ে তাতে আহুতি দিলে আহুতিসমূহ সূর্যরশ্মি হয়ে সেই যজমানকে দেবতাদের ঊর্ধ্বতম অধিপতি ইন্দ্র যেখানে থাকেন সেখানে নিয়ে যায়।

এই শিখাগুলি জ্বলে উঠবার পর যজমান, যজ্ঞকর্তা যথাসময়ে তাতে আহুতি দিলে শিখাগুলি অর্থাৎ তৎ তৎ অভিমানিনী দেবতারা দেবতাদের অধীশ্বর ব্রহ্ম যেখানে থাকেন সেই ব্রহ্মলোকে তাঁকে নিয়ে যান। যেগুলি অগ্নির শিখা ছিল সেগুলি সূর্যের রশ্মি হয়ে যজমানকে বহন করে নিয়ে যায় তার অর্জিত ফললাভের জন্য। কোথায় নিয়ে যায়? 'যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ'— দেবতাদের ঊর্ধ্বতম স্থানবাসী ইন্দ্র যেখানে থাকেন সেখানে নিয়ে যায়। যজ্ঞ করে যে ঈশ্বরকে যজমান লাভ করবেন তিনি হলেন ইন্দ্র, দেবতাদের ঈশ্বর। যে লোকে যজমানকে নিয়ে যাবে সেটি ইন্দ্রলোক অথবা ব্রহ্মলোক। আরও বলছেন, শিখাগুলি তাঁকে সসম্মানে নিয়ে যায়। আহুতির ফলে সেই সেই শিখায় অভিমানিনী দেবতারা তখন তাঁকে সম্মান করে 'আসুন, আসুন' বলে নিয়ে যান। শুধু নিয়ে যান না, সম্মান করে স্তুতিগান করতে করতে নিয়ে যান।

'এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ
সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥' (১।২।৬)

এহি এহি ইতি (এস এস এইরূপে আহ্বান করতে করতে [এবং] এষঃ (ইহাই) বঃ (তোমাদের) পুণ্যঃ (শুভ অদৃষ্ট), সুকৃতঃ (স্বরচিত মার্গ), [ও] ব্রহ্মলোকঃ (কর্মফল-স্বরূপ মার্গ বা হিরণ্যগর্ভলোক) [এইরূপ] প্রিয়াম্ (অভীষ্ট) বাচম্ (স্তুতিবাক্য) অভিবদন্ত্যঃ (উচ্চারণ করতে করতে) [এবং] অর্চয়ন্ত্যঃ (পূজা করতে করতে) সুবর্চসঃ (দীপ্তিমান) আহুতয়ঃ (আহুতিসকল) তম্ যজমানম্ (সেই যজমানকে) সূর্যস্য (সূর্যের) রশ্মিভিঃ (কিরণ পথে) বহন্তি (নিয়ে যায়)।

সেই আহুতিরা জ্যোতির্ময় হয়ে এসে সূর্যরশ্মির দ্বারা যজমানকে বহন করে নিয়ে যায় ও 'আসুন' 'আসুন' বলে সম্ভাষণ করে এবং বলে— এই তোমাদের পুণ্য, তোমাদের স্ব-কর্মরচিত মার্গ ও কর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ।

সেই আহুতিরা জ্যোতির্ময় হয়ে এসে সূর্যের রশ্মির দ্বারা যজমানকে বহন করে নিয়ে যায় ও সম্ভাষণ করে বলে 'এহি এহি'— 'আসুন আসুন'। আরও নানা স্তুতি বাক্যে তাদের প্রশংসা করে সম্মান জানিয়ে বলে, তোমাদের পুণ্যের ফলস্বরূপ এই ব্রহ্মলোক, এই পবিত্র ভোগময় লোক ভোগ কর। এই হলো ভোগের চরম লোক, এর থেকে বেশি ভোগের কিছু নেই।

অপরাবিদ্যার দ্বারা এই পর্যন্তই যেতে পারি, ভোগের চরম সীমায় উপস্থিত হতে পারি কিন্তু তার পারে নয়। তাহলে অপরাবিদ্যাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কেন? না, যাতে অপরাবিদ্যার স্বরূপ বুঝে তাতে বৈরাগ্য আসে। ভোগে বৈরাগ্য না আসা পর্যন্ত মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয় না। ইহজগতে বা পরজগতে কোন ভোগই যখন আর আকর্ষণের বস্তু থাকে না সেই 'ইহামুত্রফলভোগ বিরাগঃ' এলে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার হয়।

ইহজগতে বা পরজগতে যে ভোগ তারই পরাকাষ্ঠার অবস্থা হলো পূর্বোক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তি। অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের অধিষ্ঠাতা হিরণ্যগর্ভ। 'কিন্তু'— এত করেও এর ভিতর কিন্তু রয়ে গিয়েছে।

ব্রহ্মলোকে হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তিকেই যজ্ঞের চরম ফল বলছেন। ব্রহ্মলোকে গতি বলতে দুরকমের গতির কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে উপনিষদের সার সংক্ষেপ করে গীতায় আছে—

'অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥' (৮।২৪)

—অগ্নি জ্যোতি দিন শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণের ছয় মাস এই মার্গে গমন করে ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এইটি দেবযান মার্গ বা উত্তরায়ণের

পথে যাওয়া। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও জ্ঞানীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি এক নয়। যে মুহূর্তে জ্ঞান লাভ হয় সেই মুহূর্তেই জ্ঞানীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। তার জন্য আর কোন লোকে যেতে হয় না। দেবত্ব প্রাপ্তির জন্য যেমন দেবলোকে যেতে হয় ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য সেরকম ব্রহ্মলোকে যাবার দরকার হয় না। অজ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থই ব্রহ্মপ্রাপ্তি, ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা। সুতরাং এখানে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলা হচ্ছে তাকে আপেক্ষিক অর্থে বুঝতে হবে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তি। হিরণ্যগর্ভও ব্রহ্ম কিন্তু সেখান থেকেও ফিরে আসতে হয়—

'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন!' (৮।১৬)

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সব লোক থেকেই ফিরে আসতে হয়।

দ্বিতীয় মার্গ পিতৃযান বা দক্ষিণায়নের পথ যার বর্ণনা গীতায় আছে—

'ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥' (৮।২৫)

—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস এই মার্গে গমন করে যোগী 'চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ'— চন্দ্রলোক বা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। সেখানে তার কর্মফল ভোগ করে আবার সংসারে ফিরে আসে।

এখন, যিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না— 'যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে', আবার ব্রহ্মলোক থেকেও ফিরে আসতে হয় এ দুটি বিরোধী মতের সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে আসে ক্রমমুক্তির প্রসঙ্গ। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সাধকদের সেখানে অবস্থান কালে তাঁদের অজ্ঞানের যে লেশ ছিল, জ্ঞানের বাধক যেটুকু ছিল তা যদি দূর হয়ে সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহলে তাঁদের আর ফিরে আসতে হয় না। তাঁরা পরব্রহ্মেই লীন হন, মোক্ষলাভ করেন। এরই নাম ক্রমমুক্তি। কিন্তু অপর শ্রেণীর সাধক যাঁদের সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হয়নি তাঁরা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করেন। কিন্তু ব্রহ্মলোকের ভোগ শেষ হলে তাঁদের পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। তাই বলা হয়েছে— 'পুনরাবর্তিনঃ।'

'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥' (১।২।৭)

—যেষু (যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে) অবরম্ (নিকৃষ্ট, অর্থাৎ জ্ঞানরহিত) কর্ম (কর্ম) উক্তম্ (শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে) [সেই] যজ্ঞরূপাঃ (যজ্ঞ সম্পাদক) অষ্টাদশ (ষোড়শ ঋত্বিক, যজমান ও পত্নী) প্লবাঃ (বিনাশী) হি (কারণ) এতে (এরা) অদৃঢ়াঃ (অস্থির, অনিত্য)। [অতএব] এতৎ (এই কর্মকে) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়োলাভের উপায়) [মনে করে] যে (যে সকল) মূঢ়াঃ (অবিবেকীরা) অভিনন্দন্তি (সমাদর করে) তে (তাহারা) পুনঃ এব অপি (কিছুকাল স্বর্গভোগের পর পুনর্বার) জরা মৃত্যুম্ (জরামৃত্যুরূপ সংসারদশা) যন্তি (প্রাপ্ত হয়)।

আঠারোজন মিলে জ্ঞানের তুলনায় নিকৃষ্ট যজ্ঞ সম্পাদন করে যেসব মূঢ় নশ্বর এবং অস্থির এই যজ্ঞকে শ্রেয় বলে বরণ করে তারা আবার জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

যে যজ্ঞমার্গ অবলম্বন করে মানুষ ভোগের পথে এগিয়ে যাচ্ছে সেই যজ্ঞটি কিন্তু প্লবঃ অর্থাৎ নশ্বর এবং অস্থির, স্থির নয়। যজ্ঞ মানে যজ্ঞের ফল।

যজ্ঞকর্মে যজমান, যজমান পত্নী ও ষোলজন ঋত্বিক, এই আঠারোজন ব্যক্তির প্রয়োজন, তাই বলা হয়েছে 'অষ্টাদশোক্তম্'। এই ষোলজন ঋত্বিক হলেন চারজন করে হোতা, উদগাতা, অধ্বর্যু ও প্রস্তোতা। হোতা যজ্ঞে আহুতি দেন, উদগাতা স্তব স্তুতি গান করেন, অধ্বর্যু ক্রমানুসারে যজ্ঞকার্য পরিচালনার নির্দেশ দেন আর প্রস্তোতা প্রস্তাব নামক বিশেষ স্তব পাঠ করেন। যজমান-পত্নীর বিশেষ কোন কাজ থাকে না, সপত্নীক ধর্ম আচরণের জন্য তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন। যাই হোক, এই আঠারোজনে মিলে যে যজ্ঞটি হচ্ছে সেটি কিন্তু 'অবরম্'— নিকৃষ্ট। নিকৃষ্ট কেন? না, জ্ঞানের তুলনায় নিকৃষ্ট।

যেসব মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা যজ্ঞকে 'অভিনন্দন্তি'— প্রশংসা করে, শ্রেয় বলে বরণ করে তারা 'পুনরেবাপি জরামৃত্যুং যন্তি'— আবার জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জন্মমৃত্যুর পরম্পরার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। অপরাবিদ্যার এই হলো পরিণাম। জ্ঞানের উদয় না হলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটলেও সেখান থেকে আবার ফিরে আসতে হবে। তাই যজ্ঞকে নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। কিন্তু নিকৃষ্ট হলেও বেদে তো যজ্ঞের নিন্দা নেই বরং হাজার রকমের যাগযজ্ঞের উল্লেখ আছে এবং সেগুলিও শাস্ত্রবিহিত কর্ম। একথাও বলা হয়েছে যতদিন বেঁচে থাকবে অগ্নিহোত্র করবে— 'যাবজ্জীবং অগ্নিহোত্রম্ জুহুয়াৎ'। অতএব যজ্ঞের নিন্দা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য পরিণামটি জানিয়ে দেওয়া। তারপর যার ইচ্ছা সে

করুক। ভোগের পরাকাষ্ঠাও তাই বর্ণনা করা হয়েছে বহুস্থানে। কঠোপনিষদে স্বর্গলোকের বর্ণনা আছে যেখানে জরামৃত্যু নেই, ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই—

'স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥' (১।১।১২)

মানুষ যতদূর কল্পনায় আনতে পারে সবরকম ভোগের বর্ণনা অন্যত্রও আছে। ভোগ করতে করতে শরীর জীর্ণ হবে নচিকেতার এ আশঙ্কাও অমূলক কারণ সেখানে জরা-ই নেই। সুতরাং যত খুশি ভোগ কর, ভোগ্য সামগ্রীও অফুরন্ত—স্রকচন্দন বনিতাদি পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে কোন বিষয় শাস্ত্র বলে দিচ্ছেন। অতএব যে ব্যক্তি এই স্বর্গলোক আকাঙ্ক্ষা করে সে-ই এই যজ্ঞকর্মকে অভিনন্দন জানাবে।

সেইজন্যই শাস্ত্র এখানে বৈরাগ্য উৎপাদন করার জন্য বলেছেন, কোন ভোগই চিরস্থায়ী হতে পারে না। অর্জিত বস্তুমাত্রেই ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়ে যায়। চাষী চাষবাস করে ফসল ফলাল, ভাণ্ডারে তা সঞ্চয় করল। কিন্তু সঞ্চয় যতই হোক ভোগ করতে করতে একদিন তার ক্ষয় হবেই। পরকালের ভোগও তেমনি ক্ষয় হয়ে যাবে। যা কিছু উৎপাদ্য তা অবশ্য বিনাশ্য। অস্তিত্বমান যে কোন বস্তুর ছয়টি বিকার হবেই—'জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অবক্ষীয়তে, নশ্যতি'। একটা বস্তু উৎপন্ন হলো তারপর তার স্থিতি, বৃদ্ধি ও পরিণতি হলো তারপর ক্ষয় হয়ে নাশ হয়ে গেল। উৎপন্ন বস্তুমাত্রেরই এই ক্রমিক পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, এর বিপরীত হতে পারে না। সুতরাং স্বর্গের ভোগগুলি যদি অর্জিত হয় তাহলে তার নাশ হবেই। কল্পনার দৃষ্টিতে ভোগকে অক্ষয় বলতে পারি কিন্তু বিচার করলে দেখব আমার কর্মের পরিণাম হচ্ছে ভোগ্য বস্তুর সৃষ্টি এবং তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। এ সবই উৎপত্তির ব্যাপার সুতরাং অনিবার্যভাবে বিনাশসাপেক্ষ। হয় সেই ভোগের রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে, না হয় দেখব ভোগ্য বস্তুগুলি লোপ পাচ্ছে। সুতরাং শাস্ত্র যতই প্রলোভিত করুন যে এগুলি অক্ষয় হয়ে থাকবে তা হতে পারে না। তেমনভাবেই হতে পারে না অমরত্বলাভ। অমরত্ব এখন নেই পরে লাভ হবে তাহলে তা উৎপাদ্য বস্তু, উৎপাদ্য বস্তু হলেই তার নাশ হবে। সুতরাং অমরত্ব লাভ কখনো স্থায়ী হতে পারে

না। যদিও দেবতারা বলেছেন— 'অপাম সোমমমৃতা অভূম' —আমরা সোমরস পান করেছি, অমর হয়েছি, কিন্তু সে কথা ঠিক নয়।

এইরকম 'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনো ফলং ভবতি' —চাতুর্মাস্য ব্রত করলে অক্ষয় ফল হয় ইত্যাদি বাক্য ঐ একই কারণে গ্রাহ্য হতে পারে না। গীতায় বলেছেন— 'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ...' (২।৪২) — অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরাই বেদের কর্মকাণ্ডের স্বর্গফলাদি প্রকাশক প্রীতিকর বাক্যে নিরত। 'পুষ্পিতাং বাচম্' — যেন ফুল দিয়ে সাজানো এই আপাত মনোহর বাক্যগুলি। শুধু আমাদের শাস্ত্রে নয়, সব দেশের শাস্ত্রে এই রকমই একটা অক্ষয় সুখের কল্পনা থাকে কিন্তু সে অবস্থা লাভ করা কোনদিন কোন ভাবেই সম্ভব হবে না। অবশ্য বৌদ্ধরা স্বর্গাদি মানেন না তেমনি জীবনও মানেন না। তাঁদের লক্ষ্য হলো দীপ নির্বাণ, জীবনদীপটি নিভিয়ে দেওয়া। আর কিছু থাকবে না তারপর। তাঁরা বলেন, জীবন মানেই দুঃখ, সেখানে দুঃখ ছাড়া আর কিছু তাঁরা দেখেন না। সুতরাং দুঃখের নিবৃত্তি হলেই সব শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকদের মতে কেবল দুঃখ-নিবৃত্তি আমাদের লক্ষ্য নয়, আমরা সুখও পেতে চাই। সুখ সকলেই চায় কিন্তু স্বর্গেও যদি চিরস্থায়ী সুখ না পাওয়া যায় তবে স্বর্গপ্রাপ্তিতে লাভ কি? আমরা চাই চিরস্থায়ী সুখ চিরস্থায়ী আনন্দ যা থেকে কোন দিন বিচ্যুত হতে হবে না। যাগযজ্ঞাদির ফলে চিরকাল স্বর্গসুখ লাভ করবে এ অনেকটা 'চিরজীবী হও'— এই লৌকিক আশীর্বাদের মতো। কোন জীবের পক্ষে যেমন চিরজীবী হওয়া সম্ভব নয় এমন কি ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিদের পক্ষেও নয়, তেমনি চিরস্থায়ী স্বর্গসুখ লাভও সম্ভব নয়। উভয়ক্ষেত্রেই চির শব্দের অর্থ সুদীর্ঘ ধরে নিলে শ্রুতির উক্তিতে কোন অসামঞ্জস্য থাকে না।

সুতরাং জ্ঞানের তুলনায় যজ্ঞাদি যে নিকৃষ্ট এইটি বুঝতে হবে। কিন্তু মোহগ্রস্ত আমরা এই 'পুষ্পিতা' বাক্‌কে অভিনন্দিত করি অতএব জন্মমৃত্যুর আবর্ত থেকে রক্ষা পাই না। সমস্যা হচ্ছে এই, জগৎ যে দুঃখময় এই বোধটি আমাদের মনে পাকা নয়। ভাবি জন্মটা মন্দ নয়, এমনকি পরের বার এইভাবে জন্মাব একথাও আমরা বলে থাকি। যেন জন্মানোটা আমাদের হাতের মুঠোয়। শাস্ত্র বলেছেন, যার যেমন কর্ম সেই অনুসারে তার জন্ম হবে, কেবল আকাঙ্ক্ষা করলেই হয় না। তবে এই আকাঙ্ক্ষাই জন্মমৃত্যু

প্রবাহের মূলে। আমাদের স্বভাব হলো দুঃখকে এড়িয়ে যাওয়া, চোখ বন্ধ করে দুঃখকে অস্বীকার করে সুখের কল্পনা করা। তাই জন্মের সূচনা থেকেই যে দুঃখ তা আমরা স্বীকার করতে চাই না, বলি, ছোটবেলা কত সুখের। শিশু তাহলে এত কাঁদে কেন? স্বামীজী বলেছেন, প্রাণ সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন। সে যে বেঁচে আছে তার প্রমাণ তার ক্রন্দন। শিশু কাঁদে আমরা হাসি যেন তার কান্নাটা কান্না নয়। মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত জীবন যে কত দুঃখের মধ্যে দিয়ে এসেছে তাও শাস্ত্রকাররা বলেছেন—'আদৌ কর্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ক্বথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ।'

(শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্—শ্লোক ১)

—প্রথমে কর্মফলে আসক্তি হেতু মাতৃগর্ভে স্থিত আমাকে পাপ ব্যথিত করেছে। মাতৃগর্ভেই বিষ্ঠা ও মূত্ররূপ অপবিত্র বস্তু মধ্যে জঠরাগ্নি আমাকে অত্যন্ত সন্তপ্ত করেছে। বাল্যকালের বর্ণনা আছে— 'বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা' (ঐ, শ্লোক ২)— বাল্যে আমার দুঃখের আতিশয্য ছিল তখন শরীর মলে লিপ্ত এবং স্তন্যপানে পিপাসা ছিল। এছাড়া রোগ শোক বিষয়-বাসনার মধ্যে দিয়ে আমরণ দুঃখ ভোগের বর্ণনা রয়েছে।

এত দুঃখের মধ্যেও যে ছিটেফোঁটা সুখ নেই তা নয় কিন্তু বিচার করে দেখলে সে সুখবোধ অতি ক্ষণস্থায়ী। কখনো অপরের সুখের সঙ্গে তুলনা করে ঈর্ষা হয়, কখনো বা এই সুখ যদি চিরস্থায়ী না হয় এই ভেবে মনে আসে শঙ্কা। সুখের সঙ্গে মিশে যায় দুঃখ বোধ। একে pessimism বা নৈরাশ্যবাদ বলা ভুল। বিচারশীল মনের এইটি সিদ্ধান্ত। যে সুখগুলি আপাত মনোরম বলে মনে হয় বিচার করলে দেখা যায় সেগুলি প্রকৃত সুখরূপ নয়। গীতায় বলছেন—'অনিত্যমসুখং লোকম্'— এই জগৎ অনিত্য দুঃখময়। বুদ্ধদেবও বললেন, জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখকে চেন, স্বীকার কর। এই হলো বৈরাগ্যবান বিচারশীল দৃষ্টি। আমরা এভাবে দেখি না, বুঝতে পারি না। নিজেরাও যে সংসারানলে পুড়ে মরব তা জেনেও স্বীকার করি না, এর থেকে নির্বুদ্ধিতা আর কি আছে?

শাস্ত্র বলছেন বিচার কর। বিচার করলে কোন সুখই আর মনোরম বলে বোধ হবে না। দুদিনের জন্য মনে হতে পারে বেশ আছি কিন্তু সে বেশ থাকা কিছুই নয়। দুদিন পরেই আঘাতে দুঃখে জীবন দুঃসহ

হয়ে উঠবে। ঠাকুর বলতেন, মাছ জাল মুখে করে পাঁকে মুখ গুঁজে থাকে আর ভাবে আমি বেশ আছি। জানে না যে এখনই জেলে হিড় হিড় করে ডাঙায় টেনে তুলবে আর জীবন যাবে। আমাদেরও সেই কাদায় মুখ গুঁজে থাকার মতো অবস্থা। এরই নাম মোহগ্রস্ত হয়ে থাকা, বিচার না করার ফল এই। কিন্তু এই অবস্থা তো কাম্য হতে পারে না। তাই বলেছেন, 'এতদ্ শ্রেয়ঃ যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ'— যে সকল মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা একে শ্রেয় বলে মনে করে তারা পুনরায় জন্মমৃত্যুগ্রস্ত হয়। অভ্যুদয়ের দিকে মানুষের এই গতি অকল্যাণকর হলেও সাধারণ মানুষ এটাকেই শ্রেয় বলে ভাবে এবং যারা সংসারের অভ্যুদয় সম্বন্ধে উদাসীন তাদের এরা নির্বোধ এবং কৃপার পাত্র মনে করে। অবিদ্যার মধ্যে থাকলেও বালকবুদ্ধিবশত মানুষ মনে করে আমরা কৃতার্থ, জগতে যা করণীয় তা করেছি, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

পরবর্তী শ্লোকে এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে—

'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥' (১।২।৮)

অবিদ্যায়াম্ (অজ্ঞানের) অন্তরে (মধ্যে) বর্তমানাঃ (অবস্থিত) মূঢ়াঃ (মুগ্ধ ব্যক্তিগণ) স্বয়ম্ (আমরা নিজেরাই) ধীরাঃ (ধীমান), [এবং] পণ্ডিতং মন্যমানাঃ (সর্ব বিষয় জানিয়াছি—এইরূপে আপনাদিগকে বড় মনে করে) [ও] জঙ্ঘন্যমানাঃ ([বহু অনর্থে] বারম্বার পীড়িত হতে হতে) অন্ধেন এব (অন্ধেরই দ্বারা) নীয়মানাঃ (পরিচালিত) অন্ধাঃ যথা (অন্ধদের ন্যায়) পরিযন্তি (পরিভ্রমণ করে থাকে)।

অবিদ্যার অন্ধকারের মধ্যে ডুবে রয়েছে এমন ব্যক্তিরা নিজেদের জ্ঞানী পণ্ডিত বলে মনে করে এবং বহু অনর্থে পীড়িত হতে হতে অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের মতো পরিভ্রমণ করতে থাকে।

সাধারণ মানুষ এইরকম 'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ'— অবিদ্যার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, জ্ঞানের লেশমাত্র নেই তবু নিজেকে জ্ঞানী পণ্ডিত বলে মনে করে। তারা বলে, কি ধর্ম ধর্ম করে জীবনটা নষ্ট করছ, জীবনকে ভোগ কর। যতক্ষণ পার ভোগ করে নাও। চার্বাকপন্থী জড়বাদীদের এই সিদ্ধান্ত। মরে গেলেই সব ঝামেলা চুকে যাবে, তার আগে যতদিন বেঁচে

থাক ভোগ করে নাও। সাধারণ লোক এর বেশি ভাবতে পারে না। তারা জানে না যে, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা হন্যমান হয়ে বারবার নানাবিধ দুঃখ ও আঘাত পেতে হয়। 'বেশ আছি' এই বোধের, এই ভুলের মাশুল দিতে হয় সুদে আসলে। এই মতের যারা প্রচারক ও যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের অবস্থা 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ'। একজন অন্ধ যদি পাঁচজন অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় তাহলে সবাই মিলে যেমন গর্তে বা খানায় কিংবা কাঁটা ঝোপে পড়ে, এও ঠিক তেমনি। যে এই পথে যায় এবং যারা তাদের অনুসরণ করে সুখের বদলে তারা আঘাতের পর আঘাতই পায়।

প্রসঙ্গত ভাগবতের একটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য। এক রাজা সভা করে বসে আছেন, এমন সময়ে সেখানে এক অবধূত এলেন, দেখলেই বোঝা যায় দিব্যশক্তিসম্পন্ন। রূপবান তরুণ কিন্তু সংসার সম্বন্ধে এমন কি নিজের দেহ সম্বন্ধেও উদাসীন, পরিপূর্ণ জ্ঞানমূর্তি। মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত। রাজা বিস্মিত হলেন, যাঁর সর্বাঙ্গে কোন ভোগের চিহ্ন নেই, নেই কোন ভোগের উপকরণ, তিনি এত আনন্দ কোথা থেকে পেলেন! ভোগ্যবস্তু থেকেই তো আনন্দ আসে। রাজার প্রশ্নের উত্তরে অবধূত বললেন, 'আমার আনন্দের উৎস আমার ভিতরে, আনন্দের জন্য বাইরের কোন বস্তুর অপেক্ষা নেই।' পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজীকেও বহুবার শুনতে হয়েছে, তোমার ভিতর এত প্রতিভা রয়েছে তুমি কিছু করছ না কেন? জগৎকে তো একটা তাক লাগিয়ে দিতে পারতে! এই হলো পণ্ডিতম্মন্যদের কথা। ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করা ভোগ করা যশখ্যাতি অর্জন করা এই যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। ইহ ও পরজগতে ভোগের প্রতি আসক্তিবশত তারা এরকম মনে করে এবং শুধু নিজেরাই এ পথে চলে না অন্যদেরও চালায়। তার পরিণাম এই হয় যে, পুনঃ পুনঃ রোগশোকাদি তাড়িত হয়ে সংসার কূপে পতিত হয়—'জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি' (১।২।৭)— আবার তারা জরামৃত্যুগ্রস্ত হয়।

এই বক্তব্যই বিশদ করেছেন পরবর্তী শ্লোকে।

'অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥' (১।২।৯)

অবিদ্যায়াম্ (অজ্ঞানে) বহুধা (বহু প্রকারে) বর্তমানাঃ (অবস্থিত) বালাঃ (বালকসদৃশ অজ্ঞানীরা) বয়ম্ (আমরা) কৃতার্থাঃ (কৃতার্থ) ইতি (এইরূপ) অভিমন্যন্তি (= অভিমান করে)। যৎ (যেহেতু) রাগাৎ (কর্মফলে আসক্তিবশত) কর্মিণঃ (কর্মিগণ) ন প্রবেদয়ন্তি (প্রকৃত তত্ত্ব জানে না) তেন (সেই হেতু) ক্ষীণলোকাঃ (কর্মফল ভোগাবসানে) আতুরাঃ (দুঃখার্ত হয়ে) চ্যবন্তে (স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়)।

ভোগলিপ্সু ব্যক্তিরা বহুপ্রকার অজ্ঞানের মধ্যে ডুবে থেকে বালকবুদ্ধিসম্পন্ন নির্বোধের মতো 'আমরা কৃতার্থ'— এরকম অভিমান করে থাকে। যেহেতু কর্মফলে আসক্তিবশত কর্মিগণ প্রকৃত তত্ত্ব জানে না, সেজন্য কর্মফলভোগ শেষ হলে সে দুঃখার্ত হয়ে ভোগলোক থেকে বিচ্যুত হয়।

ভোগলিপ্সু ব্যক্তিরা বহুপ্রকার অজ্ঞানের মধ্যে ডুবে রয়েছে, জীবনের লক্ষ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই তবু নিজেদের কৃতার্থ মনে করছে। ঠাকুর বলছেন, মানুষ বিদ্যার্জন করে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, বলে বেশ আছি, যা করণীয় করেছি। এখানে বলছেন এতেই যারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে তারা 'বালাঃ'—বালকবুদ্ধিসম্পন্ন নির্বোধ, অবিবেকী বিচারশক্তিহীন। এরা রাগবশত, আসক্তিবশত আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। জীবনের লক্ষ্যকে জানে না, নিজেকে জানে না, কি করণীয় তাও জানে না। তাই নানাভাবে দুঃখগ্রস্ত হয়ে পীড়িত হয়ে 'ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে'— অর্জিত ভোগের সামগ্রী যখন ক্ষয় হয়ে যায়, আবার সে লোক থেকে পতিত হয়, বিচ্যুত হয়।

ঠাকুর বলতেন, সুঁদুরী কাঠ যখন পোড়ে প্রথমটা বেশ জ্বলে তারপর শেষের দিকে যখন রস মরে আসে তখন ফ্যাঁচ ফোঁচ করে জল বেরোয়, নিভেই গেল হয়তো। ভোগাসক্ত মানুষ ভোগ করে, ভাবে না সেটা ক্ষণস্থায়ী। ভোগ অন্তে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হবে, সে আরম্ভ কিভাবে কোন স্তর দিয়ে হবে তা অজ্ঞাত। পশ্চাতে সঞ্চিত কর্মের স্তূপ, হয়তো কোন ঘৃণ্য জন্ম লাভ হবে। কোন্ অবস্থায় পড়ব তা অনিশ্চিত। স্বর্গলাভ হলো আবার সেখান থেকে বিচ্যুত হলো— পুরাণাদিতে কখনো কখনো তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে পুরাণে ভোগসুখের বর্ণনা বর্ণবহুল। পুরাণ পড়লে মনে হয় স্বর্গলাভের চেয়ে বড় কাম্যবস্তু আর কিছু নেই। 'কামাত্মানঃ স্বর্গপরা'—কামনাপ্রবণ ব্যক্তির কাছে স্বর্গই চরম লক্ষ্য। কিন্তু ভোগ সুখের পরে কি হবে তা আর ভোগাসক্ত মানুষ ভাবতে চায় না। সেটি কল্পনা করলে সমস্ত সুখের চিত্র কালিমালিপ্ত হয়ে যাবে। তাই ভোগের চিত্রটিই

সামনে ধরে রাখে, অবশ্যম্ভাবী পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে চোখ বন্ধ করে থাকে। এদেরই কথা পরবর্তী শ্লোকে বলেছেন—

'ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥' (১।২।১০)

প্রমূঢ়া (সংসারে প্রমত্ততা হেতু মূর্খ ব্যক্তিরা) ইষ্টা পূর্তম্ (ইষ্ট অর্থাৎ শ্রৌত যাগাদি ও পূর্ত অর্থাৎ বাপীকূপাদির প্রতিষ্ঠারূপ স্মার্ত কর্মকে [প্রঃ ১।৯]) বরিষ্ঠম্ (প্রধান) মন্যমানাঃ (মনে করে) অন্যৎ (অপর, আত্মজ্ঞানাখ্য) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ সাধন) ন বেদয়ন্তে (জানে না)। তে (তারা) নাকস্য (স্বর্গের) সুকৃতে (ভোগায়তন) পৃষ্ঠে (উপরিভাগে) অনুভূত্বা (= অনুভূয়, [কর্মফল] অনুভব করে) ইমম্ লোকম্ (এই মনুষ্যলোকে) বা (অথবা) হীনতরম্ (তীর্যঙ্নরকাদি লোকে) বিশন্তি (প্রবেশ করে)।

সংসারে প্রমত্ত মূঢ় ব্যক্তিরা শ্রৌত এবং স্মার্ত কর্মকে শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকর মনে করে, এর চেয়ে ভাল পথ আছে বলে তারা জানে না। তারা স্বর্গে গিয়ে কর্মের সুফল ভোগ করে এই মনুষ্যলোকে অথবা নিম্নতর লোকে প্রবেশ করে।

সংসার-প্রমত্ত মূঢ় ব্যক্তিরা 'ইষ্টাপূর্তং'— শ্রৌত এবং স্মার্ত কর্মকে শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকর বলে মনে করে, তদপেক্ষা শ্রেয় পথ আছে বলে তারা জানে না। পরিণামে কি হয়? না, 'নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা'—স্বর্গে গিয়ে কর্মের ভাল ভাল ফল ভোগ করে 'ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি'—এই মনুষ্যলোকে অথবা নিম্নতর লোকে প্রবেশ করে। ভাব হচ্ছে এই যে, তারা যদি শাস্ত্রদৃষ্টিতে বিচার করে কল্যাণের পথে যেত তাহলে হয়তো জন্মমৃত্যুর পরম্পরা থেকে মুক্তি পেতে পারত। তা না করে ইহ ও পরজগতের ভোগকে তারা শ্রেয় মনে করে। ভোগান্তে আবার যখন ফিরে আসে তখন হয় মনুষ্য জন্ম, না হয় তার চেয়ে কোন হীনতর জন্ম হয়। জন্মমৃত্যুর আবর্তের কারণ পুঞ্জীভূত সংস্কার, তদনুসারে দেহান্তর প্রাপ্তি। সেখানে মানুষের কোন স্বতন্ত্রতা থাকে না।

মনুষ্যজীবনে শুভাশুভ কর্ম করবার শক্তি থাকে, জীবনকে শুভ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করলে পরবর্তী জীবন তার দ্বারা কতকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। শুভ প্রেরণার ফলে সাধনার অনুকূল হয় এমন জীবন লাভ করে এবং তখন সাধনা অনুসারে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত ভোগপ্রবণ হলে স্বর্গাদি

লাভ করে ভোগ করে এবং ভোগে নিরত জীবনে শুভ চিন্তার অবকাশ থাকে না। ভোগপ্রাচুর্যে মত্ত থাকায় দেবতাদেরও বিচারশক্তি খর্ব হয়ে যায়। পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম অনুসারে জীব হয়তো কখনো মনুষ্যজন্ম লাভ করতে পারে তবে পশুপক্ষী আদি ইতর জন্মের সম্ভাবনাই বেশি। এই পশুপক্ষীরূপ ভোগদেহে উচ্চ জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না ভোগদেহ লাভের তাৎপর্য হলো দেহে আর নতুন শুভাশুভ কর্ম হয় না কেবল পূর্ব কর্মের ফল ভোগ হয়। দেবতা এবং পশুদের জন্ম এই পূর্ব কর্মফল ভোগের জন্য। পশুর বিচারের সামর্থ্য নেই, তারা কেবল প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম করে তাই নতুন কর্ম সঞ্চয় হয় না। এজন্য কোন কোন ধর্মে বলে পশুদের আত্মা নেই, থাকলে ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণ করত। নিয়ন্ত্রণ নেই বলে ইন্দ্রিয়াদি তাদের কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য আর্য সিদ্ধান্ত অনুসারে আত্মা ছাড়া কোন ভোগ হয় না। পশুজীবন একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে রাগ লোভাদি প্রবৃত্তির মতো লজ্জাও আছে। তবে শুভ কর্মে প্রবৃত্ত করবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।

মানুষের মধ্যে অনেকাংশে পশুভাব থাকলেও হিতাহিত বুদ্ধি থাকার জন্য সে পশু অপেক্ষা উচ্চস্তরের। সে কখনো কখনো এই ভোগ স্পৃহা থেকে নিজেকে সংযত করে ভবিষ্যৎ অকল্যাণের আশঙ্কায় আপাত প্রীতিকর কর্ম থেকে বিরত হয়। তার ভিতর সুখদুঃখের পরিমাণ যেন কমবেশি সমান, ফলে এর কোন একটির দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত হয় না। শুভাশুভ বিচার করে কর্তব্য অকর্তব্য নির্ণয়ক্ষম বলে মানুষ পশু অপেক্ষা উচ্চস্তরের।

দেবতাদের আমরা মানুষের চেয়ে উচ্চস্থান দিই কিন্তু অত্যন্ত ভোগপ্রবণ বলে তাঁরা মানুষের চেয়ে অধম। অবশ্য বিচার-বিবেকসম্পন্ন কিছু স্তরের দেবতাও আছেন। যেমন উপনিষদে আছে ইন্দ্র আত্মজ্ঞান লাভ করতে গেলেন। আত্যন্তিক ভোগলিপ্ত বলে মানুষের তুলনায় তাঁরা নিরপেক্ষ বিচার সার্মথ্যহীন। যেমন লৌকিক ধারণায় প্রভূত ঐশ্বর্যে লালিত পালিত ব্যক্তিদের ভগবানের দিকে মন দেওয়া কঠিন। আবার নিদারুণ দারিদ্র্যপীড়িতদের অবস্থাও তাই। মধ্যবর্তীরা বিচার করে মন ভগবানের দিকে দিতে পারে। মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে বলে দেবতার চেয়ে মনুষ্যজীবন শ্রেয়তর বলা হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানের মাত্রা সম্পর্কে শাস্ত্র বলছেন যে, অন্যান্য লোকে এই জ্ঞান জলের উপর ছায়া কি স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট। মনুষ্যলোকে দর্পণে

প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতো সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

'যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥' (কঠ উপ., ২।৩।৫)

—দর্পণে যেমন সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় মনুষ্যলোকে শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা আত্মার দর্শন সেইরকম সুস্পষ্ট। স্বপ্নের মতো দর্শন হয় পিতৃলোকে, জলে প্রতিবিম্বিত দৃশ্যের মতো দর্শন হয় গন্ধর্বলোকে, ব্রহ্মলোকে ছায়া এবং আলোকের ন্যায় আত্মা এবং অনাত্মা অত্যন্ত ভিন্নরূপে উপলব্ধ হয়। ব্রহ্মলোকের পরেই মনুষ্যলোকের স্থান, অন্যান্য লোক তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাৎপর্য হচ্ছে মানুষ ইচ্ছা করলে মনুষ্যজন্মে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। সুতরাং মানবজীবন লাভ করলে অভ্যুদয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে নিঃশ্রেয়স লাভের চেষ্টা করা উচিত। ভবিষ্যতে এমন সুযোগ কবে হবে ঠিক নেই অতএব এখনই তার উদযোগ করা উচিত। তারপর বলছেন—

'তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥' (১।২।১১)

শান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয়) বিদ্বাংসঃ (জ্ঞানী গৃহস্থগণ) [এবং] যে (যাঁহারা, যে সকল বাণপ্রস্থ ও কুটীচকাদি সন্ন্যাসী) ভৈক্ষচর্যাম্ (ভিক্ষাবৃত্তি) চরন্তঃ (অবলম্বনপূর্বক) অরণ্যে হি (অরণ্যেই [অবস্থান করে]) তপঃ শ্রদ্ধে (তপঃ অর্থাৎ স্বাশ্রমবিহিত কর্ম এবং শ্রদ্ধা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা) উপবসন্তি (সেবা অর্থাৎ অনুষ্ঠান করেন) তে (তাঁহারা) বিরজাঃ (রজঃ শূন্য অর্থাৎ ক্ষীণ পাপপুণ্য হয়ে) যত্র (যে সত্যলোকাদিতে) সঃ হি (সেই প্রসিদ্ধ) অমৃতঃ (অমর) অব্যয়-আত্মা (যাবৎ সংসার স্থায়ী অব্যয় স্বভাব) পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভ) [অবস্থিত আছেন, সেখানে] সূর্য দ্বারেণ (উত্তরায়ণ মার্গে) প্রয়ান্তি (প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন)।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক অরণ্যে বাস করে যেসব জ্ঞানী ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় হয়ে তপস্যা ও শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান করেন তাঁরা রজঃ শূন্য অর্থাৎ অনেকাংশে পবিত্র হয়ে উত্তরায়ণের পথে সেই লোকে যান, যে লোকে নিত্য অবিনাশী অব্যয়াত্মা পুরুষ অবস্থিত আছেন।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক অরণ্যে বাস করে যে সব জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় হয়ে তপস্যা ও শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান করেন তাঁরা মলিনতামুক্ত হয়ে 'সূর্যদ্বারেণ' অর্থাৎ উত্তরায়ণের পথে সেই লোকে যান যে লোকে নিত্য

অবিনাশী অব্যয়াত্মা পুরুষ অবস্থিত আছেন। এখানে তপস্যার অর্থ আশ্রমবিহিত কর্ম আর শ্রদ্ধা মানে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা। 'বিদ্বাংসঃ' অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরা, তবে চরম জ্ঞানের কথা বলছেন না, উপাসনা-প্রধান সাধকদের কথা বোঝাচ্ছেন। তাঁরা 'ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ'— অরণ্যে জীবিকার অন্য উপায় নেই বলে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে থাকেন। 'অরণ্যে হি'— অরণ্য বলতে জঙ্গল নয়, বানপ্রস্থ অবলম্বনকালে সংসার থেকে দূরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তপস্যাদি করতে পারে এমন জনবিরল স্থান বোঝাচ্ছে। 'বিরজাঃ'— সম্পূর্ণরূপে রজমুক্ত বা অজ্ঞান মলিনতা মুক্ত না হলেও অনেকাংশে পবিত্র। 'অমৃতঃ পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা'— 'অক্ষর পুরুষ নয়' এখানে হিরণ্যগর্ভকে লক্ষ্য করে বলা হলো কারণ কল্পান্তকাল স্থায়ী এ হিরণ্যগর্ভত্ব অমৃত। আপেক্ষিক অমৃত এই যুক্তিতে বলা হয়েছে। কর্ম ও উপাসনার চরম পরিণতি এই হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তি, কর্মাদির দ্বারা এর অধিক লাভ হতে পারে না। হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তি সহজ কথা নয় কারণ জগতের আদিতে ইনি, সর্বজগতের যিনি আত্মা, যাঁর প্রভাব অনতিক্রমণীয়। তথাপি এই অবস্থা ত্রিগুণাতীত অবস্থা নয়। সাধকরা সেই লোকে যেতে চান যেখানে সেই নিত্য অবিনাশী অক্ষর পুরুষ আছেন।

এই অক্ষর পুরুষই তো ব্রহ্ম, তাহলে কি এখানে ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি বোঝাচ্ছে? কেউ কেউ একে মুক্তি বলেছেন। আমরা দুটি কারণে একে মুক্তি বলি না। একটি কারণ হলো 'প্রয়ান্তি' বলা হয়েছে— সেখানে যায়, গিয়ে লাভ করতে হয়। এটি ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ নয়, ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া মাত্রই ব্যক্তিত্বের লোপ হয় সুতরাং কোথাও যাবার কথা আসে না। বলা হয় জ্ঞানী পুরুষের মৃত্যুর পর এখানেই সব শেষ হয়ে যায়। 'উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহোত নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে' (বৃ. উ., ৩।২।১১)— তার প্রাণসমূহ দেহ থেকে উৎক্রমণ করে লোকান্তরে যায় না, এখানেই লয়প্রাপ্ত হয়। এখানে উত্তরায়ণে যাচ্ছে সুতরাং এটি ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা নয়। দ্বিতীয় যুক্তি হলো এখানে প্রকরণ হচ্ছে কর্ম এবং উপাসনা, জ্ঞানের নয়। মুক্তি এখানে লক্ষ্য নয়, অমৃত অব্যয় প্রভৃতি শব্দকে আপেক্ষিক বুঝতে হবে।

ভোগের দিক থেকেও স্বর্গাদি ভোগের চেয়ে এখানে অনন্ত গুণ ভোগ কাজেই এটি আদর্শ বস্তু, চরম ফল। কিন্তু ভোগের পর বিচার আসে। যে বিচার পরবর্তী শ্লোকে আরম্ভ করেছেন—

'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥' (১।২।১২)

অকৃতঃ (নিত্য বস্তু) কৃতেন (কর্মদ্বারা) ন অস্তি (হয় না) [এইরূপে] কর্মচিতান্ (কর্মদ্বারা নিষ্পাদিত) লোকান্ (কর্মফলসমূহকে) পরীক্ষ্য (পরীক্ষা করে, অর্থাৎ অনিত্যরূপে নিশ্চয় করে) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) নির্বেদম্ (বৈরাগ্য) আয়াৎ (লাভ করবেন)। তৎ (সেই নিত্যপদ) বিজ্ঞানার্থম্ (জানবার জন্য) সঃ (সেই নির্বেদ প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ) সমিৎ-পাণিঃ (সমিদ্ভার হস্তে নিয়ে) শ্রোত্রিয়ম্ (বেদজ্ঞান-সম্পন্ন) ব্রহ্মনিষ্ঠম্ (ব্রহ্মৈকপরায়ণ) গুরুম্ এব (গুরুর সকাশেই) অভিগচ্ছেৎ (যাবেন)।

ব্রাহ্মণ কর্মের দ্বারা অর্জিত ফলসমূহ পরীক্ষার দ্বারা তার অনিত্যতা উপলব্ধি করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। সেই ব্রাহ্মণ সেই পরম সত্য কর্মের দ্বারা লভ্য নয় বলে সমিৎপাণি হয়ে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় নেবেন।

'ব্রাহ্মণঃ'— এখানে ব্রহ্মজ্ঞ নন, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু, যাঁর ব্রহ্ম সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান হয়েছে এখনও সাক্ষাৎকার হয়নি। শীঘ্রই ব্রহ্মজ্ঞ হবেন এই ভবিষ্যৎ স্বরূপের কথা ভেবে ব্রাহ্মণ বলা হচ্ছে। তিনি কি করবেন? কর্মের দ্বারা অর্জিত ফলসমূহ পরীক্ষার দ্বারা তার অনিত্যতা উপলব্ধি করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। বৈরাগ্যের পরিণাম তিনি কি বুঝবেন? কার্য নয় এমন বস্তু কার্যের দ্বারা লাভ করতে পারা যায় না। ব্রহ্মস্বরূপতা নিত্যবস্তু উৎপাদ্য নয়; তাই তাকে 'অকৃতঃ' বলা হচ্ছে। সেই পরমসত্য কর্মের দ্বারা লভ্য নয় বলে সাধক ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য সমিৎপাণি হয়ে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় নেবেন।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পরীক্ষা করে বুঝবে যার দ্বারা চরম প্রয়োজন সিদ্ধ হবে এমন কোন বস্তু এ জগতে নেই। সাময়িক যা ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর বলে মনে হয় তা-ও অনিত্য। পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত হবে 'নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন'— অকৃত অর্থাৎ নিত্যবস্তু কৃত অর্থাৎ অনিত্য কর্মের দ্বারা লাভ হয় না। সংসারে কোন নিত্যবস্তু নেই আবার 'কৃতেন নাস্তি মে প্রয়োজনম্' —অনিত্য বস্তুতে আমার প্রয়োজন নেই। শাস্ত্র বলেন, আমরা যা কিছু কর্ম করি তার ফল চার রকম— উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য ও সংস্কার্য। কর্তার চেষ্টায় যে কার্য উৎপন্ন হয় তা হলো উৎপাদ্য। যেমন কুম্ভকার

মাটি দিয়ে ঘট উৎপন্ন করে। ক্রিয়া বা চেষ্টার দ্বারা যাকে পাওয়া যায় তা হলো আপ্য। যেমন গাছে ফল আছে আমাকে চেষ্টার দ্বারা তাকে পেতে হবে। বিকার্য— ক্রিয়ার দ্বারা যার রূপান্তর হয়। যেমন দুধ দই-তে পরিণত হলো। সংস্কার্য— কর্মের দ্বারা যার দোষ দূর করা যায়। যেমন কোন জিনিস ব্যবহারের অযোগ্য হয়েছে তাকে সংস্কার করে নেওয়া হলো।

ব্রহ্মবস্তু 'অকৃতঃ' অর্থাৎ নিত্য, এই চতুর্বিধ কর্মের মধ্যে পড়েন না। তিনি নিত্য তাই উৎপাদ্য নন অর্থাৎ সৃষ্ট হন না। যা উৎপন্ন হয় তারই বিনাশ আছে, ব্রহ্মবস্তুর বিনাশ নেই। ঘট উৎপন্ন হয় তাই তার বিনাশ আছে। আবার যাগযজ্ঞাদি কর্ম করে পুণ্য লাভ হয়; পুণ্যটি আগে ছিল না পরে উৎপন্ন হলো, স্বর্গাদি ফল লাভ হলো, এই ফলের বিনাশ আছে কিন্তু ব্রহ্মের কোন কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকায় তিনি নিত্য বর্তমান, অবিনাশী। ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য নন কারণ তিনি আমাদের স্বরূপ। ব্রহ্মস্বরূপ সর্বদোষমুক্ত তাই সংস্কার্য নন। আর অপরিণামী ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভব নয় অতএব বিকার্য নন। সুতরাং ব্রহ্ম কোন প্রকার কর্মেরই ফলস্বরূপ হবেন না, ইহলোক বা পরলোক কোন লোকেরই কর্মফল তিনি নন, তাই নিত্য। সমস্ত লোকই কর্ম-নিষ্পন্ন তাই অনিত্য, ব্রহ্ম চতুর্বিধ কর্মের অতীত।

সমস্ত লোকে নিত্য পদার্থ যখন কিছু নেই সাধক তখন নিত্য অমৃত অভয় কূটস্থ অচল শাশ্বত ব্রহ্মের কথা ভেবে নির্বেদ প্রাপ্ত হবে, বৈরাগ্য লাভ করবে। অবিনাশী অসংস্কার্য নিত্য ও নিত্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মকে জানতে হবে।

প্রশ্ন ওঠে যে, যদি কর্মের দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ না করা যায় তাহলে তাঁর সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? কিভাবে তাঁকে জানা যাবে? তিনি নিত্য হলেও তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ নেই; আমাদের স্বরূপ হলেও সে স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ; তিনি অপরিণামী সর্বদোষমুক্ত হলেও আমরা তাঁকে জানি না। তাঁকে জানলে, ব্রহ্মস্বরূপ বোধ হলে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সফল হবে। সাধকের বোধ হবে সে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অপরিণামী অবিনাশী আনন্দস্বরূপ। এই বোধটি হলে তার আর জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়ে আসা যাওয়া হবে না। সুতরাং আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা আমাদের চরম উদ্দেশ্য। শিষ্য এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরুর কাছে যাবে। কিভাবে যাবে? যজ্ঞকাষ্ঠ হাতে নিয়ে। সেবার দ্বারা গুরুর প্রসন্নতা লাভ করলে তবে এই তত্ত্ব জানা যায়। শিষ্য কেবল জিজ্ঞাসু হয়ে নয় সেবাপরায়ণ

হয়ে বিনীত হয়ে জ্ঞানলাভের জন্য গুরুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করবে। গুরুকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করবে, এ ছাড়া অন্য পথ নেই। কারণ ব্রহ্মবিদ্যা সাধারণ বিদ্যা নয় যে সূত্র (formula) জেনে নিলে হয়ে গেল। এখানে শাস্ত্রের বিশেষ নির্দেশ এই যে, কেবল নিজের বুদ্ধির সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সফল হওয়া যায় না। কারণ মলিন মন নিয়ে মানুষ যতই চিন্তা করুক তার বাইরে যেতে পারে না। তাই স্বতন্ত্র বিচারের সাহায্যে সেই তত্ত্বে পৌঁছানোর জন্য গুরুর সমীপে যেতেই হবে। গুরুই কেবল পথনির্দেশ করতে পারেন। নিজের অশুদ্ধ ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না; যাঁরা শুদ্ধমনা, তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, অভিজ্ঞ, কেবল তাঁরাই সে পথের নির্দেশ দিতে পারেন।

যে-গুরুর কাছে যাবে তাঁর বিশেষ গুণ থাকা চাই। তিনি কেবল বেদজ্ঞ নন অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান কেবল বুদ্ধিগম্য নয় তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হবেন। অন্যত্র গুরুর সম্পর্কে বলা হয়েছে— গুরু হবেন 'অবৃজিন অকামহত'। যিনি নিষ্পাপ, যাঁর আচরণ শুদ্ধ এবং অকামহত অর্থাৎ বাসনাতাড়িত নন এমন গুরুর কাছে যাবে। তিনি শুধু বেদজ্ঞ হবেন না, তাঁর আচরণের দ্বারা প্রমাণিত হবে তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করছেন। গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ যেমন বলা হয়েছে।

আর শিষ্যের লক্ষণ কি? তাঁকে তপশ্চর্যা করতে হবে, ভক্ত শুশ্রূষু শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও ভগবদ্ বিশ্বাসী হতে হবে। এইরূপ গুণসম্পন্ন শিষ্য উপদেশ লাভের অধিকারী বা যোগ্য। সংক্ষেপে এই প্রকার গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ।

যতক্ষণ পার্থিব সুখ আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা থাকে ততক্ষণ ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। এ জগতে যদি আমরা সব পাই তাহলে এর থেকে অতীত কোন জিনিস যা বাস্তবিক আছে কি না জানি না, চেষ্টা করে লাভ হবে কি না তার কোন নিশ্চয়তা নেই এমন বস্তুর সন্ধানে যাব কেন? সেজন্য জাগতিক বস্তুর অকিঞ্চিৎকরত্ব বোধ না এলে, ভোগ্যবিষয়ে বৈরাগ্য না হলে, ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে কেউ যায় না। অতএব আগে বৈরাগ্য আসা দরকার। বৈরাগ্য আসবে কি করে? জগতের ভোগগুলিকে বিশ্লেষণ করে ভেবে চিন্তে দেখবে, এই যা আমি পাচ্ছি যার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি এগুলি কি প্রকৃতই পাবার মতো জিনিস? এর দ্বারা আমার আকাঙ্ক্ষা কি যথার্থই পূর্ণ হবে? এগুলি বাস্তবিক কতটা তৃপ্তি দিতে পারে সেটাই

ভোগ্যবস্তুর পরীক্ষা। তারপর বৈরাগ্য আসবে। একটু ভোগবিমুখতা এলে বিচারের সামর্থ্য এলে তটস্থ হয়ে বিচার করতে হবে ভোগ্য বস্তুগুলি যথার্থই কাম্য কি না।

জগতে যা কিছু কর্মের দ্বারা অর্জিত তার ক্ষয় হয়ে যায়। সুতরাং স্বর্গাদি যেহেতু পুণ্য কর্মের দ্বারা অর্জিত সেহেতু ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়ে যাবে। যে যত স্থির ভাবে এগুলি বিচার করবে তার কাছে সত্য ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সে তখন বুঝবে জাগতিক জিনিস কখনো কাম্য হতে পারে না। সুতরাং মনে বৈরাগ্য আসবে।

বৈরাগ্য এলে ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে কি করবে? উদ্ধারের উপায় খুঁজবে। কেমন ভাবে খুঁজবে সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'প্রদীপ্তশিরা জলরাশিমিব' —যার মাথায় আগুন জ্বলছে সে যেমন জল খোঁজে তেমনি করে সংসারবিরাগী ব্যক্তি গুরুকে খোঁজে। এই খোঁজা গতানুগতিক নিয়ম অনুসারে খোঁজা নয়, প্রবল বৈরাগ্য এলে জন্মমৃত্যু পরম্পরা থেকে উদ্ধারের পথনির্দেশককে খোঁজার মতো। গুরু উপসদন তখনই হবে। কিরূপ গুরু পথের নির্দেশ দিতে পারেন বুদ্ধি দিয়ে যতটা সম্ভব বিচার করে দেখতে হবে। শাস্ত্র বলছেন, গুরুর আচরণ শিষ্যের আদর্শের সঙ্গে মেলে কি না—বিচারের এই প্রণালী।

বর্তমান যুগে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ অপরের কাছে যাওয়া বা তাঁর দ্বারা পরিচালিত হওয়ার চেয়ে নিজের বুদ্ধির দ্বারা বিচারকেই শ্রেয় ভাবে। শাস্ত্রের নির্দেশ প্রয়োজন হলে শাস্ত্র পড়ে নেওয়া যাবে। বুদ্ধি শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রপাঠ অভ্রান্ত সত্যে পৌঁছে দিতে বা সংশয়মুক্ত করতে পারে না। যে অতীন্দ্রিয়লোকের সন্ধান চাইছি তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের ভিতর দিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়, এর অতীত হতে হবে। সেইজন্য এইভাবে জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছেন এমন কোন ব্যক্তির আশ্রয় নিতে হবে। এই কারণে সদ্গুরুর আবশ্যক।

এখন দুটি প্রশ্ন মনে জাগবে। সেরকম ব্যক্তি না পাওয়া গেলে কিংবা আমাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে ভুল করলে তা সংশোধনের কোন অবকাশ আছে কি না। আমরা ভাবি যে-কোন একজনকে গুরুরূপে গ্রহণ করে তাঁর উপদেশ মতো চলতে পারি। কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ হলো গুরু যেমন শিষ্যকে পরীক্ষা করেন সে যোগ্য আধার কি না, শিষ্যকেও বিচার করতে

হবে কে গুরুপদে বৃত হবার যোগ্য। আর আদর্শ অনুযায়ী গুরু না পেলে যিনি অন্তরে আছেন তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে, তিনি সে প্রার্থনা শুনবেন।

আমরা প্রায়শ বলি বিবেক যা বলে তা করা উচিত। বিবেক মানে যদি বিচার শক্তি হয় তা কি চিরকাল একরকম থাকে কিংবা সকলের একরকম হয়? তা যদি না হয় তাহলে স্বীয় বিবেকের অনুসরণে সুফল লাভ হবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? বিবেক অভ্রান্ত কি না তা নির্ভর করে যে বিচার করে তার মনের শুদ্ধির উপর। যে বিষয়টি জীবনমরণ সমস্যার চেয়েও বড় সে পথে অগ্রসর হতে হলে কেবল নিজের অশুদ্ধ মনের উপর নির্ভর না করে অন্বেষণ করতে হয় কে সত্যে পৌঁছে দিতে পারেন। শাস্ত্র এইজন্যই সদ্গুরুর আশ্রয় নিতে বলেছেন। আমরাও বুদ্ধি দিয়ে এর প্রয়োজনীয়তা বুঝি।

তেমন ব্রহ্মজ্ঞ না পাওয়া গেলে যাঁরা সেই পথের পথিক তাঁদের সঙ্গে বিচার বিনিময় করে দেখলে অন্তত কিছুটা পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকলেও একেবারে বিপথগামী হবার ভয় থাকে না। মন যত শুদ্ধ হবে ধারণা তত স্পষ্ট হবে, বিচারের দ্বারা বোঝা যাবে কোন্‌টি কল্যাণের পথ। অলস কল্পনা না করে সাধনা করে এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে গেলে ক্রমশ লক্ষ্য স্পষ্টতর হবে। গুরুর নির্দেশ আমাদের বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে সঙ্গত কিনা দেখতে হবে। যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় এমন পথে যাওয়া ঠিক নয়, গুরুও অদ্ভুত কোন পথনির্দেশ করবেন না যা শিষ্যের বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। তাতে বিপরীত ফল হবে। পরস্পরের সহায়তা হবে এমন পথে চলা ভাল, তা নাহলে গুরুশিষ্যের সম্পর্কই হয় না। এজন্যই শাস্ত্র গুরুকে নিষ্পাপ এবং কামনাশূন্য হতে বলেছেন। বাসনাপ্রেরিত হয়ে কোন লাভের আশায় গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিলে উভয়ের মধ্যে দেনাপাওনার সম্পর্ক এসে পড়ে এবং এতে উভয়েরই অকল্যাণ। অকামহত গুরু অপূর্ণ হলেও লক্ষ্যপথে চলতে সাহায্য করতে পারেন।

আমাদের ধারণা সব গুরুই এক। গুরু এক ঠিকই কিন্তু আধার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদাতা শিক্ষক বিভিন্ন কিন্তু সকলেরই উপাধি শিক্ষক, গুরু তেমনি একটি উপাধি। গুরু স্বয়ং পরমেশ্বর। ঠাকুর বলতেন, সচ্চিদানন্দই গুরু। শিক্ষা

আমরা এক একজনের কাছে আংশিক ভাবে পাই। উপনিষদেও এমন দৃষ্টান্ত আছে একজন গুরু উপদেশ দেওয়ার পর শিষ্যকে অন্য গুরুর কাছে যেতে বললেন। পরবর্তী গুরু উপদেশ দিয়ে তাপর আর একজনের কাছে যেতে বললেন। প্রত্যেকেই স্বীয় জ্ঞান অনুসারে সাহায্য করেন। তারপর মনের শুদ্ধি হলে পথনির্দেশ মনই করবে। ঠাকুর বলেছেন, শেষকালে মনই গুরু হবে, অধ্যাত্ম সত্যে পৌঁছে দেবে। 'শেষকালে' বলেছেন, এখনই নয়। শুদ্ধ মনই হলো বিবেক। কিন্তু সেই শুদ্ধির আগে পর্যন্ত শুধু মনের উপর ভরসা করে এগোলে ভুল পথে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন এখানে বললেন, 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ'। (১।২।৮)

অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পথ নির্দেশের তাই প্রয়োজন। গান্ধার যেতে হলে যাত্রাপথ জেনে নিয়ে তবে যেতে হয়। জিজ্ঞাসু মন নিয়ে সাগ্রহে জানতে চাইলে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। শেষ পর্যন্ত নিজের মনের ভিতর গুরুশক্তির পূর্ণ আবির্ভাব হবে, সব সংশয়ের অবসান হবে। যিনি সংশয়ের অতীত তিনিই সংশয় দূর করতে পারেন। তার আগে আমরা অপরের যে সাহায্য নিই সে সাহায্য তাঁরই সাহায্য। কেবল শিষ্যের আধার ভেদে আদর্শ ক্রমশ স্পষ্টতর হতে হতে সে এগিয়ে যায়। শেষ কথা হচ্ছে মনের শুদ্ধি যে শুদ্ধ মনে পরম তত্ত্ব বা পরমগুরু প্রকাশিত হবেন।

'তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্'॥ (১।২।১৩)

সঃ (সেই) বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞ গুরু) সম্যক্ (যথাশাস্ত্র) উপসন্নায় (সমীপাগত) প্রশান্ত চিত্তায় (সংযতান্তঃকরণ) শমান্বিতায় (সংযতেন্দ্রিয়) তস্মৈ (সেই শিষ্যকে) তাম্ (সেই) ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) তত্ত্বতঃ (যথাযথরূপে) প্রোবাচ (প্রব্রূয়াৎ, [অবশ্যই] বলিবেন) যেন (= যয়া বিদ্যয়া, যে বিদ্যার দ্বারা) সত্যম্ (পরমার্থবস্তু, স্বরূপ) অক্ষরম্ (ক্ষরণ, ক্ষয় ও ক্ষত হীন) পুরুষম্ (পুরুষকে, সর্বব্যাপীকে, অন্তর্যামীকে) বেদ (জানা যায়)।

সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু তাঁর সমীপে আগত প্রশান্তচিত্ত, সংযমী সেই শিষ্যকে যে বিদ্যার সাহায্যে সত্য স্বরূপ অবিনাশী পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে অবশ্যই বলবেন।

ব্রহ্মবিদ্ গুরু তাঁর সমীপে আগত প্রশান্তচিত্ত সংযমী শিষ্যকে যে

ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা সত্যরূপকে জানা যায় তা বলবেন। শিষ্য কিরকম? না, যাঁর অন্তঃকরণ সম্যগ্‌রূপে শান্ত হয়েছে অর্থাৎ দর্প-দ্বেষাদি দূর হয়েছে, বিষয়তৃষ্ণা মনকে চঞ্চল করছে না, বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয়সঙ্গ থেকে নিবৃত্ত অর্থাৎ সর্বতোভাবে যোগযুক্ত হয়েছে— এমন যে জিজ্ঞাসু শিষ্য গুরুর সমীপে এসেছেন তাঁকে পরাবিদ্যা বলা হবে। এই পরাবিদ্যার দ্বারা অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত অক্ষরকে জানা যায়। সেই অক্ষর পূর্ণ ও হৃদয়পুরে অবস্থিতিহেতু 'পুরুষ' শব্দবাচ্য। তিনি দেহ নন; তিনি সত্যস্বরূপ অব্যয়, তাঁর বিনাশ হয় না, দেহই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

বিধিপূর্বক আগত শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু এই পরম তত্ত্ব বলে অজ্ঞান-সাগর থেকে নিস্তার করবেন।

তিন

'তদেতৎ সত্যম্।—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥' (২।১।১)

তৎ এতৎ ([পরাবিদ্যার বিষয়ীভূত সেই] এই অক্ষরই) সত্যম্ (পারমার্থিক সত্য [আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক নয়])। যথা (যদ্রূপ) সুদীপ্তাৎ (সম্যক প্রজ্বলিত) পাবকাৎ (অনল থেকে) সরূপাঃ (অগ্নির সজাতীয়) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (অগ্নিকণাসমূহ) সহস্রশঃ (হাজারে হাজারে) প্রভবন্তে (নির্গত হয়) তথা (তদ্রূপ) সোম্য (হে সোম্য), অক্ষরাৎ (অক্ষর থেকে) বিবিধাঃ (নানাপ্রকার) ভাবাঃ (জীবসমূহ) প্রজায়ন্তে (উদ্ভূত হয়) চ (ও) তত্র এব (তাঁহাতেই) অপিযন্তি (বিলীন হয়)।

পরাবিদ্যার বিষয়ীভূত সেই ব্রহ্ম সত্য অর্থাৎ অপরিণামী সত্তা— যেমন সুদীপ্ত অগ্নি থেকে হাজার হাজার অগ্নিকণা নির্গত হয়, তেমনি হে সোম্য, অক্ষর পুরুষ থেকে নানাবিধ ভাব, পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তাতেই আবার বিলীন হয়।

যে ব্রহ্ম পরাবিদ্যার বিষয় তিনি সত্য অর্থাৎ অপরিণামী সত্তা। তাঁর থেকে তাঁরই মতো চৈতন্য-ধর্মবিশিষ্ট হাজার হাজার জীব উৎপন্ন হচ্ছে, যেমন আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গ বেরোয়। আগুন যে ধাতুতে তৈরি স্ফুলিঙ্গও

সেই ধাতুতে তৈরি। আগুন থেকে নির্গত স্ফুলিঙ্গের মতো অক্ষর পুরুষ থেকে বিবিধ ভাব, পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তাঁতেই অবার লয় হয়। কারণ থেকে কার্যের উৎপত্তি এবং কারণেই তার পুনরায় লয়। সুতরাং এই কারণটি উপাদান কারণ হবে। উপাদান কারণ মানে যে উপাদান দিয়ে কার্যগুলি তৈরি। যেমন মাটি উপাদান, তার থেকে তৈরি হয়েছে মাটির হাতি ঘোড়া মাটির তৈরি যা কিছু দেখছি সব। মাটির বিভিন্ন রূপ এই বস্তুগুলি, সেইগুলি মাটি বিকৃত হয়ে উৎপন্ন হয়নি। মাটি যখন হাতি ঘোড়ার রূপ নিচ্ছে তখন যে মাটি নয়, তা নয়। উপাদান মাটিই আছে, কেবল তার বিভিন্ন রূপ দেখছি। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই রূপগুলি কল্পিত। কল্পিত এইজন্য যে, সত্য সত্যই মাটিটা রূপ নেয় তা নয়, মাটির উপরে বিভিন্ন রূপগুলি আমরা কল্পনা করি। এখন, মাটি তার আকার থেকে ভিন্ন না অভিন্ন? যদি ভিন্ন হয় তাহলে মাটি আলাদা থাকুক আর হাতি ঘোড়া আলাদা থাকুক। তা থাকতে পারে না, কারণকে ছেড়ে কার্য থাকতে পারে না। আর কারণ থেকে যে কার্য উৎপন্ন হলো তার দ্বারা কারণের পরিবর্তন ঘটছে না এইজন্য ব্রহ্মের পরিণাম রূপে জগৎ সৃষ্টি হয় না, জগৎ তাঁর বিবর্ত। বির্বত মানে যা মূলে অপরিবর্তিত থেকে জগদ্রূপে প্রতীত হয়। ব্রহ্ম অপরিবর্তিত থেকে জগদ্রূপে প্রতীত হন। কারণরূপ ব্রহ্মে কোন বিকার উৎপন্ন হচ্ছে না, কারণ অবিকৃতই থেকে গিয়েছে। এইজন্য একে বলে বিবর্ত আর যখন কারণ পরিবর্তিত হয়ে যায় তাকে বলে বিকার, যেমন দুধ থেকে দই হওয়া। দুধের দই-তে পরিবর্তিত হওয়াকে বিকার বলে। কিন্তু মাটির বিকার ঘটপটাদি নয়। কেন নয়? ঘটপটাদি মাটির থেকে ভিন্নরূপে থাকে না আর ব্রহ্ম বিবিধরূপে প্রতীত হলেও পরিণামী হয়ে যান না, পরিণামী হলে তিনি অনিত্য হতেন। ব্রহ্ম শব্দের অর্থই হলো অপরিবর্তনশীল তত্ত্ব। সুতরাং ব্রহ্মের পরিবর্তন ঘটছে না। তা না ঘটেও তাঁর যে বিভিন্ন বিকার আমরা কল্পনা করছি এরই নাম বিবর্ত।

তারপর যে পরম তত্ত্ব থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়েছে সেই পরম তত্ত্বটি কিরকম তা বলছেন—

'দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥' (২।১।২)

হি (যেহেতু) অমূর্তঃ (সর্বপ্রকার মূর্তিশূন্য) [এবং] দিব্যঃ (জ্যোতির্ময়, স্বয়ংজ্যোতিঃ,

চৈতন্য) পুরুষ (পরিপূর্ণস্বরূপ পুরুষ) স-বাহ্য -অভ্যন্তর (অন্তরে ও বাহিরে, দেহের ও তদতিরিক্ত সমস্তের অধিষ্ঠানরূপে বর্তমান) হি (সেইজন্যই) অজঃ (জন্মরহিত) ; অপ্রাণঃ (প্রাণশূন্য, ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট-সচল-বায়ুবিহীন) [এবং] অমনাঃ (মনশূন্য, জ্ঞানশক্তি বিশিষ্টমনোবিহীন) হি (বলেই) শুভ্রঃ (শুদ্ধ), হি (অতএব) পরতঃ অক্ষরাৎ ([স্বীয় বিকার প্রপঞ্চ অপেক্ষা যে অক্ষর] শ্রেষ্ঠ, কারণস্বরূপ, সূক্ষ্ম বা ব্যাপী, নামরূপের বীজস্বরূপ সেই অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর থেকে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ)।

সেই পুরুষ জ্যোতির্ময়, নিরাকার, ভিতরে বাহিরে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সেই পুরুষ প্রাণরহিত, মনরহিত, শুদ্ধ, অবিনাশী তত্ত্ব থেকেও শ্রেষ্ঠ।

যাঁকে অক্ষর-পুরুষ বলা হচ্ছে সেই পুরুষটি কিরকম? না, দিব্য—প্রকাশমান অর্থাৎ জ্যোতির্ময়, অমূর্ত—নিরাকার। তিনি দেহধারী নন, দেহরূপে রূপান্তরিত হচ্ছেন না। 'সবাহ্যাভ্যন্তরো'—তিনি ভিতরে বাইরে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। 'অজঃ'— তিনি জন্মরহিত, 'অপ্রাণঃ'—প্রাণরহিত, 'অমনাঃ'— মনরহিত, 'শুভ্রঃ' —শুদ্ধ, মলিনতারহিত আর 'অক্ষর'—অবিনাশী পুরুষ। অক্ষর হলেন যিনি মায়ার অধিষ্ঠান, যাঁর উপর এই পরিবর্তন কল্পনা করা হচ্ছে। আর শুদ্ধ ব্রহ্ম হচ্ছেন অক্ষরের থেকেও পর। অক্ষরের থেকেও তাঁকে পর বা শ্রেষ্ঠ বলছেন কেন? না, অক্ষরের ভিতরে জগতের সৃষ্টির বীজ থাকে কিন্তু যিনি শুদ্ধব্রহ্ম তাঁতে কোন কার্য-কারণতা নেই, তাঁর ভিতরে পরিবর্তনের কোন কারণও নেই। অক্ষরের থেকেও যিনি পর এবং শুদ্ধ তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা, পরম তত্ত্ব। কিরকম? দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে —ঘটের ভিতরে আকাশ থাকে, বিভিন্ন ঘটের ভিতরে যেন বিভিন্ন আকাশ রয়েছে, সে আকাশকে ঘট পৃথক করতে পারে না। একটি আকাশ থেকে আর একটি আকাশের কখনো পার্থক্য হয় না। কেন? না, যে ঘটের রূপ দিয়ে পার্থক্য করা হবে সেই রূপেও তিনি ওতপ্রোত হয়ে আছেন। ঘটের দ্বারা আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে না। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে ঘরের আকাশ ঘটের আকাশ এরকম বলি বটে কিন্তু আকাশ বিভিন্ন হচ্ছে না। সেইরকম ব্রহ্ম সর্বব্যাপী তাঁর পরিচ্ছেদ নেই অথচ যেন পরিচ্ছেদ আছে এইরকম প্রতীতি হচ্ছে। ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা তিনি যেন এক এক আধারে সীমিত হয়ে যাচ্ছেন, ঘটের আকাশ যেমন আপাতত ভিন্ন দেখা যায় সেইরকম।

সেই অক্ষর পুরুষ থেকে, অবিনাশী অবিকারী যে তত্ত্ব তাঁর থেকে ঐ মায়া উপাধিবিশিষ্ট অক্ষর আর তাঁর থেকে এই জগৎ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

বলা হয়েছে— 'অথ পরা— যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে' (১।১।৫) —'পরা' মানে পরাবিদ্যা যার দ্বারা অবিনাশী তত্ত্বকে জানা যায়। পরাজ্ঞানের উপায় হলো এই বিদ্যা। কাকে জানা যায়? না, সেই তত্ত্বকে জানা যায় যিনি জগতের কারণ।

'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥' (২।১।৩)

এতস্মাৎ (এই পুরুষ হইতে) প্রাণঃ (প্রাণ) জায়তে (উদ্ভূত হয়) চ (এবং) মনঃ (মন), সর্বেন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়বর্গ), খম্ (আকাশ), বায়ুঃ (বায়ু), জ্যোতিঃ (অগ্নি), আপঃ (জল), বিশ্বস্য (সকলের) ধারিণী (আধারভূতা) পৃথিবী (পৃথিবী) [জাত হয়]।

এই পুরুষ থেকে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের আধারভূতা পৃথিবী উদ্ভূত হয়।

'এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ'—এই অক্ষর অবিনাশী তত্ত্ব থেকে প্রাণ উদ্ভূত হয়। প্রশ্ন ওঠে, ব্রহ্ম যদি জগৎ-কারণ হন তাহলে কার্যের দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন কি না। বলছেন, যাবেন না, তাঁর কারণতা আরোপিত কারণতা। ব্রহ্মকে বলা হচ্ছে তিনি অক্ষর থেকেও পর, অক্ষরেরও অতীত, তার চেয়েও ব্যাপক ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব। তাঁকে জানা যায় পরাবিদ্যার দ্বারা। এইভাবে যাঁকে জানা যায় সেই পুরুষ থেকেই জগতের সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি। প্রথমে বললেন, 'দিব্যো' মানে জ্যোতির্ময়, প্রকাশমান, কারণ পরমতত্ত্ব কখনোও আচ্ছন্ন, আবৃত হন না, সদা প্রকাশমান বলে তাঁকে 'দিব্য' বলা হয়েছে। কোন আকারের দ্বারা তাঁকে সীমিত করা যায় না, এইজন্য তাঁকে অমূর্ত বলা হয়েছে। বাহ্য এবং অভ্যন্তর সর্বত্র তিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, তিনি জন্মরহিত, প্রাণরহিত, মনরহিত, মলিনতারহিত। এগুলি বলার তাৎপর্য কি? না, এইগুলি বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে সেই হলো অক্ষর। কোন একটি জীবকে দেখলাম সে চেতন, তার ভিতরে চৈতন্য যেন জীবরূপে সীমিত হয়ে রয়েছে। তাকে আমরা কখনো বলছি প্রকাশশীল কখনো অপ্রকাশ। কখনো তিনি দেহধারী জীব, দেহাদিতে অভিমান করছেন তখন যেন তিনি পরিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। প্রাণরহিত— প্রাণ মন এইগুলি সব হলো অক্ষর-পুরুষের উপাধি। উপাধিবশত তাঁকে যেন প্রাণবিশিষ্ট মনবিশিষ্ট মলিনতার দ্বারা আচ্ছন্ন মনে করি। বস্তুত তিনি এসবের অতীত। পরমতত্ত্ব অক্ষর থেকেও পর, অর্থাৎ তাঁর ভিতরে কারণতাও নেই, তিনি

কারণেরও অতীত। জগৎকারণ বলে যখন বলছি তখন পরমতত্ত্ব থেকে কতকটা নেমে এসে বলছি। পরমতত্ত্বকে জগৎ-কারণও বলা যায় না। কেন না, তিনি যদি জগৎ-কারণ হন তাহলে জগতের পরিবর্তনের দ্বারা তাঁরও পরিবর্তন ঘটবে। সেইজন্য তাঁকে কারণ বলা হয় না। তিনি কারণেরও অতীত।

বিষয়টিকে এইভাবে বুঝতে হবে। সমস্ত জগৎকে যে স্থূলরূপে দেখছি সেই স্থূলরূপ এসেছে কতকগুলি স্থূল উপাদান থেকে। সেই উপাদানগুলি যেন পঞ্চভূত প্রভৃতি। মন বলতে চারটি অন্তরেন্দ্রিয়— মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার, এইগুলি ভিতরের, আর অন্য ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের। বাহ্য এবং অন্তর— সমস্ত বস্তু সেই এক পরমতত্ত্ব থেকে এসেছে। এই কথা বোঝাবার জন্য এখানে বললেন, পরমতত্ত্ব যিনি তাঁতে পরিবর্তনের কোন চিহ্ন নেই। দেহেন্দ্রিয়াদির উপাধিবশত বাহ্য এবং অভ্যন্তর বলে আমরা যে পার্থক্যের অনুভব করি সেই পার্থক্যও তাঁতে নেই, তিনি উভয়ত্র বিদ্যমান কারণ দুই-ই তাঁতে কল্পিত। পর অক্ষর মানে পরম কারণ যে অক্ষর, অবিনাশী তত্ত্ব তার থেকেও যিনি পর অর্থাৎ তারও অতীত। কল্পনা করা হচ্ছে এক শুদ্ধ ব্রহ্ম তাঁতে কোন কারণতা নেই। শুদ্ধ ব্রহ্মের উপরে আরোপিত উপাধি যার দ্বারা ব্রহ্মকে সীমিত করে দিচ্ছে সেই প্রথম সীমিত স্বরূপ হলো যেন সমস্ত জগতের কারণ। বীজরূপে জগৎ যেন সেখানে রয়েছে, তাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। চৈতন্য যখন ব্যক্তিরূপ ধারণ করেছেন তখন হিরণ্যগর্ভ। তাঁকেই আবার বলে 'অব্যাকৃতাত্মা' —জগৎকারণ যে অব্যাকৃত তাকেই তিনি আত্মা বলে অভিমান করেন। চৈতন্যের উপরে জগৎকারণরূপটি অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ করা হচ্ছে, তখন সেটি হলো জগতের আদি কারণ তাকে বলব অব্যক্ত। সেই অব্যক্তের থেকে পরে সূক্ষ্মভূত, স্থূলভূত হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর থেকে এসেছে। এই কথাটি বোঝাবার জন্যই এত করে বলা। তাঁকে বুঝিয়ে কি লাভ হবে? না, কারণকে জানলে সমস্ত কার্যকে জানা হয়ে যাবে। এই জগতের আদি কারণ যে অব্যক্ত তাঁকে জানলে তাঁর বিভিন্ন রূপ, বিকার, সব জানা যাবে। এইজন্য এককে জানলে সব জানা হয়ে যায়। তাঁর থেকেই অবিদ্যার বিকাররূপ জগৎ উৎপন্ন হয়। এইটিই অবিদ্যার বিকার আর ব্রহ্মের বিবর্ত। ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হন না এইজন্য তাঁকে বলে অনুপহিত চৈতন্য, যে চৈতন্য উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়। এই উপাধি

কিরকম? যা নিজের ধর্ম অধিষ্ঠানে আরোপ করে। যেমন একটি স্ফটিকে জবা ফুলের লাল রঙ প্রতিফলিত হওয়ায় সেটিকে লাল দেখাচ্ছে। জবা ফুলটি সরিয়ে নিলে দেখা যায় স্ফটিক যেমন ছিল তেমনই আছে, লাল নয়। এই কারণতা আরোপিত কারণতা। মনে হচ্ছে যেন স্ফটিক লাল হয়েছে কিন্তু সত্যসত্যিই তা হয়নি। ঠিক সেই রকম যেন অক্ষর পুরুষ জগৎকারণ হয়েছেন, সত্যসত্যিই হননি। এই উপাধিকেই বলে অবিদ্যা, যে অবিদ্যার পরিণাম হচ্ছে জগৎ। তাই বলছেন যে, পুরুষের ভিতরে আর কোন উপাধি নেই, হিরণ্যগর্ভরূপ যে পুরুষ তাঁর থেকেই প্রথম ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ আমরা কল্পনা করি যেন ব্রহ্ম একটি অণ্ড, অণ্ড মানে ডিম নয়, এখানে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যেমন ডিমের ভিতরে পাখি বীজাকারে থাকে সেইরকম ব্রহ্মের বীজাকার অবস্থাকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। অব্যক্ত হলো যেন সেই বীজাকার অবস্থা। তারপর অব্যক্ত থেকে এই সমস্ত নাম। অন্যত্র বলেছেন, নারায়ণ পরমতত্ত্ব তিনি অব্যক্ত থেকেও পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। তাঁর থেকে ব্রহ্মাণ্ডের বীজরূপ অব্যক্ত, তার থেকে আবার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে। তাই বলছেন, 'এতস্মাৎ' —এই পরমতত্ত্ব থেকে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল এসব উৎপন্ন হয়। 'এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ' —কার থেকে উৎপন্ন হয়? নামরূপ জগতের যে বীজ সেই বীজরূপী যে আত্মা তার থেকে। সমস্ত অবিদ্যার বিষয়ীভূত যা কিছু আমরা জানি সব এর থেকে উৎপন্ন হয়। প্রাণ মন এগুলি জীবের উপাধি। উপাধি মানে যার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়ে সে জীবরূপতা প্রাপ্ত হয়, নিজেকে একটি ভিন্ন জীবরূপে মনে করে। যেমন বিভিন্ন ঘটের ভিতর আকাশ থাকায় আমরা আকাশটাকে ভিন্ন ভিন্ন দেখছি, ঘটের দ্বারা আকাশ যেন পরিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ছোট ঘটের ভিতরে ছোট আকাশ, বড় ঘটের ভিতরে বড় আকাশ কিন্তু ঘটগুলি যদি ভেঙে দেওয়া যায় যে আকাশ সেই আকাশই থাকবে। কাজেই যখন ঘটরূপী আকাশকে পরিচ্ছিন্ন বা সীমিত করছি তখন সত্যসত্যিই আকাশের সীমা হচ্ছে না কিন্তু তার একটা সীমা আমরা কল্পনা করছি, সীমা এখানে আরোপিত। যেমন স্ফটিকের উপরে জবাফুলের ধর্ম আরোপিত হয়ে স্ফটিককে লাল দেখায় সেইরকম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উপাধি সত্যের উপরে, পরম তত্ত্বের উপরে আরোপিত হওয়ায় পরমতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন এরকম মনে হয়। এর থেকে কি কি উৎপন্ন হয় বলছেন, প্রাণ মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত— ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ

ও ব্যোম। ক্ষিতি সমস্ত ধারণ করে রয়েছেন, 'বিশ্বস্য ধারিণী' —পৃথিবী। এখানে পৃথিবী বলতে কেবল আমাদের এই পৃথিবীটি নয়, সমস্ত জগতের সব ভোগ্যবস্তুকে যিনি ধারণ করেন তাঁকে বলছেন পৃথিবী। আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা দেখি সমস্তই এক পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবী মানে একটি গ্রহরূপ পৃথিবী নয়, ব্যাখ্যা করে বলছেন— 'বিশ্বস্য ধারিণী' —যে পৃথিবী সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করে রয়েছেন। যত কিছু স্থূল বস্তু সৃষ্টি হয়েছে সব এই পৃথিবীর উপাদানে গঠিত। স্থূল হলো ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম আর এর সূক্ষ্মরূপ হলো যার থেকে ইন্দ্রিয়াদি হয়েছে। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ— এদের থেকে তাদের অনুরূপ তৎ তৎ বিষয়ক গ্রাহক-ইন্দ্রিয় তৈরি হয়েছে। পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে সুতরাং ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়ও আছে। বিষয় পাঁচটির সঙ্গে ইন্দ্রিয় পাঁচটির একরূপতা আছে। ক্ষিতির গুণ গন্ধ, সেই গন্ধকে আমরা গ্রহণ করি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা। এইরকম প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে পৃথক পৃথক বিষয়ের যোগ আছে। শব্দগুণ আকাশ, স্পর্শগুণ বায়ু, রূপগুণ তেজ, রসগুণ হলো অপ্ বা জল। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম থেকে গন্ধ রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ— এইগুলি অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং যে ধাতু দিয়ে ইন্দ্রিয় তৈরি হয়েছে সেই ধাতু দিয়েই ইন্দ্রিয়ের বিষয় তৈরি হয়েছে। একটি সূক্ষ্ম আর একটি স্থূল। সূক্ষ্ম থেকে স্থূল আসে আবার স্থূল সূক্ষ্মে পরিণত হয়। কারণ থেকে কার্য আসে সেই কার্য আবার কারণে লয় হয়। এইরকম সূক্ষ্মভূত থেকে স্থূলভূত হয়েছে। আবার প্রলয়কালে স্থূলভূত সূক্ষ্মভূতে রূপান্তরিত হবে।

এই যে হিরণ্যগর্ভ অবিকারী পুরুষ, তাঁর থেকে বিরাট উৎপন্ন হচ্ছেন, স্থূলরূপের সমষ্টিতে উপহিত হলেন বিরাট। কারণ থেকে কার্য যেন ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে তা নয়, পুরুষ থেকেই স্থূলরূপ উৎপন্ন হচ্ছে। বলছেন, এই পুরুষ থেকেই এরা উৎপন্ন হয়, পুরুষ দ্বারাই সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত।

স্থূলরূপটি বর্ণনা করছেন—

> 'অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
> দিশঃ শোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
> বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
> পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা।।' (২।১।৪)

অস্য (=যস্য, যাঁর, থেকে যে বিরাট পুরুষের) মূর্ধা (মস্তক) অগ্নিঃ (দ্যুলোক), চক্ষুষী (চক্ষুর্দ্বয়) চন্দ্রসূর্যৌ (চন্দ্র ও সূর্য), শ্রোত্রে (কর্ণদ্বয়) দিশঃ (দিকসমূহ), চ (এবং) বাক্ (বাক্য) বিবৃতা (প্রকটিত) বেদাঃ (বেদসমূহ), প্রাণঃ(প্রাণ) বায়ুঃ (বায়ু), হৃদয়ম্ (অন্তঃকরণ) বিশ্বম্ (নিখিল জগৎ), [যাঁর] পদ্ভ্যাম্ (পাদদ্বয় থেকে) পৃথিবী (পৃথিবী [জাত হয়]) এষঃ হি (এই) সর্বভূত অন্তঃ আত্মা (স্থূল পঞ্চ মহাভূতের আত্মা) [উক্ত অক্ষর পুরুষ থেকেই জাত হন]।

দ্যুলোক যাঁর মাথা, চন্দ্র ও সূর্য যাঁর চক্ষু দিক্‌সমূহ যাঁর কর্ণদ্বয়, যাঁর বাক্য প্রকটিত বেদসমূহ, প্রাণ বায়ু, অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ এবং পৃথিবী যাঁর পদদ্বয় থেকে উদ্ভূত তিনিই সমস্ত স্থূল মহাভূতের অন্তরাত্মা।

তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। সমষ্টি প্রাণের নাম হিরণ্যগর্ভ। প্রাণশক্তি, যে শক্তি পরে বিভিন্ন জীবের ভিতরে প্রাণন ক্রিয়া করবার শক্তিরূপে দেখা যাবে সেই সূক্ষ্মশক্তির সমষ্টি হচ্ছেন হিরণ্যগর্ভ। তাঁর থেকে যে বিরাট উৎপন্ন হলেন সেই বিরাট আপাতদৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ থেকে ভিন্ন হলেও বাস্তবিক ভিন্ন নন। বিরাট পুরুষ থেকে স্থূল সমষ্টিরূপ বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে, সেই পুরুষ এই স্থূল বিশ্বে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। স্থূলবস্তুগুলিকে বোঝাবার জন্য বলছেন— 'অগ্নিঃ', অগ্নি মানে দ্যুলোক। তাঁর থেকে তৈরি হয়েছে বলার তাৎপর্য এই যে, তাঁতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমরা কল্পনা করছি। জগৎ নিরাধার হতে পারে না। তা পরিবর্তনশীল সুতরাং বিনাশশীল। যদি একটি অবিনাশীতত্ত্ব আধাররূপে অনুস্যূত হয়ে না থাকে বিনাশশীল জগৎ থাকতে পারে না এবং জগতের অভিজ্ঞতাও কারও হয় না। জগৎকে সেইজন্য বলতে হচ্ছে একটা স্থূলরূপ, তার ভিতরে আছেন অন্তরাত্মা, অন্তরে থেকে তিনি চালাচ্ছেন এইজন্য তাঁকে অন্তর্যামী বলা হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে—

'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী
ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো
যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥' (৩।৭।৩)

যিনি এই পৃথিবীতে অবস্থিত আছেন অথচ পৃথিবী থেকে ভিন্ন, যাঁকে পৃথিবী জানে না, পৃথিবী যাঁর শরীর, যিনি পৃথিবীকে অন্তরে থেকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী, অমর এবং আত্মা। এখানে বুঝবার কথা এই, আমার শরীর আমাকে জানে না আমিই আমার শরীরকে জানি। 'যস্য পৃথিবী শরীরং' —পৃথিবী যাঁর শরীর, শরীর মানে শরীর রূপ উপাধিযুক্ত

হয়ে, দেহধারী হয়ে যেন পৃথিবীরূপে অবস্থান করছেন। 'যঃ পৃথিবীং অন্তরো যময়তি' —যিনি পৃথিবীর মধ্যে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই জিনিসটি ভাববার যে নিয়ন্ত্রণকারী যিনি তিনি বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন না। যেমন ঘড়ি যে তৈরি করে সে বাইরে থাকে, সে ঘড়ি তৈরি করে দেয় তারপর তা আপনি চলে। ঘড়ি যে তৈরি করেছে সে ঘড়ির নিয়ন্তা আর যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি তার অভ্যন্তরে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই যে ভিতরে থেকে নিয়ন্ত্রণ এটাই তাঁর অন্তর্যামিত্ব। অন্তরে থেকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনি অন্তর্যামী।

এখন, এই বিশ্ব তাহলে কি? বিশ্ব যেন তাঁর শরীর আর তিনি যেন এই শরীরে অভিমানী আত্মা। তাই বিশ্বের প্রকাশ হচ্ছে, তাকে দেখা যায়। পৃথিবী প্রকাশমান কারণ তাঁর প্রকাশের দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আমরা পৃথিবীর যে প্রকাশ দেখি সেটা পৃথিবীর প্রকাশ নয় সেই অক্ষর পুরুষেরই প্রকাশ। আমরা ঐ প্রকাশের উপরে পৃথিবীকে অধ্যস্ত বা আরোপ করে বলছি পৃথিবী প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন, জলকে গরম করা হয়েছে, তাতে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। জলটা পোড়ায় না তার ভিতরে যে আগুন ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে সেই আগুনই পোড়ায়। ঠিক সেইরকম তাঁর প্রকাশ সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে বলেই বিশ্ব যেন প্রকাশিত মনে হচ্ছে। এই প্রকাশ তাদের নিজস্ব প্রকাশ নয়, ধার করা প্রকাশ। সমগ্র বিশ্বের যিনি আত্মা তাঁরই প্রকাশের দ্বারা বিশ্ব প্রকাশিত রয়েছে।

জিনিসটিকে এইভাবে বুঝে নিতে হবে— জগতের বাইরে থেকে ঈশ্বর কলকাঠি নেড়ে জগৎ চালাচ্ছেন এরকম নয়। তিনি তার ভিতরে ওতপ্রোত হয়ে আছেন এবং ওতপ্রোত থেকেই তাকে পরিচালিত করছেন। জগতের বাইরেও তাঁর সত্তা আছে এবং জগৎ তাঁর থেকে ভিন্নও নয়। জগতের সর্বত্র ওতপ্রোত কারণ সমস্ত জগৎ তাঁতে আরোপিত। যেমন, লাল ফুলের যে রঙ স্ফটিকে আরোপিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে সেই প্রকাশ স্ফটিকেরই। সেই রঙ কি করে প্রকাশিত হচ্ছে? না, ঐ স্ফটিকের প্রকাশের দ্বারাই প্রকাশিত হচ্ছে। স্ফটিককে বাদ দিয়ে লাল রঙের অন্য প্রকাশ নেই। প্রকাশমান স্ফটিকের প্রকাশকে ধার করে যেন রঙটা প্রকাশিত হচ্ছে। সেইরকম যিনি বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, বিশ্বের অন্তরাত্মা তিনিই প্রকাশমান, তাঁর প্রকাশের উপর এই সমস্ত বিশ্ব আরোপিত হয়ে মনে হচ্ছে প্রকাশিত।

এই কারণেই তাঁকে জানলে সমস্ত জানা হয়ে যায়। এই তত্ত্ব বোঝবার জন্যই এত করে বলা হলো। তিনি ইন্দ্রিয়াদি হয়েছেন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ও হয়েছেন, তিনি জীবরূপে বিষয়কে ভোগ করছেন, তিনিই আবার দেহধারণ করছেন, দেহ থেকে দেহান্তরে যাচ্ছেন। একই বস্তু কিন্তু উপাধি ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে মনে হচ্ছে জন্মাদি বিক্রিয়া প্রাপ্ত হচ্ছে। যেমন একটা ঘটকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে গেলে বলতে পারি যে, ঘটের আকাশটা এখান থেকে ওখানে গেল। কিন্তু আকাশ সর্বব্যাপী তার কোথাও যাওয়া আসা নেই, যাওয়া আসাটা ঘটের আছে। ঘটের যাওয়া আসাকে আমরা আকাশে কল্পনা করছি। উপাধির এই ধর্ম, অধিষ্ঠানের উপর আরোপিত হওয়ায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। আসল কথা তিনিই প্রকাশমান, 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' —তাঁরই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত। তাই বলছেন, 'এতস্মাৎ জায়তে' —এর থেকে উৎপন্ন হয় মানে বিভিন্ন রূপের প্রকাশ হয়। প্রকাশ কোথা থেকে আসে? তাঁর থেকেই আসে। তিনিই এই জগৎ, জীব হয়েছেন। এক জায়গায় বলেছেন— 'তমঃ প্রধান জাড্যানাং চিৎপ্রধানশ্চিদাত্মনাং পরঃ কারণতামেতি ভাবনা জ্ঞান কর্মভিঃ' —প্রকৃতির তমোগুণের দ্বারা অধ্যস্ত হয়ে তিনি জড় জগতের এবং খণ্ড চৈতন্যের দ্বারা অধ্যস্ত হয়ে সকল চেতন বস্তুরও কারণতা প্রাপ্ত হন। এই পরম তত্ত্ব জীবের ভাবনা জ্ঞান কর্ম দ্বারা পরিচালিত হয়ে এইসব উপাধি-ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন, এইটি কল্পনা করতে হবে। উপনিষদের ভিতরে ধ্যানের বস্তু এই যে, সেই এক চৈতন্য সর্বত্র ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। কি স্থূল কি সূক্ষ্ম কি জড় কি চেতন কারও সেই প্রকাশ থেকে অতিরিক্ত কোন প্রকাশ নেই, তাঁর সত্তা থেকে অতিরিক্ত কোন সত্তাও নেই। চৈতন্য এই দেহে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন বলি। দেহটাই কি চৈতন্য? তাও নয়। সর্বত্র সেই চেতন, দেহধর্মের আরোপ হওয়ায় তিনি দেহরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। দেহের ভিতরে তিনি ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন তাই দেহকে প্রকাশমান বলে মনে হচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যা দেখছি তিনি ছাড়া আর কিছু নয়, তিনিই জীব হয়ে অন্ধকারে হাত পা নেড়ে বেড়াচ্ছেন, খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর স্বরূপকে। তিনিই আবার পরমেশ্বররূপে সকলের গন্তব্য হচ্ছেন। গন্তা তিনি গন্তব্যও তিনি। তিনি যাচ্ছেন আবার তাঁতেই যাচ্ছে। তাঁর অতিরিক্ত কোন সত্তা কারও নেই। এই-কথাটি কল্পনা করবার এবং ভাববার বিষয়।

সমগ্র জগৎ তাঁর থেকে এসেছে এই কথা বলবার জন্য বলছেন—

'তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ
সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ॥' (২।১।৫)

তস্মাৎ (সেই পরম পুরুষ থেকে) [সেই] অগ্নি (দ্যুলোক) [জাত হয়] সূর্যঃ (সূর্য) যস্য (যার) সমিধঃ (সমিৎস্থানীয়) সোমাৎ ([দ্যুলোক সম্ভূত] চন্দ্র হইতে) পর্জন্য (মেঘ), পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ) [জাত হয়]। পুমান্ (পুরুষ) যোষিতায়াম্ (স্ত্রীতে) রেতঃ (শুক্র) সিঞ্চতি (সিঞ্চন করে)। [এইরূপে] পুরুষাৎ (পরম পুরুষ হইতে) বহ্বীঃ(বহুঃ, অনেক) প্রজাঃ (জীবসমূহ) সম্প্রসূতাঃ(সমুৎপন্ন হয়)।

সেই পরম পুরুষ থেকে দ্যুলোক জাত হয় যেখানে সূর্য সমিধরূপ। যজ্ঞাগ্নিজাত ধূম থেকে বা চন্দ্র থেকে মেঘ, মেঘ থেকে পৃথিবীতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়। পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃ সিঞ্চন করে (সন্তান উৎপাদন করে)। এইভাবে পরম পুরুষ থেকে জীবসমূহ সমুৎপন্ন হয়।

সেই পরমপুরুষ থেকে দ্যুলোক জাত হয়। কেমন করে হয় তার ক্রম বলছেন, সৎপুরুষ থেকে উৎপন্ন হয় অগ্নি, মানে এখানে আগুন নয়, দ্যুলোক। কল্পনা করা হয় ভূলোক হলো পৃথিবী, ভূবর্লোক অন্তরীক্ষ, আর স্বর্লোক তারও পারে। আধুনিক দৃষ্টি দিয়ে আমরা কল্পনা করতে পারি স্থূল পৃথিবী হলো ভূলোক আর তার পরে যে atmosphere বা বায়ুমণ্ডল তা ভূবর্লোক বা অন্তরীক্ষ এবং তারও পারে যে অন্যান্য স্থান তা স্বর্গলোক। দ্যুলোক মানেই স্বর্গলোক। সেই স্বর্গলোককে বেদের ভাষায় অগ্নি বলে বলেছেন। কেন ? না, সেখানে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা আছে, পাঁচ প্রকারে অগ্নিকে কল্পনা করে উপাসনা করা হয়। উপাসনা করার এরকম প্রথা ছিল। প্রথম অগ্নি হলো দ্যুলোক। কিরকম দ্যুলোক ? না, যেখানে সূর্য সমিধরূপ। সূর্য যার ইন্ধন। সম্যগ্‌রূপে 'ইধ্যতে'— প্রজ্বলিত হচ্ছে, সূর্যের তাপ চারিদিকে বিকীর্ণ হচ্ছে। এইজন্য সূর্যকে সমিধ বলা হচ্ছে।

তারপরে তার থেকে উৎপন্ন হলো সোম, যে সোমরস যজ্ঞের প্রধান উপকরণ। 'সোমাৎ পর্জন্য'— যজ্ঞাগ্নিজাত ধূম থেকে মেঘের সৃষ্টি হচ্ছে। মেঘ হলো আর একটি অগ্নি। তারপর মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়ায় এই ব্রীহিযবাদি ওষধিসমূহ উৎপন্ন হচ্ছে। পৃথিবীতে যে শস্যাদি উৎপন্ন হচ্ছে তার দ্বারা অন্ন তৈরি করে পুরুষ প্রাণ ধারণ করছে এইজন্য পুরুষকে বলা হলো

আর একটি অগ্নি। পুরুষ স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করছে সেইজন্য স্ত্রীও অন্যতম অগ্নি। এইরকম পরপর পাঁচটি অগ্নি যা থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

জগৎকে বিচ্ছিন্নরূপে না দেখে সেই একই পুরুষ থেকে কিভাবে সৃষ্ট এই কথা বলা হয়েছে। উপাসনাতে একে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা বলে। এইরকম পরপর পাঁচটি অগ্নিকে কল্পনা করে উপাসনা করা হয়। সমস্ত বিশ্ব যজ্ঞ থেকে প্রসূত এটি বোঝাবার জন্য পঞ্চাগ্নি বিদ্যার অবতারণা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, বিশ্ব সেই এক পরব্রহ্ম জগৎকারণ থেকে উৎপন্ন। আমরা যদি মূল কারণ বার করতে পারি যার থেকে বিশ্ব সৃষ্ট হচ্ছে বা প্রতীত হচ্ছে, তাহলে আমাদের চিন্তার ভিতরে একটা শৃঙ্খলা আসে এবং সেই শৃঙ্খলা ধরে গেলে আমরা এই বিশ্বকে পরস্পর বিচ্ছিন্নরূপে না দেখে পরস্পরের সংশ্লিষ্টরূপে দেখতে পারি। যখন এই সংশ্লিষ্টরূপে দেখতে শিখব তখন দেখব এক পুরুষ থেকেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হচ্ছে। কাজেই সেই 'কারণং কারণানাং' —সমস্ত কারণের কারণ যিনি তাঁকে জানা হলে জগতে অজানা কিছুই রইল না। বাকি যা রইল এগুলির কোন পৃথক সত্তা নেই —'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং' (ছা.উ., ৬।১।৪) —তাদের বাক্যমাত্র অবলম্বন, আশ্রয়, আর কোন পৃথক সত্তা নেই। যাঁর সত্তার দ্বারা তারা সত্তাবান তাঁকে যদি জানা যায় তাহলে আর জানবার কিছু বাকি রইল না। এই কথাটি এইভাবে বুঝতে হবে— কারণকে জানলে আর কার্যকে জানার দরকার হয় না। কার্যের কোন পৃথক বা কারণ থেকে ভিন্ন সত্তা নেই। এইটি হচ্ছে একটি মূল সিদ্ধান্ত। তিনি চেতনরূপে জগতের সব অনুভব করছেন, তিনি চেতনরূপে জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে জগতের নিয়ন্ত্রণ করছেন। এইটি বুঝতে পারলে আমাদের জানবার অবশিষ্ট আর কিছু থাকবে না। শাস্ত্র আমাদের এই শেখাচ্ছেন।

জগৎকে খণ্ড খণ্ড করে দেখলে কোনকালে দেখার শেষ হবে না, অভ্রান্তও হবে না। জগতের পশ্চাতে যে কারণ তাঁকে জানলে জানা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে এক কারণ থেকে কি করে বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে তা কল্পনা করে বলেছেন। কল্পনা করার উদ্দেশ্য বিশ্বসৃষ্টি কি করে হলো তা বোঝা নয়, আমরা জগৎকে কি দৃষ্টিতে দেখব সেটাই বলার উদ্দেশ্য। এইজন্য বলছেন, এটি একটি বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা। এই উপাসনার দ্বারা জগতের যিনি আদি কারণ তাঁকে জানা যাবে। এই জগৎ ও জগৎকারণের

মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ? আধার আধেয় সম্বন্ধ অর্থাৎ যা মূলতত্ত্ব তাই আধার আর তার উপরে যা আরোপিত তা আধেয়— এই সম্বন্ধ। আরোপিত বস্তুর সত্তা আরোপের অধিষ্ঠান ভিন্ন আর কিছু নয়। মূল তত্ত্বকে জানা হয়ে গেলে আরোপিত বস্তুগুলিকে জানবার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। এই কথাটুকু প্রথমে বুঝে নিতে হবে।

পরের কথা, পঞ্চাগ্নি বিদ্যার এই উপাসনা কেন? না, মনে এই জিনিসটি দৃঢ় করে বসিয়ে নেবার জন্য যে আমরা সেই অদ্বৈত তত্ত্ব পরম তত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নই। বিচ্ছিন্ন হলে আমাদের বুদ্ধি কলুষিত হয়ে যায়।

বিষয়টি সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়াল যে, দ্যুলোক একটি অগ্নি, সেখান থেকে হলো মেঘ আর একটি অগ্নি। মেঘ থেকে ওষধি, ওষধি থেকে পুরুষ। ওষধি এবং পুরুষ এক একটি অগ্নি। তারপর স্ত্রী— পুরুষ এবং স্ত্রীর সংস্পর্শে জগতের প্রজাসন্ততি সৃষ্টি হচ্ছে, কাজেই স্ত্রীকেও আর একটি অগ্নি বলা হলো। এখন, এই বিশ্বরূপ যে মহাযজ্ঞ চলেছে সেই মহাযজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর হচ্ছেন এক। আর যা কিছু দেখতে পাচ্ছি সেগুলি সব আপাতদৃষ্টিতে তাঁরই যেন পরিণাম। পরিণাম না বলে বলা হয় তাঁরই বিবর্ত। বিবর্ত কেন? না, তিনি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন বটে কিন্তু স্বরূপত পরিবর্তিত হচ্ছেন না। যা পরিবর্তিত না হয়ে পরিবর্তিতের মতো দেখায় তাকে বিবর্ত বলে। যেখানে কারণ নিজে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাকে বলে পরিণামী কারণ। ব্রহ্ম পরিণামী কারণ নন, অপরিণামী কারণ তাই জগৎ তাঁর বিবর্ত, তাঁর উপর আরোপিত। এই আরোপের ধারা দেখাবার জন্য এইভাবে কল্পনা করা হয়েছে। কল্পনার ধারাটি এখানে বেশ সুন্দর করে বলে দিলেন। এইরকম কল্পনা করলে জগতের অন্তর্নিহিত একটি শৃঙ্খলা আমাদের মনে আসে। এই জ্ঞান বিজ্ঞানভিত্তিক নয়, এটি শ্রৌতজ্ঞান। শ্রুতি বলছেন— তুমি চিন্তা করে দেখ, যদি এইরকম কল্পনা করতে পার তাহলে সমস্ত জগতের রহস্য তোমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হবে। সমস্ত জগতের ভিতর একটা সম্বন্ধ খুঁজে পাবে এবং সেই সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে, সেই সূত্র অবলম্বন করে যিনি আদি কারণ তাঁতে পৌঁছাতে পারবে। আদিকারণকে জানলে বিশ্বের সমস্ত কিছু জানা হয়ে যায়।

তারপর পুরুষ থেকে কি করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে তার একটা ক্রম বলছেন—

'তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ॥' (২।১।৬)

তস্মাৎ (সেই পুরুষ থেকে) ঋচঃ (নিয়তাক্ষরপাদ ছন্দোবদ্ধ ঋক্‌মন্ত্রসমূহ) সাম (গীতিবিশিষ্ট সামমন্ত্রসমূহ) যজূংষি (অনিয়তাক্ষরপাদ বাক্যাত্মক যজুর্মন্ত্রসমূহ) দীক্ষা (মৌঞ্জীধারণ প্রভৃতি নিয়ম) সর্বে (সকল) যজ্ঞাঃ (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ) চ (এবং) ক্রতবঃ (সযূপ ক্রতুসমূহ) চ (এবং) দক্ষিণাঃ (দক্ষিণাসমূহ) সংবৎসর চ (সম্বৎসর), যজমানঃ চ (যজমান), লোকাঃ (কর্মফলভূত লোকসমূহ) যত্র (যেখানে) সোমঃ (চন্দ্র) পবতে (পবিত্র করেন), যত্র সূর্যঃ (সূর্য [তাপ দেন])।

সেই পরম পুরুষ থেকে ঋক্ সাম যজু উৎপন্ন হয়েছে। দীক্ষা, যজ্ঞসমূহ, ক্রতুসমূহ এবং সকলপ্রকার দক্ষিণা, সম্বৎসর ও যজমান সৃষ্টি হয়েছে। যে সোমরস বা চন্দ্র সকল কিছু পবিত্র করে, যে সূর্য কিরণ বিতরণ করে তারাও সেই পরম পুরুষ থেকে জাত হয়।

পুরুষ থেকে ঋক্ সাম যজুঃ উৎপন্ন হয়েছে। ঋক্ হলো বেদের ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র অংশ। গেয় অংশ সাম আর গদ্যে লেখা অংশগুলি হচ্ছে যজুঃ। তারপরে বলেছেন 'দীক্ষা'। ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য যজমানের মৌঞ্জিমেখলা ধারণ প্রভৃতি নিয়মকে দীক্ষা বলেছেন। তারপর চাতুর্মাস্যাদি যতরকম যজ্ঞ আছে এবং সবরকম 'ক্রতু' তাদের কথা বলেছেন। ক্রতু মানেও যজ্ঞ। তফাত হলো, যজ্ঞে পশুবলি দিতে হয় না, ক্রতু সযূপ অর্থাৎ পশুবধবিশিষ্ট। তারপরে 'দক্ষিণা' যা ঋত্বিকদের দিতে হয়। যজ্ঞে বিভিন্নরকম দক্ষিণা দিতে হয়। একটি গরুও দেওয়া যায় আবার বাড়াতে বাড়াতে যথাসর্বস্বও দেওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারের দক্ষিণা হচ্ছে যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ। 'সংবৎসর' অর্থাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট কাল আর যজ্ঞে যিনি অধিকারী তিনি হলেন যজমান। যজ্ঞ থেকে ভূঃ ভূবাদি বিভিন্ন লোক মানে ভোগস্থান, যেখানে সোমরস মানুষকে পবিত্র করে 'সোম যত্র পবতে', সূর্য কিরণ বিতরণ করে —তারাও জাত হয়। সূর্যের গতিপথ উত্তর আর দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ উত্তরায়ণে ও দক্ষিণায়নে।

আমরা এখানে যজ্ঞ করে স্বর্গাদি লোকে যাচ্ছি, গিয়ে ফল ভোগ করছি। ইহকালে যেখানে যা ভোগ করছি সব পুরুষ থেকে এসেছে আর কর্মের পরিণামে আমরা যে স্বর্গাদি ভোগ করব তাও সেই পুরুষ থেকে এসেছে। পুরুষ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু নেই। তাই বললেন, পুরুষ থেকেই

ঋক্ সাম যজু, দীক্ষা, যজ্ঞ, ক্রতু, তার দক্ষিণা, সংবৎসর ও যজমান জাত হয়। তারপরে বলছেন—

'তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ॥' (২।১।৭)

চ (আরও) তস্মাৎ (সেই পুরুষ থেকে) দেবাঃ (দেবগণ) বহুধা (বসু প্রভৃতি বিশেষ গণভেদে) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্ন হন), সাধ্যা (সাধ্যানামক দেবগণ) মনুষ্যা (মনুষ্যগণ) পশবঃ (পশুসমূহ) বয়াংসি (পক্ষিসমূহ) প্রাণ-অপানৌ (প্রাণ ও অপান, অর্থাৎ জীবন) ব্রীহি-যবৌ ([হোমার্থক] ব্রীহি ও যব) তপঃ চ (এবং তপস্যা) শ্রদ্ধা (আস্তিক্য বুদ্ধি) সত্যম্ (সত্য) ব্রহ্মচর্যম্ (ব্রহ্মচর্য) বিধি চ (এবং ইতিকর্তব্যতা বুদ্ধি) [সমুৎপন্ন হয়]।

সেই অক্ষর পুরুষ থেকে বসু প্রভৃতি বিশেষ গণ ভেদে দেবতাগণ উৎপন্ন হন, সাধ্যসমূহ, মনুষ্যসকল, পশুগণ, পক্ষিকুল, প্রাণ এবং অপান, ব্রীহিযব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য এবং কর্তব্যবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়।

সেই অক্ষর পুরুষ থেকে দেবতাগণ উৎপন্ন হন, যাঁদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়। বহু প্রকারের দেবতা আছেন, 'সাধ্যা' তাঁদের একটি পর্যায়। সেই দেবতারা, যজ্ঞে অধিকারী মনুষ্যগণ, যজ্ঞে বলিদানের পশুবর্গ, পক্ষিগণ, 'প্রাণাপানৌ' —প্রাণ এবং অপান অর্থাৎ জীবন, 'ব্রীহিযবৌ' —চাল গম প্রভৃতি, 'তপশ্চ' —তপস্যা অর্থাৎ নানারকমের কৃচ্ছ্রসাধন, 'শ্রদ্ধা' মানে যে আস্তিক্য বুদ্ধি থাকলে মানুষ তপস্যাদিতে নিযুক্ত হতে পারে, তার পরে 'সত্য' —সত্যকে অবলম্বন করে সাধকদের চলতে হয় তাই সত্য বলছেন। 'যথা ভূত বচন' —যা ঘটেছে তাই যদি বলি তাহলে বাচিক সত্য হয়, মনে যা চিন্তা করছি সেইভাবে ব্যবহার করলে মানসিক সত্য আর মন যা সত্য বলে বুঝেছে সেই অনুসারেই দেহ কাজ করছে এটা কায়িক সত্য— এইভাবে সত্য কায়িক বাচিক মানসিক হতে পারে। যজ্ঞানুষ্ঠানের যোগ্যতার জন্য যা দরকার —ব্রহ্মচর্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আর 'বিধি' অর্থাৎ যজ্ঞে যেভাবে অনুষ্ঠান করতে হয় সেই ইতিকর্তব্যগুলিও সেই পুরুষ থেকে এসেছে।

'সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত॥' (২।১।৮)

তস্মাৎ (তাঁহা, অর্থাৎ ব্রহ্ম, হতে) সপ্ত প্রাণাঃ (মস্তকস্থ সাতটি ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও জিহ্বা) প্রভবন্তি (উদ্ভূত হয়), [তাদের আবার যে সব] সপ্ত অর্চিষ (স্ববিষয়ের প্রকাশক সাতটি কিরণ) [সপ্ত] সমিধঃ (সাতটি সমিধ অর্থাৎ সাতটি বিষয়), সপ্ত হোমাঃ (সাতটি হোম, অর্থাৎ বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞান), ইমে (এই সকল) সপ্ত (সাতটি) লোকাঃ (ইন্দ্রিয়ের অবস্থান ক্ষেত্র) যেষু (যে ক্ষেত্রসকলে) সপ্ত সপ্ত নিহিতা ([বিধাতা কর্তৃক] প্রতি প্রাণীতে সাতটি সাতটি করে সংস্থাপিত) গুহাশয়া (শরীরাবস্থায়ী বা নিদ্রাকালে হৃদয়শায়ী) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) চরন্তি (সঞ্চরণ করে) [তারাও উৎপন্ন হয়]

সেই পুরুষ থেকে সাতটি প্রাণ উৎপন্ন হয়। সাতটি অর্চি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ সামর্থ্য, সাতটি সমিধ (বিষয়), সাতটি হোম— (বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান), সাতটি লোক (যে সাতটি বিষয়ে বা স্থানে ইন্দ্রিয়গণ বিচরণ করে) বিধাতা কর্তৃক প্রতি জীবে স্থাপিত হয়।

'তস্মাৎ'—সেই পুরুষ থেকে সাতটি প্রাণ উৎপন্ন হয়। দুই চক্ষুরিন্দ্রিয়, দুই শ্রবণেন্দ্রিয় দুই ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং মুখ এই সব মিলে সপ্ত প্রাণ। তার পরে তার সপ্ত অর্চি— তাদের প্রকাশ করবার শক্তি। ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় গ্রহণের সামর্থ্য তাকে বলছেন অর্চি— এইরকম সাতটি অর্চি বা প্রভা। সেইরকম তার সমিধ, যা আহুতি দেওয়া হয়। চোখে রূপকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। কানে শব্দকে, এইরকম সপ্ত প্রাণ দিয়ে সপ্ত বস্তুকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। 'সপ্ত ইমে লোকাঃ'— ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—এই সপ্ত লোক। 'যেষু চরন্তি প্রাণা' —অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিচরণ স্থানসমূহ, যে সপ্ত বিষয়ে বা স্থানে ইন্দ্রিয়গণ বিচরণ করে। 'গুহাশয়া' —হৃদয়গুহাতে অর্থাৎ জাগ্রৎকালে শরীরে বিচরণ করে এবং স্বপ্নাবস্থায় হৃদয়ে লীন হয়। এই প্রাণ সাতটি সাতটি করে বিধাতা কর্তৃক প্রতি জীবে স্থাপিত। যা কিছু আমরা করছি, যার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সবগুলিই সেই এক পুরুষ থেকে উৎপন্ন।

'অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বে
অস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা॥' (২।১।৯)

অতঃ (এই পুরুষ থেকে) সর্বে (সকল) সমুদ্রাঃ (সমুদ্রসমূহ) চ (ও) গিরয়ঃ (পর্বতসমূহ); অস্মাৎ (এই পুরুষ থেকে) সর্বরূপাঃ (বহুরূপ) সিন্ধবঃ (নদীসমূহ) স্যন্দন্তে

(প্রবাহিত হয়); চ (এবং) অতঃ (এই পুরুষ থেকে) সর্বাঃ (সকল) ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ), রসঃ চ (এবং [সেই] মধুরাদি রস) [উদ্ভূত হয়] যেন (যার বলে) ভূতৈঃ (পঞ্চভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে) এষঃ অন্তরাত্মা (এই লিঙ্গদেহ, অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর) তিষ্ঠতে হি (অবশ্যই অবস্থান করে)।

সেই পুরুষ থেকে সমস্ত সমুদ্র ও সকল পর্বত উৎপন্ন হয়; নদীসমূহও তাঁর থেকে প্রবাহিত হয়; তাঁর থেকেই সমস্ত ওষধি সম্ভূত হয়, তাঁর থেকে উৎপন্ন হয় (মধুর ইত্যাদি) রস— যার বলে পঞ্চভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এই সূক্ষ্ম শরীর (অন্তরাত্মা) অবস্থান করে।

পুরুষ থেকে সমুদ্র পর্বত সম্ভূত হয়। নদীসমূহও তাঁর থেকে প্রবাহিত হয়। সমুদ্র মানে পুরাণের সপ্ত সমুদ্র, মহাসাগর নয়। লবণ ইক্ষু সুরা ঘৃত দধি দুগ্ধ এবং জলের সমুদ্র। ওষধি অর্থাৎ যে সব গাছ একবার ফলদান করে মরে যায় আর যারা স্থায়ী তাদের বলে বনস্পতি— এ সবই তাঁর থেকে এসেছে। তাঁর থেকেই এসেছে অম্ল, লবণ, তিক্ত, কষায়, মধুরাদি পাঁচটি রস। অন্তরাত্মা— যে রসের আকর্ষণে স্থূল পঞ্চভূত বেষ্টিত হয়ে বিভিন্ন ভূতরূপে অবস্থান করেন। শরীর এবং আত্মার মাঝখানে তিনি এই বিভিন্নরূপে অবস্থান করছেন। শরীর স্থূলবস্তু যার সঙ্গে আমাদের সর্বদা পরিচয় আর আত্মা সূক্ষ্মতম বস্তু। স্থূলাত্মা আর কারণাত্মার মধ্যবর্তী, অন্তরালে অবস্থিত যে আত্মা তাঁকে অন্তরাত্মা বলা হয়, অন্তরে থেকে এই বিশ্বকে যিনি চালাচ্ছেন, যিনি অন্তর্যামী। যেমন, ঘড়ির যে স্রষ্টা (mechanic) সে ঘড়ি চালায় না, তৈরির পরে ঘড়ির সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকে না। একসময় সম্বন্ধ ছিল তারপর নেই। ভগবান বিশ্বকে সেরকমভাবে চালাচ্ছেন না। তিনি এর অভ্যন্তরে অবস্থিত থেকে চালাচ্ছেন। এই পার্থক্যটুকু ভাববার। যিনি চেতন তিনি এই জড়বস্তুর ভিতরে অন্তর্নিহিত থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তারপর উপসংহার করছেন এই বলে যে—

'পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য।।' (২।১।১০)

পুরুষঃ এব (উক্ত পুরুষই) কর্ম (যজ্ঞাদি), তপঃ (জ্ঞান) [এবং কর্ম ও উপাসনার

ফলস্বরূপ] ইদম্ (এই) বিশ্বম্ (জগৎ)। পর-অমৃতম্ (পরম ও অমৃত) এতৎ (এই সর্বাত্মক) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) যঃ (যিনি) গুহায়াম্ (সকল প্রাণীর হৃদয়ে) নিহিতম্ (স্থিত) বেদ (জানেন) [হে] সোম্য (প্রিয়দর্শন), সঃ (তিনি) ইহ (জীবিতাবস্থাতেই) অবিদ্যাগ্রন্থিম্ (অবিদ্যাবাসনাকে) বিকিরতি (বিনাশ করেন)।

হে সোম্য, উক্ত পুরুষই কর্মাত্মক ও জ্ঞানাত্মক এই জগৎ। এই পরম অমৃত, সর্বাত্মক ব্রহ্মকে যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়-গুহাতে অবস্থিতরূপে জানেন, তিনি অবিদ্যাগ্রন্থি নাশ করেন।

'এতদ্ যো বেদ'— যিনি এই পুরুষকে জানেন। কিভাবে জানেন? না, সেই সত্য পুরুষই এই জগৎ— 'পুরুষ এব ইদং বিশ্বং'; 'কর্ম'—যাগযজ্ঞ, অগ্নিহোত্রাদি; জ্ঞান তপস্যা বেদ। 'পরামৃতম্'— পরম অমৃত, অমরণধর্মী, পরম ব্রহ্মের এই স্বরূপ। যিনি এঁকে 'নিহিতং গুহায়াং' —হৃদয়গুহাতে অবস্থিতরূপে জেনেছেন, 'সঃ'— তিনি, 'অবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতি'— অবিদ্যার গ্রন্থি নাশ করেন। তাঁরই জ্ঞান হয় এবং পুরুষে লীন হয়ে যান। পুরুষের অতিরিক্ত জগতে আর কিছু নেই, তাঁর এই জ্ঞান হয়ে যায়। এইভাবে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্বজ্ঞ হন।

সর্বজ্ঞ হন মানে জগতের সব ঘটনাগুলিকে যে তিনি জানেন তা নয়, তাঁর জানবার প্রয়োজনও নেই। কারণ, তিনি জানেন এইগুলি সব বৃথা কল্পনা মাত্র। 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং'— বাক্যমাত্র এর আশ্রয়, এর কোন বাস্তব সত্তা নেই। মৃত্তিকা অর্থাৎ উপাদান কারণটিই হলো সত্য। মৃত্তিকা নির্মিত সমস্ত বস্তুর কারণরূপে মৃত্তিকাকে যেমন দেখছি সেইরকম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখছি সবেরই কারণ তিনি। পুরুষই এই বিশ্ব যা সর্বাত্মক, তাঁকে জানলে অবিদ্যারূপ বন্ধনের নাশ হয়। অবিদ্যা কখন বলি? যখন তাঁকে বাদ দিয়ে এই জগৎ-বৈচিত্র্য দেখছি। জগৎ-বৈচিত্র্য কখনো আমাদের মোহিত করছে, কখনো উৎফুল্ল করছে, কখনো বিপর্যস্ত করছে, বুদ্ধি নানাভাবে কলুষিত হচ্ছে। এই বিভ্রমের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় সত্তা নেই। যিনি এরকম জানেন তাঁর অবিদ্যার বন্ধন আর থাকে না। 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি' (১।১।৩)— ভগবন্, কোন্ বস্তুটি জানলে সমস্ত জগৎকে জানা হয়ে যায়, এই যে প্রশ্ন গোড়ায় করা হয়েছিল তার উত্তরে বললেন, এক সেই পুরুষকে জানলে সব জানা হয়ে যায়। পুরুষ মানে আগেই বলা হয়েছে, তিনি সর্বব্যাপী অথবা তিনিই

দেহে অবস্থান করছেন। সেই পুরুষ বদ্ধ পুরুষ নন। 'পুরুষ এব ইদং বিশ্বং'— পুরুষই এই সর্বাত্মক বিশ্ব। কারণ থেকে অতিরিক্ত সত্তা কার্যের নেই। কারণকে যদি কেউ জানে তাহলে জগৎরূপ বৈচিত্র্য তাকে মোহগ্রস্ত করতে পারে না।

এই মূল কথাটি বোঝাবার জন্য বিষয়টি এত বিশদ করে বলা হলো। সমস্ত জগতের ঘটনা-বৈচিত্র্যের পরস্পরের মধ্যে একটি সুষ্ঠু সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়েছে এবং সেই কল্পনা যখন উপাসনার বিষয় হয় তখন তাকে বলা হয় পঞ্চাগ্নি বিদ্যা। পঞ্চাগ্নি বিদ্যা সাধন করতে হয় তারপরে সাধকের কাছে বিশ্বের সব বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন এক কারণ থেকে উৎপন্ন বলে বোঝা যায় তখন জগতের কোন জিনিস আর জ্ঞানীকে মোহগ্রস্ত করতে পারে না, কারণ তখন তিনি দেখেন সমস্তই সেই এক পরম পুরুষ। ব্রহ্মকে বিস্তারিতরূপে বুঝতে গেলে গোলমাল হয়ে যায় বলে একই পরমেশ্বর সর্বত্র ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন, বিভিন্নরূপ হয়েছেন এইভাবে জানতে হবে। বিভিন্নরূপ হওয়া মানে বিভিন্নরূপে তিনি পরিবর্তিত হয়েছেন তা নয়, তিনিই সকলের ভিতরে ও বাইরে আছেন, এই ভাবে তাঁকে জানলে আর বন্ধনের কারণ থাকে না। জ্ঞানীর তখন সেই পুরুষকে তাঁর প্রকৃত সত্তা বলে অনুভব হয়, তিনি সেই পুরুষের একটি প্রকার মাত্র বা একটি আরোপিত সত্তা। এটা জানলে আর অবিদ্যা-গ্রন্থি থাকবে কি করে? আমার সত্তা যখন তাঁর থেকে অভিন্ন বলে বুঝতে পারি তখন আমিই সেই অজর অমর বস্তু হয়ে যাই। এইটি শেষ কথা মনে রাখবার।

চার

'আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥' (২।২।১)

[যে ব্রহ্ম] আবিঃ (প্রকাশ স্বভাব), সন্নিহিতম্ (সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে সম্যক নিবিষ্ট) [তিনি] গুহাচরম্ (হৃদয় সঞ্চারী নামে প্রখ্যাত) [তিনিই] মহৎ পদম্ (মহান আশ্রয়, সর্বাস্পদ) [কারণ] অত্র (এই ব্রহ্মে) এজৎ (সচল পক্ষী প্রভৃতি) প্রাণৎ (প্রাণাপানাদিমান্

পশু ও মনুষ্যাদি) নিমিষৎ চ (নিমেষবান ও [নিমেষরহিত]) যৎ এতৎ (এই যা কিছু সমস্তই) সমর্পিতম্ (প্রবেশিত হয়ে আছে) ; [হে শিষ্যগণ], এতৎ (এই ব্রহ্ম) যৎ (যিনি) সৎ-অসৎ (স্থূল, সূক্ষ্ম উভয়েরই স্বরূপ), বরেণ্যম্ (বরণীয় [কেঃ ৪।৬]) বরিষ্ঠম্ (বরতম, শ্রেষ্ঠতম), [এবং] প্রজানাম্ (প্রাণিবর্গের) বিজ্ঞানাৎ পরম্ (লৌকিক জ্ঞানের অগোচর) [তৎ (সেই ব্রহ্মকে)] জানথ (তোমার আত্মারূপে জেনো)।

প্রকাশমান, সকল প্রাণীর হৃদয়গুহায় বিচরণশীল (যে ব্রহ্ম) তিনি সম্যকরূপে নিকটে রয়েছেন, তাঁতে সমস্ত জগৎ প্রবেশিত হয়ে আছে, তিনি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও সকলের গন্তব্যস্থল। কারণ, সচল পক্ষী, প্রাণাপানাদিযুক্ত পশু ও মনুষ্যাদি, নিমেষবান ও নিমেষ-রহিত— এই সমস্তই সেই পুরুষে প্রবিষ্ট হয়েছে। তিনিই স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে বর্তমান, তিনি সকলের প্রার্থনীয়, তিনি শ্রেষ্ঠতম, তিনি প্রাণীদের লৌকিক জ্ঞানের অগোচর। সেই ব্রহ্মকে জান।

অক্ষর পুরুষ দুর্জ্ঞেয়, সহজে তাঁকে জানা যায় না। যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর অরূপ তাঁকে জানব কি করে? কেমন করে তাঁকে ধারণা করা যাবে তা শ্রুতি বহু জায়গায় নানাভাবে বুঝিয়েছেন। এখানে বলছেন, পরম তত্ত্বকে এইভাবে জানবে— তিনি 'আবিঃ'— প্রকাশমান, 'সন্নিহিতং'—সম্যগ্‌রূপে নিকটে রয়েছেন। তিনি হৃদয়গুহাতে বিচরণ করেন এইজন্য 'গুহাচরং'। কখনো আছেন কখনো নেই এরকম নয়, সর্বদা সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত রয়েছেন। দেখা, শোনা, ছোঁয়া, চিন্তা করা, জানা— ইন্দ্রিয়ের সব ক্রিয়াগুলি তাঁর দ্বারাই অর্থাৎ তিনি আছেন বলে সমাধা হচ্ছে। এইজন্য এগুলির যখন অনুভব হচ্ছে তখন তাঁরই অনুভব হচ্ছে অথবা তিনি আছেন বলে সমস্ত বস্তু হৃদয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান হয় সে জ্ঞান তিনি আছেন বলে হয়, ইন্দ্রিয়ের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রকাশিত হচ্ছেন। ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ সমর্পিত অর্থাৎ প্রবেশিত হয়ে আছে, তিনি জগতের অধিষ্ঠান। আমাদের দৃষ্ট জগতের সত্তা ব্রহ্মে, এইজন্য তা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। রথচক্রের নাভিতে যেমন অর বা চক্রশলাকাগুলি থাকে সেইরকম ব্রহ্মে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠিত।

তিনি 'মহৎ পদং'— 'মহৎ' অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং 'পদং' অর্থাৎ সকলের গন্তব্য বস্তু। তাঁকে 'মহতো মহীয়ান্' বলা হয়েছে। তাঁকে পাওয়ার জন্য আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তি ধাবিত হচ্ছে কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে চলছি বলে, ঠিক পথ দিয়ে যাচ্ছি না বলে তাঁর অনুভব হচ্ছে না। 'এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ'—'এজৎ'— যারা গতিশীল, পক্ষী প্রভৃতি। 'প্রাণৎ'— যারা

শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া করে, মানুষ পশু প্রভৃতি। 'নিমিষৎ'— যাদের চোখের পলক পড়ে এবং 'চ' শব্দের দ্বারা যারা গতিশীল নয়, যাদের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া হয় না এবং যাদের চোখের পলক পড়ে না তাদেরও বোঝাচ্ছে—তারা সব এই পুরুষে সমর্পিত। 'এতৎ সদসৎ'— তিনি সৎ অর্থাৎ মূর্তরূপে, স্থূল সাকাররূপে, তিনিই আবার অসৎ অর্থাৎ অমূর্ত সূক্ষ্মরূপে নিরাকাররূপে আছেন। তিনি 'বরেণ্যম্'— প্রার্থনীয়, 'বরিষ্ঠম্'— সর্বশ্রেষ্ঠ, 'প্রজানাম্ বিজ্ঞানাদ্ পরং'—প্রাণিবর্গের জ্ঞানের অতীত, লৌকিক বা ব্যবহারিক জ্ঞানের অগোচর। 'তদেতৎ জানথ'— সেই ব্রহ্মকে জান।

যে ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসোগোচর, তাঁকে জানা কি করে সম্ভব তারই উত্তরে এখানে বলছেন, তাঁকে সাক্ষাৎভাবে জানা যায় না বটে কিন্তু তিনি নিত্য প্রকাশমান, সম্যগ্‌রূপে স্থিত এবং গুহাচর। দূরে তাঁকে খুঁজতে যেতে হবে না, তিনি হৃদয়গুহাতেই রয়েছেন। সেই ব্রহ্ম সীমিত জ্ঞানের বিষয় নন। সেইজন্য বলছেন, 'প্রজানাম্ বিজ্ঞানাদ্ পরং'— জীবসমূহের যে জ্ঞান তিনি তারও অতীত। অতীত এইজন্য যে জীবের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, তিনি অপরিচ্ছিন্ন। শাস্ত্র বলছেন, তাঁকে জান আর অন্য সব চিন্তা ত্যাগ কর, তাঁতেই মগ্ন হয়ে থাক। সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে অবস্থিত, তাঁকে ধরে জগতের সব কিছু অনুভব হচ্ছে। এই একমাত্র উপায় যার দ্বারা তাঁকে জানা যায়। এক জায়গায় বলেছেন, 'প্রতিবোধ বিদিতং'—প্রত্যেক বৃত্তিজ্ঞানের ভিতরে ব্রহ্ম বিদিত, প্রকাশিত হচ্ছেন। প্রকাশিত হচ্ছেন কিভাবে? জ্ঞাতারূপে। যা কিছু আমরা জানছি দেখছি শুনছি সমস্তর কর্তারূপে তিনি—তাঁকে এইরূপে জানতে হয়। আমরা একটা গাছকে জানি, মানুষকে জানি, অন্য জীবদের জানি জ্ঞানের বিষয়রূপে। ব্রহ্মকে এইরকম জ্ঞানের বিষয় করা যায় না, কেবল জ্ঞাতারূপে, দ্রষ্টারূপে তাঁকে জানা যায়। তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। সুতরাং গুণক্রিয়ার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। আমরা বলি, ঘট সৎ, মঠ সৎ, পট সৎ— ঘট আছে, মঠ আছে, পট আছে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। সৎ আছেন তাই এইগুলি আছে। তাঁর সত্তায় সব সত্তাবান। আমরা যে দেখছি শুনছি বলছি তারও পিছনে ঐ এক সত্তা, যিনি থাকায় সকলে দেখছে শুনছে জানছে— তাঁকে বলছেন পরম তত্ত্ব। বিষয়টি সহজবোধ্য নয় তবে একদিক দিয়ে দেখলে সুস্পষ্ট। আমরা ব্রহ্মকে খুঁজছি জ্ঞানের বিষয়রূপে জানবার জন্য। যেন একটা কুকুর তার লেজকে

ধরবার জন্য চেষ্টা করছে, ঘুরছে কিন্তু লেজের নাগাল পাচ্ছে না। সেইরকম আমরা বাইরে তাঁকে খুঁজছি। বাইরে খুঁজে তাঁকে পাব না। তিনিই একমাত্র সৎ অর্থাৎ আছেন, তাঁর উপরে জগতের সব বস্তু আরোপিত। যত কিছু ক্রিয়া সবই তাঁকে অবলম্বন করে হচ্ছে। তাঁকে পরম অবলম্বন, অধিষ্ঠানরূপে জানা যায়। সেই সত্যস্বরূপ পুরুষের দ্বারা আমি আমাকেও জানি। আমার আমিত্ব প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর প্রভাব দ্বারা। বলছেন, আমরা মনে করি সূর্য সব বস্তুকে প্রকাশ করে। তা নয়, তিনি সব বস্তুকে প্রকাশ করেন, সূর্যকেও। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'— তাঁর যে জ্যোতি, প্রকাশ, তার দ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত। অথচ আমাদের কি দুর্ভাগ্য এইরকম বস্তুকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না, আমাদের জ্ঞানের বিষয় করতে পারছি না। আমরা বলি, তিনি বাক্য মন ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁকে জানা যায় না। শ্রুতি আশ্বাস দিচ্ছেন, দূরে কোথাও যেতে হবে না তিনি অন্তরেই আছেন, তোমার হৃদয়গুহাতে তিনি অবস্থান করছেন, এজন্যই তোমার মন বুদ্ধি কাজ করছে। 'যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্' (কেন উ., ১।৬)—যাঁকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না, যাঁর দ্বারা মন বিজ্ঞাত হচ্ছে, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে। 'তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে' (কেন উ., ১।৫)— যাঁকে ব্রহ্ম বলে জানি, বাহ্যরূপে উপাসনা করি সে বস্তু ব্রহ্ম হতে পারেন না। ব্রহ্ম সকলের অন্তরতম, আমরা বাইরে তাঁকে খুঁজছি আমাদের দৃষ্টি বাহ্যদৃষ্টি। 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্' (কঠ উ., ২।১।১)— ভগবান সকলের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন সুতরাং জীব বাহ্যবস্তুকে জানে, অন্তরাত্মাকে নয়। এই দৃষ্টিকে যদি ফেরাতে পারি, ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখ করতে পারি তাহলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। কিরকম করে প্রকাশিত হন? অন্তরতম রূপে। সকলের অভ্যন্তরে তিনি আছেন বলে যতরকমের উপাধি গুণক্রিয়াদি সব প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি না থাকলে জগৎ অন্ধকার। আমরা মনে করছি ইন্দ্রিয় বিষয়কে প্রকাশ করে কিন্তু ইন্দ্রিয়কে প্রকাশ করে কে? মন। মনকে প্রকাশ করে কে? যিনি মনেরও অতীত প্রকাশস্বরূপ তিনি মনকে প্রকাশ করেন। যে প্রকাশক সে কখনো প্রকাশ্য হতে পারে না, কর্তা কখনো কর্ম হয় না। তিনি সদা বিষয়ী, কখনো বিষয় নন। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। গীতায় যেমন বললেন, 'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্' (১০।৩৯)—আমি ছাড়া জগতে স্থাবর জঙ্গম আর কোন বস্তু

নেই। একের পর যত খুশি শূন্য বসালে তার অর্থ হয় কিন্তু একক বাদ দিলে শূন্যগুলি শূন্যমাত্রই। ঠিক সেইরকম ব্রহ্মবস্তুতে বিভিন্ন ধর্মের আরোপ করে বিভিন্ন ভাবে দেখছি। যেমন শরীরের ধর্ম তাঁতে আরোপ করে বলছি তিনি স্থূল কৃশ ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম আরোপ করে বলছি তিনি অন্ধ খঞ্জ বধির। মনের ধর্ম আরোপ করে সুখী দুঃখী বলি, এগুলি সবই কিন্তু আত্মসত্তায় সত্তাবিশিষ্ট। সেই একককে বাদ দিলে সব শূন্য। অদ্বৈত তত্ত্ব বলতে এই বোঝায়। তাঁকে একও বলা হয়নি। একক বললে যেন একটি গুণ বলা হলো, পরিচ্ছিন্ন বিশেষিত করা হলো। এইজন্য তাঁকে বলেছেন অদ্বৈত, যিনি দ্বৈত নন। এই negative প্রণালীতে, নেতিবাচক ব্যাখ্যাতে আমরা তাঁকে ধারণা করার চেষ্টা করতে পারি। যে নেতি নেতি করছে সে নিজেকে নেতি করতে পারে না, শূন্য হতে পারে না। কারণ সে শূন্য হলে বিচার করবে কে? কাজেই যে তিনি পশ্চাতে রয়েছেন তাঁকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, তিনি হচ্ছেন সকল আরোপের অধিষ্ঠান। অন্যত্র আছে—

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ। (২।২।৬)

—চক্রশলাকাগুলি যেমন চক্রের নাভিতে অবস্থিত সেইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব তাঁকে আশ্রয় করে রয়েছে। সকল ইন্দ্রিয়াদি মন দেহ বুদ্ধি— আমরা যাকে ব্যবহারিক আত্মা বলি, আমি বলে যাকে বলি সব তাঁরই উপর নির্ভর করছে। তিনি হচ্ছেন আধার, সকলে আধেয়। আধেয় কি রকম ভাবে? না, ব্রহ্মের উপরে তারা আরোপিত। বাস্তবিক রূপে তারা সেখানে নেই, আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত মাত্র। ব্রহ্মের উপরে এই জগৎ-বৈচিত্র্যের কল্পনা করা হয়। ব্রহ্ম বলতে মূর্ত অমূর্ত, প্রাণবিশিষ্ট প্রাণহীন, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়হীন প্রভৃতি জগতের সমস্ত বস্তুকে বলা হচ্ছে। একটা দড়িকে নানাজনে নানারকম কল্পনা করে, কেউ দেখছে সাপ, কেউ দেখছে লাঠি, কেউ জমির ফাটল, কেউ দেখছে একটা জলের ধারার মতো, কেউ তাকে মালার মতো দেখছে— সাপ লাঠি প্রভৃতি যার উপর আরোপিত হচ্ছে তার সত্তা কোথায়? ঐ রজ্জুতেই। রজ্জুকে বাদ দিলে এরা কেউ থাকে না। তাহলে রজ্জুকে জানব কি করে? না, যা কিছু আরোপ করছি সেই আরোপিত বস্তুগুলিকে বাদ দিলে যাতে আরোপ করছি তাকে পাব। আরোপের অধিষ্ঠান

না থাকলে আরোপ হয় না। স্ফটিকের ধর্ম সাদা রঙ। সেই স্ফটিককে লাল দেখাচ্ছে যেহেতু তার কাছে অবস্থিত জবা ফুলের লাল রঙ তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে। জবা ফুলটি সরিয়ে দিলে স্ফটিক থাকবে কিন্তু তার প্রকাশ কিরূপ হবে? তার আর বর্ণনা সম্ভব নয়। তিনি এ নয়, ও নয়, তিনি সে নয়, তিনি এই— তাঁর এরূপ ইতিপর ব্যাখ্যা হয় না। তিনি এইপ্রকার— এরকম বলা যায় না, ভগবানের ইতি করতে নেই—ঠাকুরের কথা। ইতি করা মানে সীমিত করা, কোন এক বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ করা। তাহলে ভগবানের ভগবত্তা অর্থাৎ সকলের অধিষ্ঠানতা থাকে না। তাঁকে বুঝবার জন্য বার বার এই আরোপ অধ্যারোপের অপবাদ করতে হয়। অর্থাৎ যা কিছু তাঁর উপরে আরোপিত হচ্ছে সেগুলিকে যদি নিষেধ করা যায় অবশেষে যা থাকবে তাই তিনি। যেখানে নিষেধের বস্তু সব শেষ হয়ে যাবে সেখানে একমাত্র নিষেধকর্তাই থাকবে। নিষেধ যে করছে সে না থাকলে কে নিষেধ করবে? সুতরাং তাকে রাখতেই হবে আর তাকে কোন বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা যাবে না। এইজন্য তাকে নির্বিশেষরূপে বুঝতে হবে। নির্বিশেষ রূপ ধারণা করার আর অন্য কোন উপায় নেই। আমরা বস্তুকে জানতে পারি গুণক্রিয়াদির দ্বারা। গুণক্রিয়াদি যাতে নিষিদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ গুণক্রিয়াদি যেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই তিনি। তিনি সর্বাধিষ্ঠান, সব তাঁর উপরে আরোপিত। 'অত্র এতৎ সমর্পিতম্'— এই ব্রহ্মেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত মানে কি? না, ব্রহ্মের উপর এগুলি উপাধিরূপে কল্পিত হয়েছে। আসলে এক ব্রহ্ম আছেন আর অন্য কিছু নেই, এইটুকু বোঝাবার জন্য এত কথা বলতে হচ্ছে। কিন্তু এত কথা বললেও আমাদের ধারণা হয় না। কারণ আমাদের এইভাবে চিন্তা করবার অভ্যাস নেই। আমরা সবসময় বিষয়কে দেখি, বিষয়ীকে দেখতে পারি না। আমি দেখছি, আমি করছি, আমি খাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, এসব ক্রিয়ার কর্তা হিসাবে নিজেকে দেখি কিন্তু কর্তারূপে যাকে দেখি তাকে বিশ্লেষণ করে এসবের অতীত কোন বস্তুরূপে ভাবতে পারি না। অর্থাৎ জাতি গুণ ক্রিয়া এগুলিকে অবলম্বন না করে আমরা কোন বস্তুকে অনুভব করতে পারি না। তাই ব্রহ্মকে আমরা ভাবতে পারি না। ভাবতে হলে আমাদের বিচার ধারাটিকে বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে হয়। আমরা যাচ্ছি বিষয়ের দিকে, বাহ্যবস্তুর দিকে, তাকে ফিরিয়ে অন্তরের দিকে, বিষয়ীর দিকে নিতে হবে। যদি তা করতে পারি তাহলে আত্মাকে জানতে পারব। বলছেন যে, 'কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্

আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্' (কঠ উপ., ২।১।১)— বিরল কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃতত্বের অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে পরম তত্ত্বকে দেখতে পান। পরম তত্ত্বকে জানবার উপায় যে দৃষ্টিকে ফেরানো এইটি বার বার করে বলা হয়েছে। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, সার্জেনের হাতে একটা লণ্ঠন থাকে। সেই লণ্ঠন দিয়ে সার্জেন সবাইকে দেখে কিন্তু তা দিয়ে সার্জেনকে কেউ দেখতে পায় না, কারণ সেটা তারই হাতে। তাই বলছেন, সার্জেন সাহেব, আলোটা একটু তোমার মুখে ফেল যাতে তোমাকে দেখতে পাই। অর্থাৎ দৃষ্টিকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিতে বলছেন। তা করতে পারলে তাঁর স্বরূপের উপলব্ধি হয়। আমরা বলি ব্রহ্ম অজ্ঞাত, তা নয়, তাঁর জ্ঞান সর্বদাই রয়েছে। আমরা সে বিষয়ে উদাসীন থেকে যিনি অন্তরতম তাঁকে অন্তরে না দেখে বাইরে খুঁজছি। বিষয়গুলি জানা হয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের পিছনে মন, মনের পিছনে তিনি, তাঁর সত্তায় মন সত্তাবান। এইভাবে একটা বিচারশৈলী দেখানো হয়েছে, কিভাবে বিচার করলে ব্রহ্মকে জানতে পারি তার ধারা বলা হয়েছে। পরিদৃশ্যমান এই জগতের মধ্যে খুঁজলে তাঁকে পাব না, তিনি বাহ্য বস্তু নন। সমস্ত জীব সমস্ত বস্তুর ভিতরে স্ব-স্বরূপে তিনি অধিষ্ঠিত, সত্তারূপে প্রকাশরূপে রয়েছেন। আমরা তাঁকে সেভাবে না দেখে তাঁর উপর বস্তুধর্মের আরোপ করে তাঁকে হ্রস্ব-দীর্ঘ-স্থূল-সূক্ষ্ম নানানভাবে দেখতে যাচ্ছি। তাই উপনিষদের গোড়ার কথাটা হচ্ছে এই যে, তাঁকে জান। বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে—

'ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়া
ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ।'

(বৃ. উ., ৩।৪।২)

—দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখতে চেও না, শ্রবণের শ্রোতাকে শুনতে চেও না, মনোবৃত্তির মননকারীকে মনন করতে চেও না, বুদ্ধিবৃত্তির বিজ্ঞাতাকে জানতে চেও না। আমরা যেগুলি উপায় বলে জানি সেগুলি সব সেখানে অচল, সেখানে তারা কাজ করে না। যে খুঁজছে তার অন্তরাত্মারূপে তিনি রয়েছেন, সে তাঁকে বাইরে খুঁজে পাচ্ছে না। তার অন্তরে খুঁজলে দেখবে সেখানে তিনি নিত্য প্রকাশমান। তাঁর প্রকাশের দ্বারাই তার নিজের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয় সব সেখানে এক হয়ে গিয়েছে।

সেই তত্ত্ব জানা হলে কি লাভ হয়? না, যখন কেউ জানে যে দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্মের দ্বারা সে পরিবর্তিত হচ্ছে না তখন সুখ-দুঃখাদি তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না সে যখন দেখে যে সে দেহাদি থেকে ভিন্ন তখন দেহাদির ধর্ম তাকে আলোড়িত করবে কি করে? বলছেন, মানুষ যখন জানে—

'আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ॥' (বৃ. উ., ৪।৪।১২)

—যদি কেউ আত্মাকে 'আমি এই' এইরূপ স্বরূপেতে জানে তখন কি ইচ্ছা করে, কিসের কামনায় শরীরের সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট ভোগ করবে? সে জানে যে আমি দেহ নই মন নই এসব কিছু নই। এই হলো বেদান্তের সার কথা। কথাটি সহজ সুস্পষ্ট হলেও বুদ্ধির অগোচর। কেন এরকম হয়? না, আমাদের বিচার ধারাটা এমন যে, আমাকে বাদ দিয়ে আর সব জিনিসের বিচার করি। তাই বিস্তার করে বললেও মন ধারণা করতে পারছে না। আর কেবল হেঁয়ালীর ভাষায় বললে তো কিছুই বোঝা যাবে না। তিনি 'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে' (ঈশ উপ., শ্লোক—৫)—তিনি চলেন, চলেন না, তিনি দূরে আবার নিকটে। এভাবে বললে তো সমস্যা আরও গভীর হচ্ছে। সন্দেহাকুল মন কিছুতেই পরম তত্ত্ব ধারণা করতে পারে না। এইজন্য তাঁকে এইভাবে বুঝতে হবে যে, সমস্ত বস্তুর পিছনে তিনি সত্তারূপে বিদ্যমান। তাঁকে জানলে এই জগৎ-বৈচিত্র্য যা এতকাল ধরে তাঁর উপরে আরোপ করছিলাম সে সমস্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়, আর তা যদি হয় তো সেই মিথ্যা বস্তুকে জেনে কোন লাভ নেই। সেইজন্য সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এজন্য বলছেন, 'তমেব একং জানথ আত্মানং'— সেই আত্মাকে জান আর অন্য সব প্রয়াস ছাড়। এ জগতের অনন্ত বস্তুকে কত জানবে? আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের বস্তুকে জানতে চাইছি। একটি করে পর্দা তুলছি দেখছি তার পিছনে আর একটি পর্দা। অনাদিকাল ধরে এরকম চলছে। অনন্তকাল ধরে চললেও আমরা এর অন্ত পাব না। শাস্ত্র পড়ার তাৎপর্য এইখানে যে এককথায় যা বোঝা যায় তাকে আমরা হাজার কথায় বুঝতে চেষ্টা করছি। 'অধ্যারোপাপবাদ্যাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চঃ প্রপঞ্চ্যতে'— অধ্যারোপ আর অপবাদ এই দুইটি উপায়ে সেই প্রপঞ্চবিহীন আত্মাকে বিস্তার করে বলছেন। আমাদের মন ছড়িয়ে আছে

তাকে গুটিয়ে আনবার জন্য বিস্তার করে বলার দরকার। বলছেন, এখানে কি দেখছ, বাড়ি? ওখানে তিনি। ওখানে কি দেখছ, গাছ পশু পক্ষী মানুষ? ওখানেও তিনি। এইরকম প্রত্যেক বস্তুর আড়ালে তিনিই, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। সুতরাং সব দৃশ্য বস্তুগুলিকে ত্যাগ কর 'অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ' (মুঃ. উপ., ২।২।৫) সেই আত্মা ছাড়া আর সমস্ত চিন্তাকে পরিত্যাগ কর। কারণ সেগুলি সব মিথ্যা চিন্তা। মিথ্যা বস্তুকে জেনে কোন লাভ হবে না। দড়িটাকে সাপের মতো দেখে যে সাপ বলছি সেই সাপকে জানবার জন্য যদি চেষ্টা করি জানতে পারব না। যার দ্বারা সাপের প্রকাশ হচ্ছে সেই তত্ত্বকে যদি জানতে চাই তাহলে ঐ দড়িতে পৌঁছাব। দড়িকে জানলে তার উপরে যত প্রকারের আরোপ হচ্ছে সেগুলি জানবার আর কোন দরকার হবে না।

এ শুধু জ্ঞানীর নয় ভক্তেরও কথা। জগৎ বলে যা দেখছি সব তিনি। 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'— যা দেখছেন সবই কৃষ্ণময়। তার মানে কি? শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন আর নূপুর পায়ে দিয়ে নাচছেন, এই দেখছেন? সে আর সম্ভব নয়, দেখলে তা হবে মানসিক বিভ্রান্তি। আসলে যেখানে যে বস্তু দেখছি তার পিছনে সত্তারূপে তিনি রয়েছেন, তাঁর প্রকাশ আছে বলে বস্তুটি প্রকাশমান বলছি। দড়ির প্রকাশ আছে বলে সাপের প্রকাশ দেখি। প্রকাশস্বরূপ একমাত্র তিনিই। বাইরে খুঁজলে তাঁকে কোথায় পাব? যতদূর যাব ততদূর দেখব আরোপের পর আরোপ, ভেল্কির পর ভেল্কি, এক একটা ইন্দ্রজালের মায়া। কিন্তু মায়াবীকে জানতে পারলে আর কোন মায়াই আচ্ছন্ন করতে পারবে না। মায়াকে জানব কেমন করে? বিচার করে। যে জানছে তার আত্মারূপে তাঁকে জানবে।

জগতের বস্তুকে এক একটি করে জানতে হলে অনন্তকালেও শেষ হবে না। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম এই চক্রে আমরা অনন্তকাল ধরে আবর্তিত হচ্ছি তবুও এর অন্ত খুঁজে পাচ্ছি না। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানের সাহায্যে বাহ্য বস্তুর ভিতর দিয়ে তাঁকে খুঁজতে। পরিণাম কি হচ্ছে? তাঁরা দেখছেন একটির পর একটি আবরণ হয়তো খুলে যাচ্ছে আবার সঙ্গে সঙ্গে পরের আবরণটি চোখে পড়ছে। বলছেন, এই জগতের পরে কি? নীহারিকা। তারপরে আবার আর একটি নীহারিকা। এইরকম একটির পর একটি নীহারিকা অর্থাৎ অজ্ঞানের পর্দা যেন চারিদিকে বেষ্টন

করে রয়েছে, এর শেষ হবে না। শেষ হবে কি করে? যেখান থেকে এই সমস্তের উদ্ভব সেই কেন্দ্রে ফিরে যাওয়ায়। সেখানেই 'সর্বং অত্রৈতৎ সমর্পিতম'— সমস্ত জগৎ তাঁতে আরোপিত রয়েছে। কিন্তু এতবার শুনে বা জেনেও মানুষের মোহ যাচ্ছে না। কারণ সে অশুদ্ধ মন দিয়ে অন্বেষণ করছে। অতএব যে যন্ত্র দিয়ে তাঁকে জানা যাবে তাকে আগে 'শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত' (মু. উপ., ২।২।৩) — উপাসনারূপ উপায়ের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত আত্মারূপ শরটির দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ কর এবং সেই লক্ষ্য থেকে তা যেন বিচ্যুত না হয়। এইজন্য মনকে শুদ্ধ না করলে হবে না। শুদ্ধ মন মানে যে মনে কোন আরোপ নেই, রাগ-দ্বেষ নেই, আকর্ষণ-বিকর্ষণ নেই। শুদ্ধ হতে হতে মনের খোলসগুলি সব ছাড়িয়ে ফেললে দেখা যাবে সেখানেও সেই একই আত্মা। জ্ঞানী ভক্ত দার্শনিক কবি কতভাবে তাঁর বর্ণনা করছেন। বর্ণনার শেষ নেই, চলারও শেষ নেই। কারণ আমরা বিপরীত দিকে, বাইরের দিকে চলেছি। বাইরের অনন্ত বৈচিত্র্যের কখনো শেষ হবে না। শেষ করতে হলে অন্তরের দিকে দেখতে হয়, স্রষ্টাকে দেখতে হয়। দেখলে দেখা যাবে সবার পিছনে সেই এক জ্ঞানস্বরূপ সত্তাস্বরূপ তিনি আছেন, যিনি বাহ্য-জগৎ রূপে, এমনকি জগতের যে স্রষ্টা তারও 'আমি' রূপে বিরাজ করছেন।

'যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।।' (২।২।২)

যৎ (যাঁহা) অর্চিমৎ (দীপ্তিমান), যৎ (যাঁহা) অণুভ্যঃ (সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ থেকে) অণু (সূক্ষ্ম) চ (এবং [যাঁহা স্থূল থেকে স্থূল]), যস্মিন্ (যাঁতে) লোকাঃ (ভূরাদি লোকসমূহ) লোকিনঃ চ (এবং লোকনিবাসিগণ) নিহিতাঃ (অবস্থিত) তৎ (তিনিই) এতৎ (সর্বাস্পদ) অক্ষরম্ ব্রহ্ম (অক্ষর ব্রহ্ম); সঃ (তিনি) প্রাণঃ (প্রাণ) তৎ উ (তিনিই আবার) বাক্ মনঃ (বাগিন্দ্রিয় ও মন, অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়)— তৎ এতৎ (সেই ব্রহ্মই) সত্যম্ (সত্য), তৎ (তিনি) অমৃতম্ (অবিনাশী); সোম্য, (হে সোম্য), তৎ (তিনিই) বেদ্ধব্যম্ (বিদ্ধ করার যোগ্য অর্থাৎ মনের দ্বারা ভাবনীয়), বিদ্ধি (ভেদ কর, তাঁতে মন সমাহিত কর)।

যিনি দীপ্তিমান, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর এবং স্থূল থেকেও স্থূলতর, যাঁর মধ্যে লোকসমূহ এবং লোকসকলের অধিবাসীরা অবস্থিত তিনিই সর্বাস্পদ অক্ষর ব্রহ্ম। তিনিই প্রাণ, বাক্য ও মন। তিনিই সত্যস্বরূপ, তিনিই অবিনাশী। হে সোম্য, তিনিই বিদ্ধ করার অর্থাৎ জানার যোগ্য, তাঁকে জান।

যিনি দীপ্তিমান, প্রকাশধর্মী, অণু থেকেও অণুতর, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর এবং 'চ' শব্দ দ্বারা বুঝতে হবে স্থূল পৃথিবী আদি অপেক্ষা স্থূলতর, যাঁতে 'লোকা নিহিতা'— ভূঃ ভূবঃ স্বঃ-আদি লোক নিহিত, অবস্থিত এবং যারা লোকী, লোকের অধিবাসী, মনুষ্যাদি জীব তারাও অবস্থিত 'তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম' —তিনিই এই সর্বাস্পদ অক্ষর ব্রহ্ম; 'স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ'— তিনিই প্রাণ, বাক্য ও মন; 'তদেতৎ সত্যং'— তিনি সত্যস্বরূপ অবিকারী; 'তদ্ অমৃতং' —তিনি অমরণধর্মী অবিনাশী; 'তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি'— হে বৎস, তাঁকেই বিদ্ধ করতে হবে, তুমি তাঁকে বিদ্ধ কর, জান। যিনি জ্ঞানের বিষয় তাঁকে তুমি জান। তবে তাঁকে সমস্ত বিকারের আশ্রয় রূপে জানবে বিকারী রূপে নয়। তিনি সর্বপ্রকার, সর্বরূপ জ্যোতির্ময়। অমরণধর্মী কথাটির দ্বারা সমস্ত কথাই বলা হলো। এই জগৎ বিকারী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল বস্তুর পিছনে একটি অপরিবর্তনশীল তত্ত্ব না থাকলে পরিবর্তন ঘটতে পারে না। তাহলে পরির্বতন জানবে দেখবে কে? কার পরিবর্তন? যে বস্তুর পরিবর্তন সে বস্তুটি কিন্তু অপরিবর্তনশীল। সেই অপরিবর্তনশীল বস্তুর তুলনায় অন্যান্য বস্তু পরিবর্তনশীল।

এটি শাস্ত্রের একটি প্রধান কথা। ব্রহ্মকে আমরা জানব যে, তিনি জগতের আধার তাঁর উপরে জগৎ কল্পিত হচ্ছে। জীব ও জগৎ যে বস্তুকে আশ্রয় করে রয়েছে সেই তত্ত্বকে, জগতের আদি কারণকে জানলে সমস্ত কার্য বস্তুকে জানা হয়ে যায়। যে পরির্বতন দেখছে সে পরিবর্তনশীল হলে পরিবর্তন দেখতে পারত না। এইজন্য তাঁকে অপরিবর্তনশীল বলা হয়। আর তিনিই একমাত্র প্রকাশস্বরূপ। যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তার অধিষ্ঠানরূপে, প্রকাশরূপে তিনি রয়েছেন বলে তা প্রকাশ পাচ্ছে। 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রাতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ' (কঠ. উপ., ২।২।১৫) —সেই আত্মবস্তুতে সূর্য চন্দ্র তারকা প্রকাশ পায় না, বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না আর অগ্নির তো কথাই নেই। অর্থাৎ এগুলিকে আমরা প্রকাশশীল বলে মনে করি কিন্তু বস্তুত তা নয়। এক স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশের দ্বারা এরা সবাই প্রকাশিত। 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং' (কঠ উপ., ২।২।১৫) —সেই তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন বলে তাঁর প্রকাশকে আশ্রয় করে আর সকলে প্রকাশিত হচ্ছে। এই কথাটি বিশেষ করে বোঝানো হচ্ছে উপনিষদের কাজ। আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে জানা যায় না, তাঁকে চোখ দিয়ে দেখা, কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে

গ্রহণ করা যায় না, মনের দ্বারাও তাঁকে ধারণা করা যায় না। কিন্তু এই আত্মবস্তু সকলের পিছনে আছেন বলে এরা প্রকাশিত। ইন্দ্রিয়গুলি, অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলির প্রকাশ তাঁরই প্রকাশকে আশ্রয় করে। এই মূল কথাটিকে বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করে বলবার জন্য যেন বলা হলো জগতে যা কিছু প্রকাশধর্মী সে-সব তাঁর প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত। তিনি বাক্‌রূপে মনরূপে অর্থাৎ সর্ব কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপে প্রকাশিত। তিনিই সেই এক সত্য, তিনিই অমৃত অবিনাশী। যদি তাঁর বিনাশ কল্পনা করা যায় তাহলে সেই বিনাশ দেখবে কে? যে বিনাশ দেখবে সেও তো তাঁকে আশ্রয় করে রয়েছে। সুতরাং তিনি অবিনাশী রূপে না থাকলে বিশ্বজগৎ কিছুই প্রকাশিত হতো না। 'তদ্বেদ্ধব্যং'— সেই পুরুষটিকে বিদ্ধ করতে হবে, জানতে হবে, অর্থাৎ তাঁতে মন নিবিষ্ট করতে, স্থির করতে হবে। বৈচিত্র্য থেকে মনকে সরিয়ে বৈচিত্র্যের আধার যিনি তাঁকে দেখ তাহলে সবই যে তাঁর উপরে আধারিত তা জানা যাবে। তাই গুরু বললেন, তোমার মনকে তাঁতে সমাহিত কর।

ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করার উপায় বলছেন তৃতীয় মন্ত্রে—

'ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥' (২।২।৩)

হে সোম্য, ঔপনিষদম্ (উপনিষদে প্রসিদ্ধ) মহা-অস্ত্রম্ (মহাস্ত্র) ধনুঃ (ধনু অর্থাৎ প্রণব) গৃহীত্বা (গ্রহণ করে) উপাসানিশিতম্ (উপাসনা, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত) শরম্ (বাণ [অর্থাৎ জীবাত্মাকে]) হি সন্ধয়ীত (সন্ধান করবে); আয়ম্য (ধনুর গুণ আকর্ষণ করে [মন ও ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে]) তৎ-ভাব-গতেন (লক্ষ্যনিবিষ্ট, [ব্রহ্মগত]) চেতসা (চিত্তে) [বেদ্ধব্য, জ্ঞাতব্য] তৎ (সেই) অক্ষরম্ লক্ষ্যম্ এব (অক্ষররূপ লক্ষ্যকেই) বিদ্ধি (বিদ্ধ কর [অর্থাৎ তাঁতে মন সমাহিত কর])।

হে সোম্য, উপনিষদে কথিত প্রণবরূপ যে মহাস্ত্র— ধনু, উপাসনা দ্বারা তাতে তীক্ষ্ণীকৃত শর যোজনা কর, তাঁর ভাবনা দ্বারা শুদ্ধ হয়েছে যে চিত্ত তার দ্বারা সেই ধনুকে আকর্ষণ করে লক্ষ্য বিদ্ধ কর।

হে সোম্য, উপনিষদে কথিত প্রণবরূপ যে মহাস্ত্র— ধনু, তাতে উপাসনার দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত শর যোজনা কর অর্থাৎ উপাধিযুক্ত আত্মাকে প্রণবধনুতে

যুক্ত কর এবং সেই শরের দ্বারা লক্ষ্যকে বিদ্ধ কর। কিভাবে বিদ্ধ করবে? 'আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা'— ভাবনার দ্বারা শুদ্ধ হয়েছে যে চিত্ত তার দ্বারা। শর নিক্ষেপ করার আগে ধনুর জ্যাকে আকর্ষণ করতে হয়, তাই বলা হচ্ছে 'আয়ম্য'— ভাবগত চিত্ত দ্বারা সেই ধনুকে আয়মন বা আকর্ষণ করে লক্ষ্য বিদ্ধ কর।

এখানে লক্ষ্য হচ্ছেন অক্ষরপুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম, ধনু হচ্ছে ওঁকার বা প্রণব। উপনিষদে এই প্রণবের কথা বলা হয়েছে তাই ওঁকার ঔপনিষদ্। 'অস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি অস্ত্রম্'— সাধারণভাবে অস্ত্রের ও শস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করা হয় এইভাবে— যা নিক্ষেপ করা হয় তাই অস্ত্র, যথা বর্শা; আর শস্ত্র যা হাতে থাকে, যথা অসি। কিন্তু এই অর্থে ধনু অস্ত্রপদবাচ্য নয়। এখানে যার দ্বারা আমরা অস্ত্র নিক্ষেপ করি তাকে অস্ত্র বলা হচ্ছে। প্রণব এখানে ধনু, তার লক্ষ্য অক্ষরপুরুষ। তাই সেই প্রণব সাধারণ অস্ত্র নয়, মহাস্ত্র। সেই ধনুতে 'শরং হ্যুপাসা-নিশিতং সন্ধয়ীত'— ঔপাধিক আত্মারূপী শরকে 'উপাসা-নিশিত' অর্থাৎ উপাসনার দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত; শুদ্ধ করতে হবে। আমি কর্তা ভোক্তা ইত্যাদি ভাব ত্যাগ করতে হবে। তারপর সেই নিশিত শরকে লক্ষ্যবস্তুর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ কর। নিক্ষেপের পূর্বে ভাবগত চিত্ত দ্বারা ধনু আকর্ষণ কর। ধ্যেয় বস্তুর সম্বন্ধে যে চিন্তা তার নাম ভাব। ভাবগত চিত্তের অর্থ ধ্যেয় বস্তুতে স্থিরীকৃত মন। আমাদের মন বিষয়াসক্ত আর নানাপ্রকার উপাধি আত্মাতে যুক্ত হয়ে রয়েছে। প্রণবের অভ্যাসের দ্বারা এই আত্মাকে উপাধিমুক্ত করতে হবে।

এই তৃতীয় মন্ত্রটিরই বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে চতুর্থ মন্ত্রে—

'প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥' (২।২।৪)

প্রণবঃ (ওঙ্কার) ধনুঃ (ধনু), আত্মা হি (জীবাত্মাই) শরঃ (বাণ), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) তৎ-লক্ষ্যম্ (উক্ত শরের লক্ষ্য) উচ্যতে (কথিত হন); অপ্রমত্তেন (প্রমাদহীন হয়ে) বেদ্ধব্যম্ (ভেদ করতে হবে), [অতঃপর] শরবৎ (বাণের ন্যায়) তন্ময়ঃ (লক্ষ্যের সঙ্গে অভিন্ন) ভবেৎ (হবে)।

ওঙ্কার ধনু, ব্যবহারিক আত্মা শর, ব্রহ্ম ঐ শরের লক্ষ্য। প্রমাদহীন হয়ে লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে হবে। শরের মতো লক্ষ্যের সঙ্গে অভিন্ন হবে।

প্রণব ধনু, শর আত্মা, ব্যবহারিক আত্মা—empirical self, লক্ষ্য

ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম 'অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং'। প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা, লক্ষ্য বিষয়ে মনের ভ্রান্তি, লক্ষ্য বস্তুকে ভুলে যাওয়া। লক্ষ্যবস্তুতে সর্বদা মনকে স্থির করে রাখা অপ্রমাদ। সেই অপ্রমাদ দ্বারা লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে হবে। সাধনার একটি প্রধান বিঘ্ন এই প্রমাদ। সাধনা আরম্ভ করলাম কিন্তু সঙ্কল্প হারিয়ে গেল, ধ্যানে বসি— মন কোথায় চলে যায় অর্থাৎ মন ধ্যেয়বস্তু বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হয়। সেইজন্য সদা সতর্ক থাকতে হবে, মনঃসংযমের চেষ্টা থেকে যেন কখনো বিরত না হই। শর যেমন লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধে থাকে, তেমনি তন্ময়ভাবে মনকে লক্ষ্যে স্থির করে রাখতে হবে যেন সে সেখান থেকে বিচ্যুত না হয়। এই সাবধানবাণীটি বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে। এখানে শ্রুতি বলতে চাইছেন যে, লক্ষ্যে পৌঁছেও মনের সেখান থেকে ভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। সমাধিস্থ পুরুষেরও মন সমাধি-অবস্থা থেকে বিচ্যুত হতে পারে। তাই সমাধির অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। সমাধিতে স্থির থাকার অভ্যাস।

কিন্তু সমাধিস্থ পুরুষের ঈশ্বরলাভ হলেও কি আবার মনের স্খলন ঘটতে পারে? এখানে এই 'লাভ' কথাটি আমরা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করি না বলেই এই প্রশ্ন। সমাধি-অবস্থায় ভগবানের সম্বন্ধে অনুভূতি হলেও সে অনুভূতি এমন স্তরে পৌঁছায়নি যে সেখান থেকে মন আর বিচ্যুত হবে না। সুতরাং অনুভূতির বিভিন্ন স্তর অনুসারে ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্‌বর, ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ— ব্রহ্মবিদ্‌দের এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। সাধারণভাবে যাঁর ব্রহ্মের অনুভব হয়েছে তিনিই ব্রহ্মবিদ্। যোগের সাতটি ভূমি আছে! প্রথম তিনটি ভূমি সাধকদের— তাঁদের জগৎটাকে স্বপ্ন বলে বোধ হয়নি। চতুর্থ ভূমি যাঁর লাভ হয়েছে তিনি ব্রহ্মবিদ্। এ অবস্থায় যোগী জগৎকে স্বপ্নবৎ দেখেন। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমি জীবন্মুক্তির অবস্থাভেদ। পঞ্চম ভূমিতে যোগী নির্বিকল্প সমাধি থেকে নিজেই ব্যুত্থিত হন; তাঁকে ব্রহ্মবিদ্‌বর বলা হয়। ষষ্ঠ ভূমিতে যোগিকে অপরে ব্যুত্থিত করলে তবে তিনি ব্যুত্থিত হন, তাঁকে ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্ বলা হয়। সপ্তম ভূমি থেকে যোগীর কোন ভাবেই আর ব্যুত্থান হয় না; তাঁকে ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ বলা হয়।

সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে সাধারণ অনুভূতি মাত্র হলেই হলো না; আরও সাধন করতে হবে। ঠাকুর তোতাপুরীকে বলেছিলেন, 'তুমি সমাধিমান

পুরুষ—তাহলে অত ধ্যান কর কেন?' উত্তরে তোতাপুরী বলেন, 'রোজ যদি ঘটিটা না মাজি ময়লা হবে না?' অর্থাৎ সমাধিরও রোজ অভ্যাস করতে হয়। 'কিন্তু ঘটিটা যদি সোনার হয়?' এই প্রতিপ্রশ্ন করে ঠাকুর বোঝাতে চেয়েছেন যে, মনের এমন অবস্থা আসতে পারে যখন আর সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবার ভয় থাকে না। যেমন, তীর যদি একবার লক্ষ্যে গেঁথে স্থির হয়ে থাকে তবে তা আর সেখান থেকে ভ্রষ্ট হয় না। সেইরকম যাঁর সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, সংশয় দূর হয়েছে তিনিই পৌঁছেছেন চরম পরিণতিতে, সেখান থেকে তাঁর আর স্খলনের ভয় নেই। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত সমাধির পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের প্রয়োজন। একবার সমাধিস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে স্থির হলেই যে সব হয়ে গেল তা নয়। পুনঃ পুনঃ সুদৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা মনকে সেখানে স্থির রাখতে হবে। সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করে শ্রুতি বলছেন—

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।' (মু. উপ., ২।২।৮)

—সর্বাতীত ও সর্বগত সেই ব্রহ্মকে দর্শন করলে সাধকের হৃদয়ে অবস্থিত সমস্ত কামনা বাসনা নির্মূল হয়, সকল সংশয় দূর হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই চরম পরিণতি লাভ করলে মনের বিচ্যুতির আর কোন আশঙ্কা থাকে না, মন তখন সোনার ঘটি। এইটি বোঝাবার জন্যই ব্রহ্মবিদ্‌দের মধ্যে একটি আপাত স্তরভেদ করা হয়েছে। কিন্তু সৈদ্ধান্তিক দৃষ্টিতে দেখলে সংশয় জাগে যে, বিদ্যার দ্বারা যদি অবিদ্যার নাশ হয় তবে নতুন করে অবিদ্যার উৎপত্তি হয় কি করে? দগ্ধবীজ যেমন গাছ উৎপন্ন করতে পারে না, তেমনি অবিদ্যা দগ্ধ হয়ে গেলে তা আর মোহ সৃষ্টি করতে পারে না, এই হলো সিদ্ধান্ত। সুতরাং যখন দেখা যাবে যে, মন কোন ক্রমেই আর সেই ব্রহ্মপদ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে না তখনই বুঝতে হবে যে, আর ভয় নেই— অবিদ্যাবীজ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়েছে। এটি হলো ব্যবহারিক যুক্তি। সৈদ্ধান্তিক যুক্তিতে বুঝতে হলে দেখা যায় আলোর দ্বারা অন্ধকার দূর হয়ে গেলে অন্ধকারের আর পুনরুৎপত্তি হতে পারে না। আলো চিরকালের জন্য অন্ধকারকে নিঃশেষ করে দেয়, অন্ধকারের উৎপত্তির আর কোন কারণ থাকে না। অজ্ঞান অবিদ্যা হলো সমস্ত ভ্রমের মূল। সেই মূলের যদি উচ্ছেদ হয়ে যায়, তখন আর ভ্রমের উৎপত্তি কোথা থেকে হবে?

সিদ্ধান্তী তাই বলছেন যে, একবার অবিদ্যার নাশ হলে আর ভয় নেই। মানুষ যখন সাধনা পূর্ণ করে সেই অবস্থায় পৌঁছায় তখন সে বুঝতে পারে অবিদ্যার নাশ হলো কি না।

ব্যবহারিক জগতে দেখি যে, তোতাপুরীর মতো সমাধিমান পুরুষও চেষ্টা করে সমাধিস্থ হতে পারছেন না — মন অসুস্থ দেহে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সমাধিমান পুরুষ সাধারণ লোকের মতো মোহগ্রস্ত না হয়ে যত অমঙ্গলের মূল দেহটা ত্যাগ করা স্থির করলেন। দেহের প্রতি আত্মবুদ্ধি না থাকায় দেহের উপর তাঁর মমতা নেই। পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ হয়ে গেলে আমরা যেমন কোন মমতা না করে ছেড়ে দিই, তোতাপুরীও তেমন দেহকে সমাধি-বিরোধী মনে করে সম্পূর্ণ মমত্বরহিত হয়ে তাকে পরিত্যাগে উদ্যত। এ আত্মহত্যা নয়, কারণ দেহের উপর তাঁর আত্মবুদ্ধি নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, যাঁর দেহের প্রতি এত তুচ্ছতাবোধ সেই সমাধিমান পুরুষের পক্ষেও মনকে সমাধিস্থ করা সম্ভব হয়নি। এইজন্য শ্রুতি সতর্ক করে বলছেন — 'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ'।

সাধনের বিঘ্ন সম্বন্ধে শাস্ত্র বলছেন —

'লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥'

(মাণ্ডূক্যকারিকা, ৩।৪৪)

— 'লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তং' — মনের যখন লয় হয় অর্থাৎ মন যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তাকে জাগাতে হবে। ধ্যেয়বস্তুতে মনঃসংযোগ করার সময় কখনো কখনো মন ঘুমিয়ে পড়ে। মনের ঘুমিয়ে পড়া আর ধ্যান করবার সময় যে ঝিমুনি — এ-দুটোর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। দেহের ক্লান্তিবশতঃ মনের যে অবসাদ তারই ফল ঝিমুনি। কিন্তু সাধন-পথে যেতে যেতে মনের চাঞ্চল্যের কারণ বিষয়-তৃষ্ণাও যখন শমিত হয়ে যায় তখন মনের যে একটা শান্তির অবস্থা, যাকে relaxation (বিশ্রান্তি) বলা যায়, তাকেই বলে লয়। তখন ধ্যাতা নিজের ধ্যেয়বস্তুকে পর্যন্ত ভুলে যান। সেই লয় যখন আসবে তখন মনকে জাগাতে হবে।

'বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ' — যখন বিক্ষেপ আসবে, লক্ষ্য থেকে মন ভিন্ন বস্তুতে চলে যাচ্ছে, এই অবস্থা যখন হবে তখন তাকে শমিত

করতে হবে। অর্থাৎ সেই গতিকে রুদ্ধ করে তাকে আবার লক্ষ্যে স্থির করতে হবে।

তারপর বলছেন— 'সকষায়ং বিজানীয়াৎ'। এটি মধ্যবর্তী অবস্থা। অর্থাৎ মনের পূর্ণ স্থিরতার প্রথম বিঘ্ন 'লয়' নেই, দ্বিতীয় বিঘ্ন লক্ষ্য ভিন্ন অন্য বিষয়ে 'বিক্ষেপ' নেই, তথাপি মন সাম্যভাবাপন্ন হয়নি, আত্মস্থ হয়নি। একদিকে লয়-বিক্ষেপের অভাব, অন্যদিকে সাম্যের অভাব, এই দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা হচ্ছে কষায় অবস্থা। সাধক যে অবস্থায় পৌঁছেছে তাতে যে আনন্দের অনুভূতি হচ্ছে সেটা হচ্ছে কষায়। ঐ আনন্দের আস্বাদনের প্রতি আকর্ষণ মন থেকে চলে যায়নি তাই সাম্যাবস্থা আসছে না, পূর্ণ আত্মজ্ঞান হচ্ছে না। এই মধ্যবর্তী অবস্থাকে 'বিজানীয়াৎ'— জানতে হবে, বুঝতে হবে যে, ঐ আনন্দের প্রতি আসক্তি মনের গহনে থেকে যাওয়ার ফলেই দুটি বড় বিঘ্ন চলে গেলেও লক্ষ্যপ্রাপ্তি ঘটছে না। এই তৃতীয় বিঘ্নটিকেও দূর করতে পারলে সব বাধা অপসারিত হওয়ায় মন শমিত হয়ে যায়।

এরপরে নির্দেশ— 'সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ'। সম বলতে স্থিতির অবস্থা—ব্রহ্মের স্বরূপতা। এই স্বরূপতা যখন আসবে অর্থাৎ মন যখন ব্রহ্মে তন্ময় হবে তখন তাকে 'ন চালয়েৎ' সেখান থেকে বিচলিত করবে না। তীর যদি লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে না বিদ্ধ হয়, একটু পরেই তার ভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে। সেইরকম ধ্যেয়বস্তুতে মন গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট না হলে তা থেকে মনের বিচ্যুত হবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং মনকে সেই ব্রহ্মে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখবে সে যেন আর বিচ্যুত না হয়। এটি সাধকের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় কথা। আমাদের মন এক-ছটাক আধার, এতটুকু পেলেই ভাবে তার সব হয়ে গেল। তাই তাকে সাবধান করা হলো— 'সকষায়ং বিজানীয়াৎ'— মনকে জাগ্রত করে রাখ, বিচার করে দেখ এখনো কত পথ বাকি। তারপর বলা হলো— 'সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ'—সমতা প্রাপ্তির পর আর যেন মন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়। এইজন্যই 'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ'— শ্রুতির এই সাবধান বাণী।

নির্বিকল্প সমাধি-উন্মুখ মনের শেষ বিঘ্ন হচ্ছে 'রসাস্বাদ'। সমাধিমান পুরুষের মন সাধারণ মানুষের মতো বিষয়াসক্ত নয় সুতরাং তার বাধা বিষয়বাসনা নয়। এক্ষেত্রে পথের আনন্দ তাঁর মনকে আটকে দেয়, পরমানন্দের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ রুদ্ধ করে। ঠাকুরের নিজের জীবনেই এর একটি দৃষ্টান্ত

রয়েছে। তোতাপুরী যখন তাঁকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন স্থির করতে বললেন তখন তাঁর নির্বিকল্প সমাধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল মা-কালীর মূর্তি। মা-কালীর মূর্তির অর্থ ব্রহ্মের সগুণভাব। ঠাকুরের কাছে তখন সমস্ত জগৎ তুচ্ছ, কারণ তিনি তখন ঈশ্বরের সগুণভাবের আস্বাদন করেছেন। তাঁর ঐশ্বর্যে মাধুর্যে তিনি বিভোর। ব্রহ্মের এই সগুণভাবের প্রতি প্রবল আকর্ষণই তাঁর আরও অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই প্রবল আকর্ষণ এড়িয়ে আর নির্বিশেষ ব্রহ্মে মন যেতে চাইছে না। সাধনের পথে এই শেষ বাধাটি যে কত প্রচণ্ড তা বোঝাবার জন্যই সেই অবতার পুরুষের এই অনুভূতি। তা না হলে তিনি জগদ্গুরু হতে পারতেন না। কি করে এই বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয় তাও তিনিই দেখালেন। তোতাপুরী যখন 'কেঁও নেই হোগা' বলে সক্রোধে ঠাকুরের ভ্রূমধ্যে তীব্র আঘাত করে বললেন, 'এইখানে মন স্থির কর' তখন ঠাকুর জ্ঞান-অসি দ্বারা মা-র মূর্তি দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং তাঁর মন হু হু করে নির্বিকল্প সমাধিরাজ্যে পৌঁছে গেল। এই অলৌকিক কাহিনী আমাদের মতো সাধারণের বোধগম্য নয়। যোগশাস্ত্রের বিষয় এটি। সেখানে আছে যে, একটি বিশেষ চক্রে যদি মন ওঠে তবে সে সবিশেষের সীমা অতিক্রম করে নির্বিশেষের দিকে ধাবিত হয়। এখানে জ্ঞান-অসির অর্থ বিচার। ঠাকুর প্রথমে সবিশেষের যে আনন্দ তা ত্যাগ করতে চাইছিলেন না। কিন্তু বিচার করে তিনি মনকে বোঝালেন— রূপের দর্শনে যত আনন্দই থাক সেই শেষ কথা নয়, তারও পরে আছে। ভগবানের সবিশেষ রূপ সেই পরম তত্ত্বে পৌঁছাবার প্রতিবন্ধক। তখন তিনি মা-র মূর্তি দ্বিখণ্ডিত করলেন মানে সগুণভাবের আস্বাদনজনিত আনন্দ ত্যাগ করলেন। স্বয়ং তোতাপুরীকে কিন্তু এই বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি কারণ তিনি প্রথম থেকেই নির্বিশেষ পথের পথিক। তাঁর সাধনা ভিন্ন পথের।

যিনি ভক্তিপথের পথিক তাঁকে এই বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হবে না, কারণ ভক্ত অনন্তকাল ধরে সবিশেষরূপেরই আস্বাদন করতে চান। ভক্তিশাস্ত্রমতে এতেই ভক্তের পরিতৃপ্তি— পরমা প্রাপ্তি। জ্ঞানীর মতো তিনি বৈচিত্র্যের অতীত অদ্বয়তত্ত্বে পৌঁছাতে চান না। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ইচ্ছায় রায় রামানন্দ যখন সাধ্যসাধন তত্ত্বের বর্ণনা করছিলেন তখন শান্ত দাস্য ও সখ্য—এই সাধ্যত্রয়ের কথা শুনে শ্রীচৈতন্য বললেন, 'এহোত্তম আগে কহ আর'। রামানন্দ তখন বাৎসল্যভাবের কথা বলায় শ্রীচৈতন্য বললেন,

'এহোত্তম আগে কহ আর'। তারপর যখন মধুরভাবের কথা এল তখন মহাপ্রভু বললেন, 'এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়'। অর্থাৎ এটিই ভাবসাধনের শেষ কথা, ভাবের পরাকাষ্ঠা মধুরভাবেই। মহাপ্রভু এর পরেও বলেছিলেন, 'কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়' এবং রামানন্দ রাধাপ্রেম, রাধা ও কৃষ্ণের স্বরূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে বলেছিলেন। তার পরেও মহাপ্রভু 'এই হয়, আগে কহ আর' বলায় রামানন্দ 'প্রেমবিলাসবিবর্ত' সম্বন্ধে একটি গান গাইলে মহাপ্রভু স্বহস্তে রামানন্দের মুখ বন্ধ করেন। গানটিতে আছে, 'ন সো রমণ ন হাম রমণী'। এইটিই হলো অদ্বৈতভাবের কথা, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় যেখানে 'প্রেম প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক'। বিরল কোন কোন সাধকের পক্ষে এই অদ্বৈত স্তরে ওঠা সম্ভব হলেও চৈতন্যদেবের কথাতেই বোঝা যায় যে, ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে মধুর ভাবই 'সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়'। তারপর আর বৈচিত্র্যপূর্ণ ভগবানের রসাস্বাদন হবে না। এর পরেও কি, তা যিনি জানতে চান তাঁকে এই ভাবের রাজ্য অতিক্রম করে যেতে হবে। আনন্দ যতই নিবিড় হোক এতে আটকে থাকলে চলবে না। আরও আগে যেতে হবে। অবশ্য কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে বলা কঠিন। সেখানেও ঠাকুর বলছেন, তাঁর ইতি করা যায় না, তিনি নির্বিশেষ আবার সবিশেষও। সুতরাং এ-সব হচ্ছে যার যার ভাবের কথা।

তবে আমাদের আলোচ্য মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে নির্বিশেষের সাধনার কথা। সবিশেষ ব্রহ্মে যত আনন্দই হোক না কেন তাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। ভগবানের যদি অনন্ত বৈচিত্র্য থাকে তবে অসীম তিনি কয়েকটি রূপেই সীমিত থাকবেন কেন? তাঁর নির্বিশেষ ভাবও তো থাকবে —এই হলো জ্ঞানীর যুক্তি। সেই নির্বিশেষকে জানবার জন্য যে বিশেষ সাধনা সেটি হচ্ছে— 'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ'।

'যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্
ওতং মনঃ সহপ্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥' (২।২।৫)

যস্মিন্ (যে অক্ষর পুরুষে) দ্যৌঃ (দ্যুলোক) পৃথিবী (পৃথিবী) অন্তরিক্ষম্ চ (ও অন্তরীক্ষ) চ (এবং) সর্বৈঃ (সকল) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত) মনঃ (অন্তঃকরণ) ওতম্ (সমর্পিত) তম্ (সেই) একম্ (অদ্বিতীয়) আত্মানম্ এব (আত্মাকেই) জানথ (অবগত

হও) অন্যাঃ (অপর [অপরা বিদ্যার বিষয় সম্বন্ধে]) বাচঃ (বাক্যসমূহ) বিমুঞ্চথ (পরিত্যাগ কর)— এষঃ (এই আত্মজ্ঞান) অমৃতস্য (মোক্ষপ্রাপ্তির) সেতুঃ (উপায়)।

যে অক্ষর পুরুষে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত প্রাণের সঙ্গে মনও সমর্পিত হয়ে রয়েছে, সেই সমস্তের আধারস্বরূপ সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে জান, আর অন্য সব বাক্য পরিত্যাগ কর। অমৃতত্ব লাভের এ-ই হলো উপায়।

যে আত্মাতে দ্যুলোক পৃথিবী অন্তরীক্ষ সব ওত হয়ে রয়েছে, মানে নিহিত হয়ে রয়েছে যেমন তীরটা লক্ষ্যে গেঁথে থাকে। সেগুলি কি যা নিহিত হয়ে রয়েছে? 'মনঃ সহপ্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ'— সমস্ত প্রাণসহিত মনও সেই আত্মাতে উপহিত হয়ে রয়েছে। বাহ্যজগৎ দ্যুলোক পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং অন্তর্জগৎ সমস্ত করণবর্গের সঙ্গে মন— সবই অক্ষরে আরোপিত হয়ে রয়েছে। হে শিষ্যগণ, 'তমেব একং জানথ আত্মানম্' —যিনি এই সমস্তের আধারস্বরূপ সেই এক আত্মাকে জান। 'অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ' —আর অন্য সব বাক্য অর্থাৎ অন্য সব চিন্তা পরিত্যাগ কর। অন্য চিন্তা মানে ব্রহ্মের উপর যে কল্পিত বস্তুসমূহ সেগুলির চিন্তা পরিত্যাগ কর, তাঁর উপরে অন্য কোন ধর্ম আরোপ করো না। 'অমৃতস্য এষ সেতুঃ' —অমৃতত্বলাভের এই হলো পথ। দুটি ভূখণ্ডকে যা সংযুক্ত করে তাকে সেতু বলে। যা আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিচ্ছে তাই সেতু। অমৃতত্বলাভের এইটি সেতু অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায়। আত্মাকে জানতে পারলেই তুমি অমৃতস্বরূপ অমরণধর্মী হতে পারবে। কারণ সেইটি যে তোমার প্রকৃত স্বরূপ তা তুমি জানতে পারবে। বাহ্যবস্তুরূপে নয়, বাহ্য এবং আন্তর সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্মকে জানতে হবে। সেভাবে জানলে তিনি আমারও অধিষ্ঠান, সুতরাং আমি তাঁর থেকে অভিন্ন হয়ে যাব। এটি অমৃতত্বলাভের পথ। ভিতরের উপাধিগুলি যদি দূর করে দেওয়া যায় তাহলে আমার এবং সর্ব উপাধিবর্জিত ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য রইল না। আর অমরণধর্মী হয়ে গেলাম মানে দেহ অমর হবে না কিন্তু দেহাদি যার উপর আরোপিত হচ্ছে সেই আরোপের অধিষ্ঠান বস্তুটিকে জানতে পারলে আরোপিত বস্তু মিথ্যা প্রমাণিত হবে। সুতরাং আমি জানব আমিও অপরিণামী, আমার মৃত্যু নেই। কারণ দেহের মৃত্যু আছে ইন্দ্রিয়াদির বিকৃতি আছে কিন্তু এগুলির অধিষ্ঠান যিনি তাঁর কোন বিকৃতি নেই। আমিও তিনি, অতএব আমারও অমরত্ব লাভ হবে।

অমরত্বটি এখানে কোন প্রাপ্তব্য বস্তু নয় কেবল জানতে পারব যে,

আমি স্বরূপত অমর। অর্জিত বস্তু নষ্ট হয়ে যায়। এখানে অমরত্ব অর্জিত নয়, আমার স্বরূপ। এই স্বরূপ-জ্ঞানের উপায় হচ্ছে উপাসনা—সকল চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে মনঃসংযোগ করে অবস্থান করা।

'অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ॥' (২।২।৬)

অরাঃ (চক্রশলাকা) রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিতে) ইব (যদ্রূপ সমর্পিত তদ্রূপ) নাড্যঃ (নাড়িসমূহ) যত্র (যে হৃদয়ে) সংহতাঃ (সম্প্রবিষ্ট) [সেখানে] সঃ এষঃ (উক্ত ইনি) বহুধা (নানারূপে) জায়মানঃ (ক্রোধহর্ষাদিরূপে প্রতীত হয়ে) অন্তঃ (অন্তর্ভাগে) চরতে (চরতি, সঞ্চরণ করেন, বর্তমান আছেন); আত্মানম্ (উক্ত আত্মাকে) ওম্ ইতি এবম্ (['ওঙ্কার আমি'] এইরূপ ওঙ্কার অবলম্বনপূর্বক যথোক্ত কল্পনাসহায়ে) ধ্যায়থ (চিন্তা কর), তমসঃ (অজ্ঞান-অন্ধকারের) পরস্তাৎ (অতীত) পারায় (পরপারে গমনের জন্য [পাঠান্তর— পরায়]) বঃ (তোমাদের) স্বস্তি (মঙ্গল হোক)।

রথচক্রের শলাকাগুলি যেমন চক্রের নাভিতে এসে মিলিত হয় তেমনি নাড়িগুলি হৃদয়ে মিলিত হয়। আত্মা সেই হৃদয়ের মধ্যে বিহার করেন এবং বহুরূপে তিনি উৎপন্ন হন। ওঁ-রূপে সেই আত্মাকে ধ্যান করবে। অন্ধকারের পারে যে পরম তত্ত্ব আছেন, তাঁর দিকে তোমাদের যাত্রার পথ শুভকর হোক।

রথচক্রের শলাকাগুলি যেমন চক্রের নাভিতে এসে মিলিত হয় সেরূপ যেখানে সমস্ত নাড়িগুলি নিহিত রয়েছে তা হলো হৃদয়। শাস্ত্রানুসারে সব নাড়িগুলিই হৃদয়দেশে মিলিত হয়। নাড়ি মানে শক্তিসঞ্চারের পথ। নাড়িগুলিকে অনেক সময় নার্ভ বলা হয়। তবে এই নার্ভ শব্দটি নাড়ির সঠিক প্রতিশব্দ অর্থে ব্যবহারযোগ্য কিনা সন্দেহ। নার্ভ দুরকম আছে। সেন্সরী বা সংজ্ঞাবহ আর মোটর বা অঙ্গসঞ্চালক-নার্ভ। মোটর-নার্ভগুলি মস্তিষ্ক থেকে শরীরের বিভিন্ন বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রসারিত, এদের দ্বারা আমাদের দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির আকুঞ্চন প্রসারণাদি কার্য সম্পাদিত হয়। সেন্সরী-নার্ভ হচ্ছে অনুভবের নার্ভ অর্থাৎ যা দিয়ে শব্দস্পর্শাদি অনুভূত হয়। সেন্সরী-নার্ভ অনুভবগুলিকে হৃদয়ে প্রেরণ করে। হৃদয়ের উল্লেখ করার কারণ হৃদয়ে শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়, আবার হৃদয় থেকে বিকীর্ণ হয়। অনুভব যেখানে প্রেরিত হয় সেটাই হৃদয়।

তারপর বলছেন 'স এষোঽন্তশ্চরতে' —আত্মা সেই হৃদয়ের মধ্যে একক বিহার করেন; 'বহুধা জায়মানঃ' —বহুরূপে তিনি উৎপন্ন হন অর্থাৎ

হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে তাঁর পরিণামপ্রাপ্তি, পরিবর্তন ঘটে। সুখের অনুভব হলে মনে হয় আত্মা সুখী আবার দুঃখের অনুভব হলে মনে হয় দুঃখী, ক্রোধ হলে মনে হয় ক্রোধী আত্মা। 'ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং' —'ওঁ'-রূপে সেই আত্মাকে ধ্যান চিন্তা উপাসনা করবে। আত্মার বাচক শব্দ 'ওঁ', এর তাৎপর্য অ, উ, ম— এই তিনটি বর্ণ ব্রহ্মের তিনটি কার্যের দ্যোতক। অ— সৃষ্টি, উ— স্থিতি, ম— সংহার। এই তিনটি ক্রিয়ার জন্য তাঁর বাচক শব্দ 'ওঁ'-রূপে চিন্তা করলে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ঐক্যানুভব হয়। আত্মার যে স্বরূপ— 'বহুধা জায়মানঃ'— বহুরূপে জাত অর্থাৎ যা বিবিধ জীবরূপে তা অনুভূত হয়।

'স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ'— শিষ্যেরা অজ্ঞান তাই ঋষি তাদের বলছেন, অন্ধকারের, অজ্ঞানের পারে যে পরমতত্ত্ব আছেন তোমাদের তাঁর দিকে যাত্রার পথ শুভকর হোক, সাধনা সম্পূর্ণ হোক, সফল হোক, তোমরা সেই ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হও।

এরপর আত্মস্বরূপের বর্ণনা—

'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥' (২।২।৭)

যঃ (যিনি, যে অক্ষর পুরুষ) সর্বজ্ঞঃ (সাধারণরূপে সকল বিষয় জানেন) সর্বদিৎ (বিশেষরূপে সকল বিষয় জানেন) ভুবি (জগতে) যস্য (যাঁর) এষঃ (এই প্রসিদ্ধ) মহিমা (বিভূতি), এষঃ (এই) আত্মা হি (আত্মাই) দিব্যে (জ্যোতির্ময়), ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মের অভিব্যক্তিস্থল হৃদয়পদ্মস্থ) ব্যোম্নি (আকাশে) [বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধ হয়ে] প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিত আছেন)।

যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিদ্, যাঁর মহিমা ভুবনে প্রসিদ্ধ সেই আত্মাই ব্রহ্মের অভিব্যক্তিস্থল হৃদয়পদ্মে (ব্রহ্মপুরে) জ্যোতির্ময় আকাশে প্রতিষ্ঠিত।

সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্ একই কথা। 'জ্ঞ' এবং 'বিদ্' দুয়েরই মানে হলো জানা। কিন্তু সমার্থক শব্দ দুটি ব্যবহারের তাৎপর্য হলো যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে সামান্যরূপেও জানেন, বিশেষরূপেও জানেন। অর্থাৎ যিনি সাধারণভাবে সব কিছুকে ব্রহ্ম বলে জানেন আবার বিশেষভাবে প্রত্যেকটি বস্তুকে পৃথক পৃথকভাবে ব্রহ্মরূপে জানেন। ব্রহ্মই সবকিছুকে প্রকাশ করছেন, তিনি জগদ্ভাসক।

তারপরে ব্রহ্মের মহিমা— যাঁর এই মহিমা, ব্যাপকতা, বিভূতি, যাঁর শাসনে বিশ্ব চলছে তাঁর এই মহিমা। বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে—'এতস্য

বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত' (৩।৮।৯) —যাঁর শাসনে দ্যুলোক ভূলোক যথাস্থানে ধৃত হয়ে অবস্থান করছে, যাঁর শাসনে 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত' (৩।৮।৯) —সূর্য চন্দ্র যথাস্থানে বিধৃত রয়েছে, যাঁর শাসনে 'প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে' (৩।৮।৯) —নদীগুলি যার যেদিকে গতি সেদিকে চলেছে —তাঁর এত মহিমা। সুতরাং যাকে আমরা জড় বলি তার চলার নিয়মকে প্রাকৃতিক নিয়ম বললে তো ব্যাখ্যা হলো না, নদী কেন চলে তার উত্তর হলো না। বিজ্ঞান কোন্ বস্তু কি করে তার বর্ণনা করে, কেন করে এ প্রশ্ন করে না। নদী কেমন করে চলে তা বলে, কেন চলে তা বলে না। হয়তো বলে মাধ্যাকর্ষণে চলে। মাধ্যাকর্ষণে প্রতিটি ভারযুক্ত বস্তু অনুরূপ অপর বস্তুকে আকর্ষণ করে কিন্তু কেন করে তা বলে না, বলে এটাই তার স্বভাব। কিন্তু দার্শনিক প্রশ্ন করেন কেন করে? 'কেন' এ-প্রশ্ন দর্শনের, বিজ্ঞানের নয়। সুতরাং যাঁর শাসনে জগৎ যথাযথ নিয়মে চলছে, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারছে না, সেই নিয়ন্তা সেই প্রকাশক ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম যেখানে অবস্থান করেন তাকে ব্রহ্মপুর বলেছেন অর্থাৎ হৃদয়। 'ব্যোম্নি', অর্থাৎ সেই হৃদয়রূপ আকাশেই তিনি অবস্থান করেন। অবস্থান তো তিনি সর্বত্র করেন তবে হৃদয়ে কেন? হৃদয় দিয়ে সাধক ব্রহ্মকে অনুভব করেন— 'হৃদয়েনৈব বিজানাতি' —তাই হৃদয়কে ব্রহ্মপুর বলেছেন।

'মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।।' (২।২।৭)

মনোময়ঃ (মন-উপাধিক বলে মনোবৃত্তিদ্বারা প্রকাশিত) প্রাণ শরীর নেতা (প্রাণ ও সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল শরীরান্তরে নিয়ে যাবার কর্তা) হৃদয়ম্ (বুদ্ধিকে) সন্নিধায় ([হৃদয়পদ্মাকাশে] স্থাপনপূর্বক) অন্নে (অন্নপুষ্ট শরীরে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিত আছেন)। আনন্দরূপম্ (সর্বদুঃখাতীত) অমৃতম্ (অমৃতস্বরূপ) যৎ (যে আত্মতত্ত্ব) বিভাতি (বিশেষরূপে [আপনাতেই] প্রকাশ পান) তৎ (সেই আত্মতত্ত্বকে) ধীরাঃ (বিবেকীরা) বিজ্ঞানেন (শাস্ত্রাচার্যের উপদেশজনিত বিশিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা) পরিপশ্যন্তি (পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন)।

মন-অভিমানী হয়ে তিনি প্রাণ ও শরীরের নেতা (পরিচালক) এবং অন্নের দ্বারা পুষ্ট শরীরে তাঁর অবস্থিতি হৃদয়ে অনুভূত হচ্ছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা আত্মজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে দেখেন— তিনি দুঃখরহিত ও মৃত্যুরহিত হয়ে বিভাসিত হন।

মনের সঙ্গে অভিমানী হয়ে তিনি যেন মনরূপে আছেন, মনে অবস্থিত বলে তিনি মনোময়। মনে অবস্থিত থেকে তিনি প্রাণ ও শরীরকে চালাচ্ছেন, তাই প্রাণ ও শরীরের তিনি নেতা। 'প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে'— অন্নের বিকার যে দেহ সেই দেহে তিনি প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তিনি 'হৃদয়ং সন্নিধায়' —হৃদয়ে অবস্থান করে অনুভূত হচ্ছেন। 'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ' —আত্মজ্ঞানের দ্বারা 'ধীরাঃ' বা জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকে দেখেন যিনি 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'। আনন্দরূপ বলতে যেখানে দুঃখ নেই, অমৃত বলতে মৃত্যু নেই। আত্মা 'বিভাতি' বিশেষরূপে প্রকাশিত আছেন। সুতরাং আত্মাকে ভাবতে হবে হৃদয়ে, হৃদয়ই ভাবনার মূল কেন্দ্র। ধ্যান ও উপাসনার দ্বারা তাঁকে জানতে হবে। শুধু হৃদয়ে অবস্থিতরূপে উপলব্ধি নয়, চতুর্দিকে সেই দুঃখরহিত মৃত্যুরহিত ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করতে হবে। জীব যখন নিজের ভিতর এবং অন্য সর্বত্র আত্মাকে দেখেন তখন আর দুঃখ থাকে না। শরীরের রোগব্যাধি, মনের সুখদুঃখ, আত্মাকে স্পর্শ করে না, জীব বিচলিত হয় না।

সেই বিক্রিয়ারহিত অবিনাশী আত্মাকে জানলে ব্রহ্মস্বরূপতার উপলব্ধি হয়। 'তদ্বিজ্ঞানেন'— আত্মজ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি হয়। সে জ্ঞানের উৎপত্তি কোথায়? মোহবুদ্ধিজাত জ্ঞান নয়, আচার্যলব্ধ, গুরুর উপদেশ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। সে জ্ঞানকে অবলম্বন করে ধীর, জ্ঞানী ব্যক্তিরা পূর্ণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন, সর্বদুঃখ থেকে উদ্ধার পান। সেই আত্মাই বিশেষরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন, তিনিই আবার আত্মস্বরূপ। অতএব ব্রহ্মকে যদি আমার থেকে ভিন্নরূপে দেখি তবে ব্রহ্মের ধর্ম আমাতে বর্তায় না। কিন্তু ব্রহ্মকে আত্মরূপে দেখলে ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ করা যায়।

এবার আত্মজ্ঞানের পরিণাম বলছেন—

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥' (২।২।৮)

পর-অবরে (কারণরূপে শ্রেষ্ঠ ও কার্যরূপে নিকৃষ্ট) তস্মিন্ (সেই ব্রহ্ম) দৃষ্টে ([আত্মরূপে] দৃষ্ট হলে) অস্য (ঐ দ্রষ্টার) হৃদয়গ্রন্থিঃ (হৃদয়ের গ্রন্থিঃ, বুদ্ধিতে আশ্রিত কামনা) ভিদ্যতে (বিনাশ প্রাপ্ত হয়), সর্ব সংশয়াঃ (সকল সংশয়) ছিদ্যন্তে (ছিন্ন হয়) কর্মাণি চ (এবং কর্মফলসমূহ) ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয়প্রাপ্ত হয়)।

সূক্ষ্ম এবং স্থূল, কার্য ও কারণরূপটি পরাবর ব্রহ্মকে অনুভব করলে অনুভবকর্তার হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম ক্ষয় হয়।

ব্রহ্ম যিনি সূক্ষ্ম এবং স্থূল, কার্য এবং কারণ সেই পরাবর ব্রহ্মকে দেখলে, অনুভব করলে হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় এবং অনুভবকর্তার কর্ম ক্ষয় হয়। হৃদয়ের গ্রন্থি —যাকে গাঁট বলি সেগুলি হচ্ছে বাসনা। ব্রহ্মজ্ঞানের পরিণামে সব বাসনা ছিন্ন হয়ে যায়। 'যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥' (গীতা, ৭।২) —যাঁকে জানলে আর কিছু জানবার বাকি থাকে না। 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' (গীতা, ৬।২২) —যাঁকে লাভ করলে অন্য কোন প্রাপ্তিকে অধিক আনন্দদায়ক মনে হয় না। পরিপূর্ণের আর কি বাসনা— 'আপ্তকামস্য কা স্পৃহা'? বাসনা মানুষকে দেহের সঙ্গে বদ্ধ করে রাখে, জন্ম-মৃত্যুর অধীন করে। বাসনা দূর হলে আর বন্ধন থাকে না এবং 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি' —এরূপ ব্রহ্মজ্ঞের সব কর্ম ক্ষয় হয়ে যায় কখন? না, 'তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' —সেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে জানলে।

এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেছেন যে, একমাত্র প্রারব্ধ কর্ম ছাড়া আর সব কর্ম ক্ষয় হয়ে যায়। কারণ প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হয়ে গেলে জ্ঞানী পুরুষের আর দেহ থাকে না, প্রারব্ধ কর্মই দেহের কারণ। কিন্তু যদি জানার সঙ্গে সঙ্গে দেহ লয় পায় উপদেশ দেবে কে? আচার্য কে হবে? তাই পুরো লয় পায় না। একটু 'আমি' থেকে যায়, ঠাকুর যাকে বলতেন 'বিদ্যার আমি'। এই 'বিদ্যার আমি'টুকু না থাকলে আর উপদেশ দেবার উপায় থাকত না।

তিন প্রকারের কর্ম আছে— প্রারব্ধ, ক্রিয়মান আর সঞ্চিত। ক্রিয়মান কর্ম হচ্ছে যা বর্তমানে করা হচ্ছে কিন্তু এখনো ফল দিতে শুরু করেনি। এর কোনটার ফল এজন্মেই ভোগ করতে হবে, কোনটার পরজন্মে। প্রারব্ধ কর্ম অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে ফল দিতে আরম্ভ করেছে যে কর্ম। এ-কর্ম পূর্ব জন্মে করা হয়েছে এবং তার ফলভোগের জন্য এ-জন্মে দেহধারণ, প্রারব্ধ কর্ম দেহের আরম্ভক কর্ম। আত্মজ্ঞান লাভ হলে ক্রিয়মান কর্ম লোপ পায় অর্থাৎ বর্তমান কর্ম আর ফল দিতে পারে না কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম লোপ পায় না। কারণ এ-কর্ম লোপ পেলে দেহ থাকে না। সঞ্চিত কর্ম হচ্ছে সেই কর্ম যা এখনো ফল দিতে আরম্ভ করেনি, পরে দেবে। আত্মজ্ঞানের ফলে এই কর্মও লোপ পায় সুতরাং বাকি থাকে কেবল প্রারব্ধ, যা ভোগ করে ক্ষয় করতে হয়।

একটা উপমা দেওয়া হয়। ব্যাধ মৃগয়া করছে, সে একটি তীর ছুঁড়বে বলে ধনুকে লাগিয়েছে এখনো ছোঁড়েনি। পরে ছুঁড়বে বলে পিঠের তূণে আরও তীর আছে এবং একটা তীর সে আগেই ছুঁড়ে দিয়েছে। এখন, হঠাৎ তার বৈরাগ্য এল, সে পিঠের তূণ থেকে তীরগুলো ফেলে দিল হাতের তীরটিও নামিয়ে রাখল কিন্তু যে তীরটি ছোঁড়া হয়ে গিয়েছে সেটিকে কি করবে? সেটিকে ফেরাবার উপায় নেই, সেটি ফল দিতে আরম্ভ করেছে। সেইরকম তার হাতের তীরটি ক্রিয়মান কর্ম, পিঠেরগুলো সঞ্চিত আর ছোঁড়া তীরটি প্রারব্ধ কর্ম। ক্রিময়ান ও সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় হয়ে যায়, প্রারব্ধ কর্মের হয় না। যতই বৈরাগ্য হোক একবার ছোঁড়া তীর, আর ফেরাতে পারে না।

গীতা ভাষ্যেও আচার্য শঙ্কর এইরকম ব্যাখ্যা করেছেন। গীতায় আছে—'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥' (৪।৩৭) —জ্ঞানাগ্নি সর্ব কর্মকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে অর্থাৎ তারা আর ফল প্রসব করবে না। এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে 'সর্বকর্মাণি'। 'সর্বকর্মাণি' বললে তো আর কোন কর্মকে বাদ দেওয়া যায় যা। তাই শঙ্কর বলছেন, এখানে 'সর্ব' শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত করা হয়েছে অর্থাৎ প্রারব্ধকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রারব্ধ কর্ম না থাকলে সেই ব্যাক্তিটিই থাকে না, ব্যক্তি প্রারব্ধের ফলস্বরূপ। এখানে বেদান্তবাদীদের মধ্যে ভিন্ন মত, ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। একটি প্রধান সিদ্ধান্ত, জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিদূরিত হয়। যেমন আলোতে অন্ধকার চলে যায় সেইরকম বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা ধ্বংস হয়। অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য অর্থাৎ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার স্থূলদেহ জগৎ সব লয় পেলে ব্যবহার সম্ভব হবে না। যদি বলা যায় ব্যবহার না হলে না-ই হলো; তখন জ্ঞান দ্বারা যে অজ্ঞান দূর হয় তার সাক্ষী দেবে কে? আমরা কোথায় দেখাব যে, জ্ঞানের ফল আছে? কে বলবে যে, আমি দেখেছি আমি জানি আমি অনুভব করেছি? সুতরাং শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকবে। অনুমানকে অনুভব দ্বারা প্রমাণ করতে না পারলে শাস্ত্র-বিষয়ে সন্দেহ থাকে। তাই বলছেন, ব্যবহার রাখতে হবে, খবর দিতে হবে। ঠাকুর বলেছেন, শঙ্কর বিদ্যার আমি রেখেছিলেন। অতএব জ্ঞানলাভের পরেও বিদ্যার আমি রাখা যায়। বিদ্যার আমি মানে অহঙ্কার প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছে, একটুখানি আছে তার দ্বারা জগৎ-কল্যাণ করা হয়।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য মত বলেন, বিদ্যার আমি বলি বা অন্য যে ভাষাতেই বলি তা অজ্ঞানই। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই-ই অজ্ঞান, অজ্ঞান ছাড়া কর্ম হয় না। যদি জ্ঞান হলেও অজ্ঞান থাকে তাহলে অজ্ঞান তো জ্ঞানবিরোধী হলো না। আলো জ্বালবার পরেও যদি একটুখানি অন্ধকার থাকে, আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি থাকে তবে তো অন্ধকার আলোর বিরোধী হলো না। আর অজ্ঞান যদি জ্ঞানবিরোধী না হয় তাহলে অজ্ঞান একটু থাকলেও যা বেশি থাকলেও তাই। কথা হচ্ছে, হয় অজ্ঞান থাকবে, নয় থাকবে না। যদি বলা হয় থাকবে তবে সেই অবিদ্যাটুকু কেমন করে দূর করব? জ্ঞান দ্বারা হবে না কারণ জ্ঞান আগেই হয়েছে, তাতে অজ্ঞান যায়নি। যাঁরা সেই লেশমাত্র অবিদ্যার অস্তিত্ব মানেন তাঁরা বলেন ওটুকু দূর করবার জন্য সাধনা করতে হয় না, ও আপনিই চলে যায়। ঐ অবিদ্যাটুকু নির্মলী ফলবৎ, অবিদ্যা দূর করে নিজেই লোপ পেয়ে যায়। এসব দৃষ্টান্ত ঠিক ঠিক খাটে না, বোঝাবার জন্য বলা হয়। কারণ কোন কিছুই নিজেই নিজের বিনাশ করতে পারে না, দর্শনের দিক দিয়ে দোষ হয়। তাই ঐ দোষটুকু দূর করবার জন্য বলা হয় জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে নাশ্য-নাশক সম্পর্ক বলা হবে না। বলা হবে, জ্ঞান হলে অজ্ঞান থাকে না। খুব যুক্তিযুক্ত বা হৃদয়গ্রাহী কথা অবশ্য হলো না। ন্যায়ের ভাষায় প্রতিবাদ করা গেল এই পর্যন্ত। ঠাকুর যে নুনের পুতুলের গল্প বলেছেন সাগরের খবর আনতে গিয়ে গলে গেল ঐরকম। যদি ব্রহ্মস্বরূপই হয়ে গেল তবে আর খবর আনবে কে? সে তো আর থাকলই না। আসলে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ব্যাপারটাকে আর একটু ভাল করে বোঝা যাক। প্রশ্ন হলো, যদি ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভই হলো তবে ব্যবহার কি করে হবে? উত্তর হচ্ছে, এই প্রশ্নটা নিয়ে অত ভাবনা-চিন্তা কেন? কথা হলো জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যবহার করেন কি না। যদি প্রত্যক্ষ দেখা যায় ব্যবহার করছেন তবে আর প্রশ্নটা ওঠে কোথা থেকে? যেটা দৃষ্ট, দেখা যাচ্ছে, তার সম্পর্কে কোন সংশয় থাকতে পারে না।

তোমাদের সিদ্ধান্ত তোমরা যে ভাষায় ইচ্ছা বল, প্রত্যক্ষই বলবান প্রমাণ। অনুমান দ্বারা প্রত্যক্ষকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা যায় না, কারণ অনুমান দুর্বল প্রমাণ। তাই প্রত্যক্ষ দিয়ে অনুমানকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা গেলেও

অনুমান দিয়ে প্রত্যক্ষকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা যায় না— 'দৃষ্টে ন অনুপন্নং নাম' (শঙ্কর)। তোমার হিসাব তুমি যেমন করে পার মেলাও, আমি প্রত্যক্ষ দেখছি জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যবহার করেন অতএব করেন কি না এ প্রশ্ন উঠতে পারে না। ঠাকুর বলছেন, দেখছি তিনি সব হয়েছেন। প্রশ্ন হলো, যিনি এক তিনি বহু হবেন কি করে? বৈচিত্র্যের কোন কারণ তো নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে তিনি সব হয়েছেন। তাই 'দেখছি' কথাটা বড় প্রবল কথা, এর চেয়ে বড় প্রমাণ নেই।

যদি কেউ বলে পাগলে তো কত কি বলে তার কথাও কি প্রমাণ বলে মেনে নেব? না, কারণ যুক্তি আছে। যার অশুদ্ধ মন তার কথা মানব না। মন যে অশুদ্ধ তার প্রমাণ কি? প্রমাণ মনকে বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যায়। সে রাগদ্বেষাদিযুক্ত সুতরাং তার দৃষ্টি মলিন, তা দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞের শুদ্ধ দৃষ্টিকে ব্যাহত করা চলে না।

সুতরাং জ্ঞানী পুরুষ শুদ্ধ দৃষ্টিতে যা দেখছেন তা মেনে নাও। প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে জ্ঞানলাভের পর ব্যবহার সম্ভব, সুতরাং জ্ঞানীর ব্যবহারকে অসঙ্গত বলা চলে না, সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্নই ওঠে না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে— তা হলে সিদ্ধান্ত কেমন করে মেলাব? শঙ্কর বলছেন, সিদ্ধান্তকে নির্দোষ করতে কি ভাষা ব্যবহার করবে সে তোমরা বোঝ কিন্তু প্রত্যক্ষের চেয়ে বড় প্রমাণ নেই। শঙ্কর এ-কথাটি খুব জোর দিয়ে বলেছেন।

যাঁরা সত্যদ্রষ্টা ঋষি তাঁরা বলছেন, আমরা দেখেছি। উপনিষদে ন্যায়ের কচ্‌কচি নেই। সত্যকে অনুভব করে দ্রষ্টা ঋষি তাঁর অনুভব বলে গিয়েছেন। সত্যদ্রষ্টা তাঁর অনুভূতি বলে যান, সমস্ত জগৎ তা মাথা পেতে নেয়। তিনি তাঁর ভাষার দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা তাকে রূপ দেবার, সমর্থন করার চেষ্টা করেন। ঋষি তাঁর অনুভব বলে যান, কে সমর্থন করল বা না করল তার অপেক্ষা করেন না। ব্যাখ্যাকারেরা অনুমানবলে সে অনুভবকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, যুক্তিকৌশল প্রয়োগ করেন। কিন্তু সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও নিয়ে চিন্তা করেন না। উপনিষদের ভাষা ঋষির ভাষা। ঠাকুরও যদি কোথাও যুক্তির অবতারণা করেছেন তা কেবল সাধারণকে বোঝাবার জন্য।

ব্রহ্ম শব্দের অতীত। বেদও বলেছেন, ব্রহ্মানুভূতি ভাষার অতীত। তা হলেও তাঁকে যে ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে তা বুঝবার জন্যই শুদ্ধ

দৃষ্টির দরকার, না হলে সে ভাষা বোঝা যায় না। তাই বলা হয় 'স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত' (গীতা, ২।৫৪) —স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভাষায় কথা বলেন? সাধারণ মানুষের কথার সঙ্গে তাঁর ভাষার মিল থাকে না। তাই সাধারণ মানুষ বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝবার চেষ্টা করুক, তার জন্য তিনি ব্যস্ত নন। তিনি নিজের ভাবে নিজের উপলব্ধির কথা বলে গিয়েছেন। মানুষ যখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে তখন উপনিষদের ঋষি যেন হাসেন আর বলেন, যাঁকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তাঁকে এরা প্রকাশ করতে চাইছে। গার্গি যাজ্ঞবল্ক্যকে বারবার প্রশ্ন করছেন, যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে শেষকালে বললেন, 'অনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গি' (বৃ.উ., ৩।৬।১) —গার্গি, যে দেবতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা চলে না তুমি তাঁরই সম্বন্ধে প্রশ্ন করছ। তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যায় না, উত্তরও দেওয়া যায় না, তিনি শব্দের অতীত, যুক্তির অতীত। যুক্তির অবতারণা করা হয় সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য। শিবমহিম্নঃস্তোত্রে আছে—

'অতর্ক্যৈশ্বর্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ
কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ॥' (শ্লোক নং—৫)

—যে তুমি তর্কের অতীত সেই তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে হতধী অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছে, যারা মূঢ় তারা কুতর্কে লিপ্ত হয়। এই কুতর্ক তাদের বাচাল করে, তাদের অপচেষ্টায় জগৎ মোহগ্রস্ত হয়। অথচ তিনি তর্কের উপর আধারিত নন, তর্ক তাঁর উপর আধারিত। এটা বুঝি না বলে তর্ক করি আর তর্ক মানুষ ততক্ষণ করে যতক্ষণ তার মনে সংশয় থাকে। কিন্তু তাঁকে জানলে সব সংশয় দূর হয়— 'ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'। তাহলে আর তর্ক করব কি নিয়ে? ঠাকুর বলছেন, যিনি সব করতে পারেন তাঁকে নিয়ে কি তর্ক করব? দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, নারদকে জিজ্ঞাসা করা হলো —ভগবান কি করছেন? নারদ বললেন, ছুঁচের মধ্য দিয়ে হাতি গলাচ্ছেন। একজন বলল, তা কি করে হয়? তাহলে তুমি ভগবানের কাছেই যাওনি। আর একজন বলল, হাঁ, ভগবানের পক্ষে সবই সম্ভব। ভাব হচ্ছে এই যে, ভগবানকে নিয়ে তর্ক চলে না। যিনি শুদ্ধদৃষ্টি তিনি দেখেন ব্রহ্ম তর্কের অতীত। বেদে ঋষির বাণী সংগৃহীত —এখন তোমরা বুঝে নাও কে কিভাবে বুঝবে। যার যেমন বুদ্ধি সে তেমন বুঝবে। যার বুদ্ধি শুদ্ধ সে সংশয় করবে না, যার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন সে সংশয়

করবে। যে বস্তু নিঃসন্দিগ্ধ, ঋষির দৃষ্টিতে যিনি নিঃসংশয় তাঁর সম্বন্ধে আমাদের সবচেয়ে বেশি সংশয়।

আত্মার স্বরূপকে জানলে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়, সমস্ত কর্ম ক্ষয় হয়ে যায় —অষ্টম মন্ত্রে এই কথা বলে নবম মন্ত্রে সেই ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণনা করছেন—

'হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥' (২।২।৯)

হিরণ্ময়ে (জ্যোতির্ময় অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত) পরে (শ্রেষ্ঠ) কোশে (কোশে, কোশতুল্য হৃদয়পদ্ম মধ্যে) বিরজম্ (অবিদ্যাদি দোষ শূন্য) নিষ্কলম্ (নিরবয়ব) যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) [অবস্থিত], তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) শুভ্রম্ (শুদ্ধ) জ্যোতিষাম্ (তেজময় অগ্নি প্রভৃতির) জ্যোতিঃ (অবভাসক); আত্মবিদঃ (আত্মজ্ঞানীরা) তৎ (সেই ব্রহ্মকে) বিদুঃ (জানেন)।

আত্মজ্ঞানীরা জানেন যে, জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ কোশে রজোগুণশূন্য অংশরহিত নিরবয়ব ব্রহ্ম অবস্থিত, তিনি শুদ্ধ এবং তেজোময় পদার্থেরও প্রকাশক।

হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ময় যে কোশ বা আবরণ যা বস্তুকে ঢেকে রাখে সেই কোশে 'বিরজং' অর্থাৎ রজোগুণশূন্য এবং 'নিষ্কলং' —কলা বা অংশরহিত নিরবয়ব ব্রহ্ম অবস্থিত। তলোয়ার যেমন খাপের মধ্যে থাকে সেইরকম হৃদয়কোশে ব্রহ্ম বিরাজ করেন। এই হৃদয়কোশ ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান— তাই তা জ্যোতির্ময় অর্থাৎ প্রকাশমান এবং পরম বা শ্রেষ্ঠ।

এখানে ব্রহ্মের দুটি বিশেষণ পাচ্ছি। 'বিরজং' —মালিন্যরহিত এবং 'নিষ্কলং' —অবিভাজ্য, অখণ্ড। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে অপর দুটি বিশেষণ 'শুভ্রং' অর্থাৎ শুদ্ধ এবং 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' অর্থাৎ সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র অগ্নি বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রকাশধর্মী তেজোময় পদার্থসমূহেরও যিনি প্রকাশক। এ-কথা বলার তাৎপর্য এই যে, এক আত্মার প্রকাশের দ্বারা সমস্ত বস্তু প্রকাশ পাচ্ছে। সূর্য প্রভৃতির কোন বস্তুকে প্রকাশের সামর্থ্য কোথায়, যদি না সেই আত্মবস্তু তাদের প্রকাশ করে? আত্মজ্ঞেরা জানেন, আত্মবস্তুর স্বরূপ হলো বিরজঃ অর্থাৎ মালিন্যরহিত, নিরবয়ব, যাবতীয় জ্যোতির্ময় বস্তুরও প্রকাশক। এই 'জানা' বলতে কি বোঝায় তা বহুস্থানে বহুভাবে আলোচিত হয়েছে। ব্রহ্মকে জানার অর্থ তাঁকে বিষয়রূপে জানা নয়, জ্ঞানস্বরূপরূপে জানা। যাঁর প্রকাশ অন্য প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না, জ্ঞানী সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে জানেন

আত্মরূপে, সর্ববস্তুর প্রকাশক নিত্যসাক্ষীরূপে। ব্রহ্মকে জানার এটিই বিশেষত্ব। তাঁকে বিষয়রূপে জানা যায় না বলেই যিনি বলেন 'আমি জানি' তিনি জানেন না, কারণ চক্ষুরাদি যে সব যন্ত্র দিয়ে তাঁকে জানার চেষ্টা করব তিনিই তো তার অধিষ্ঠাতা— 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ' (কেন উপ., ১।২)। তাই ব্রহ্মকে বিষয়রূপে নয় বিষয়ের প্রকাশকরূপে জানা যায়। তাঁর প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ। তাঁর জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত বস্তুকে জানা যায়। এই কথা কেনোপনিষদেও আছে —'যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ' (২।৩) —ব্রহ্ম যার নিকট অবিদিত তারই নিকট বিদিত; যাঁর নিকট বিদিত তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নন, তাঁকে জানা মানে তাঁর বহু উপাধির একটি দুটিকে জানা। তাই শ্রুতি বলছেন— 'যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্' (কেন উপ., ২।১) —যদি মনে কর তুমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জেনেছ তাহলে ব্রহ্মের স্বরূপের অল্পমাত্রই জেনেছ। নিরূপাধিক ব্রহ্মকে কখনই সম্পূর্ণরূপে জানা যায় না। যিনি মনে করেন জেনেছেন তিনি জানেন না বা অতি অল্পই জানেন। কথাটা শুনতে হেঁয়ালীর মতো কিন্তু একমাত্র এই হেঁয়ালীর দ্বারাই তাঁর স্বরূপ জানানো সম্ভব। কারণ তিনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, তিনি কখনো জ্ঞেয় বা জ্ঞাত বস্তু হতে পারেন না। ব্রহ্ম সকল বস্তুকে প্রকাশ করেন কিন্তু তিনি নিজে স্বপ্রকাশ, অপর কারও দ্বারা প্রকাশিত হন না।

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।' (২।২।১০)

সূর্যঃ (সূর্য) তত্র (সেই ব্রহ্মে) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করে না), চন্দ্রতারকম্ (চন্দ্র ও তারকা) ন ([ব্রহ্মকে প্রকাশ করে] না), ইমাঃ (এই সকল) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুদ্‌বর্গও) ন ভান্তি (প্রকাশ করে না); অয়ম্ (এই) অগ্নিঃ (অগ্নি) কুতঃ (কিরূপে) [প্রকাশ করবে?]) সর্বম্ (সমস্ত জগৎ) তম্ এব ভান্তম্ অনুভাতি (তিনি দেদীপ্যমান বলেই তদনুযায়ী দীপ্তিমান হয়), ইদম্ (এই) সর্বম্ (সমুদয়) তস্য (তাঁর) ভাসা (দীপ্তিদ্বারা) বিভাতি (বিবিধরূপে প্রকাশশীল হয়)।

সেই ব্রহ্মকে সূর্য, চন্দ্র, তারকা বা বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ করে না— সুতরাং অতিসীমিত-প্রকাশ-শক্তি বিশিষ্ট অগ্নি কি করে তাঁকে প্রকাশ করবে? তিনি স্ব-প্রকাশ বলেই তাঁর দীপ্তিতে সমস্ত বস্তু প্রকাশিত।

সেই ব্রহ্মকে সূর্য চন্দ্র তারকা বা বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ করে না। সুতরাং যার প্রকাশশক্তি অতি সীমিত সেই অগ্নি আর কি করে তাঁকে প্রকাশ করবে? তিনি স্বপ্রকাশ বলেই তাঁর দীপ্তিতে সমস্ত বস্তু প্রকাশিত। এইজন্যই ব্রহ্মকে বলা হয়েছে নিত্য বিষয়ী— যিনি নিজে জ্ঞানের বিষয় নন অথচ সকল বিষয়ের প্রকাশক। এই স্বপ্রকাশ 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ'কে স্ব-স্বরূপে যাঁরা জানেন তাঁরাই আত্মবিৎ। স্বপ্রকাশ শব্দের অর্থ এই নয় যে, তিনি নিজেকে নিজে প্রকাশ করছেন, কারণ তাতে একই বস্তুতে কর্তা-কর্মের সহাবস্থানজনিত আপত্তি ওঠে। এর অর্থ তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। বস্তুকে প্রকাশ করে কে? বুদ্ধি। বুদ্ধিকে প্রকাশ করে আত্মা। আত্মার প্রকাশক কে? এই যুক্তি পরম্পরা অনুসারে শেষপর্যন্ত আমরা যে আত্মাতে উপনীত হই তাঁকে কেউ প্রকাশ করে না। তিনিই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম।

পরবর্তী শ্লোকে ব্রহ্মের সর্বব্যাপকতার কথা হচ্ছে—

'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।।' (২।২।১১)

পুরস্তাৎ (পুরোভাগে স্থিত) ইদম্ (ইহা; এই যা কিছু প্রতিভাত হচ্ছে তা) অমৃতম্ ব্রহ্ম এব (অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই), পশ্চাৎ (পশ্চাদ্‌ভাগে), দক্ষিণতঃ (দক্ষিণ দিকে), উত্তরেণ চ (এবং উত্তর দিকেও) ব্রহ্ম অধঃ (নিম্নদিকে) ঊর্ধ্বম্ চ (এবং ঊর্ধ্ব দিকেও) ব্রহ্ম প্রসৃতম্ (ব্যাপ্ত আছেন); ইদম্ (এই) বিশ্বম্ (জগৎ) ইদম্ বরিষ্ঠম্ (এই প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠতম) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই)।

পুরোভাগে অবস্থিত এই সমস্তই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, উপরে, নিচে— সমস্তই ব্রহ্মসত্তার দ্বারা সত্তাবান। ব্রহ্ম জগতের সর্বত্র প্রসৃত, ব্যাপ্ত।

'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং' —অমৃতস্বরূপ এই ব্রহ্মই 'ইদম্' —অর্থাৎ যা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর সেই সমস্ততেই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। শুধু পুরোবর্তী বস্তু নয়, সম্মুখে পশ্চাতে উত্তরে দক্ষিণে উপরে নিচে সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মসত্তার দ্বারা সত্তাবান। বিভিন্ন দিকের উল্লেখের দ্বারা আমাদের দৃষ্ট বা অনুভূত যাবতীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হলো, তাই বলা হলো 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্'। এই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান, ব্রহ্ম জগতের সর্বত্র প্রসৃত, ব্যাপ্ত। ব্রহ্ম তাই বরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম। তিনি ছাড়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুরও অস্তিত্ব নেই। তাই শ্রুতি বলছেন— 'নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন' (বৃ. উপ., ৪।৪।১৯) —এই জগতে তিনি ছাড়া নানা বস্তু কিছু নেই। এ-কথার তাৎপর্য এই নয় যে,

সমস্ত বস্তু ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত, এর প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মই জগৎ। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অপর কোন বস্তুর সত্তাই নেই। জগতে যত বৈচিত্র্য দেখি বা অনুভব করি সে সমস্তই অজ্ঞান প্রসূত। সুতরাং জগৎ বলে যা জানি তা স্বরূপত ব্রহ্মই। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়— 'যোঽয়ং স্থাণুঃ পুমাণেষঃ' —এই যে সামনে স্থাণু অপরিবর্তনশীল অচঞ্চল কাষ্ঠবিশেষ মনে হচ্ছে বাস্তবিক এ তা নয়, এ পুরুষবিশেষ। পুরুষের জ্ঞান হলে স্থাণুর কোন সত্তা থাকে না। রজ্জু-সর্পের ক্ষেত্রে রজ্জুর জ্ঞান হলে সর্পের সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। জগৎও তেমনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মজ্ঞান হলে জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। 'পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম' ইত্যাদির দ্বারা এই কথাই বোঝানো হয়েছে যে, ব্রহ্ম যে চারিদিকে ছড়িয়ে আছেন তা নয়, সমস্ত বস্তুর প্রকাশের মূলেই তিনি আছেন। মেরী হেলকে স্বামীজী এই সত্যই ভাষান্তরে বলেছিলেন, All are God একথা ঠিক নয়, God is and all are not— এই হলো সত্য। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নেই। যদি তাঁকে বাদ দিয়ে জগৎকে বুঝতে চাও কিছুই পাবে না, সব কিছুরই মূল তত্ত্ব ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত— এই হলো শ্লোকটির তাৎপর্য। অনুভবের বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে সব কিছুরই মূল তত্ত্ব ব্রহ্মে পর্যবসিত হচ্ছে, এই জ্ঞানই হবে ব্রহ্মকে জানা। বৈচিত্র্য যতই দেখি না কেন ব্রহ্ম সকল বিষয়ের অতীত— 'বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং'।

কিন্তু এইভাবে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বৈচিত্র্যকে কি অস্বীকার করা চলে? যদিও কথামৃতে ঠাকুর মোমের গাছ মোমের ফুল মোমের পাতার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন ব্রহ্মই সমস্ত হয়েছেন, তবু এ যেন মূল তত্ত্ব থেকে কয়েক ধাপ নেমে এসে বলা। তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখলে দেখব তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। যে কোন বস্তু বা অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করে করে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সবই সেই অদ্বয় ব্রহ্মসত্তাতে পর্যবসিত হয়েছে। পরিণামী বস্তুকে পরিণামী বলে বোঝা যায় একটি অপরিণামী বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে। সমস্ত জগৎকে এই একটি গুণের দ্বারা পরিচয় করানো যায় যে, তা হলো পরিণামী। তাহলে সেই প্রশ্ন ফিরে আসছে, কোন্ বস্তুর সঙ্গে তুলনায় জগৎকে পরিণামী বলব? ব্রহ্ম এক্ষেত্রে অপরিণামী, জগতের যত বৈচিত্র্য সমস্তই তাঁর পরিণাম। এটাই বেদান্তের মূল রহস্য। এইভাবে তাঁর সাধারণ ও বিশেষ সত্তা 'অনুভাতি' ও 'বিভাতি' —এক ও বহুরূপে প্রকাশিত। যত বৈচিত্র্য সব আমাদের

দৃষ্টিতে ও অনুভবে, ব্রহ্মে নয়। সেই বর্ণনাতীতকে বর্ণনা করার জন্যই বলা হয় সর্ববস্তুতে তিনি আছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর অতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্তাই নেই। নুনে জরে আছে— এ-কথার অর্থ কোন এক বস্তু আছে এবং তাতে নুন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে। ব্রহ্ম জগতে ওতপ্রোতভাবে আছেন, এ-কথা শ্রুতিতে বলা হলেও এটি বর্ণনার জন্যই বলা, মূল তত্ত্ব থেকে নেমে এসে বলা। তা নাহলে তাঁকে সীমিত করে ফেলা হয়। রজ্জু-সর্পের ক্ষেত্রে রজ্জু সাপকে জড়িয়ে থাকে না, সাপ তো নেই-ই তার মাথা লেজ সব দড়ি মাত্র। এই অর্থে 'পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাৎব্রহ্ম' —ব্রহ্ম উপরে নিচে উত্তরে দক্ষিণে। যেমন রজ্জুর প্রকাশ দ্বারা সাপ প্রকাশিত তেমনই ব্রহ্মের সত্তায় জগৎ প্রকাশিত। এইটিই হলো অদ্বৈত বেদান্তের মত। মোমের ফুল মোমের ফল হলো বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা। কিন্তু মতবাদের বিভিন্নতা থাকলেও মূলতত্ত্ব তো দুরকম হতে পারে না, তবু যে দুরকম উদাহরণই আমরা দেখি তার প্রধান কারণ পরম তত্ত্বকে কখনো মুখের কথায় স্পষ্ট করে বোঝানো যায় না। এটি ব্যক্তির আপন অনুভবের বিষয়। ঘট-পটকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় করা যায় কিন্তু আত্মা তো জ্ঞানের বিষয় নয় তাই জাগতিক দৃষ্টান্ত দিয়ে আত্মতত্ত্বের সম্যক জ্ঞান হতে পারে না এবং পারে না বলেই শ্রুতিতে বহুস্থানে তাঁকে নেতিবাচক বিশেষণের দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি 'সচ্চিদানন্দ' পদটিও সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মবাচক নয়। সেখানে অর্থ করা হয় সৎ মানে অসৎ নয়, চিৎ মানে অচিৎ বা জড় নয়, আনন্দের অর্থ অনানন্দ বা দুঃখ নয়। ব্রহ্মকে মুখে প্রকাশ করা যায় না বলে নানা উপমার সাহায্যে তাঁকে বোঝাতে হয়। সেইজন্যই ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন, অগাধ জলরাশি তারই মধ্যে কোথাও বরফের স্তূপ দেখা যায়। জমা বরফের চারপাশেই কিন্তু জল। এই জল আর বরফের মধ্যে কোন বস্তুগত পার্থক্য নেই, আছে রূপের বৈচিত্র্য মাত্র। ব্রহ্ম ও পরিদৃশ্যমান জগতেও তেমনি প্রকাশের বৈচিত্র্য —এইদিক দিয়েই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' —এই উক্তিটির সার্থকতা। পরিদৃশ্যমান বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সেই ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্মকে কোন বিশেষণের দ্বারা বোঝানো বা কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা সম্ভব নয় কারণ তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাই ব্রহ্মকে বোঝাবার জন্য অদ্বৈতবাদীরা বলেন, 'নেতি নেতি', 'অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্' (বৃ. উপ., ৩।৮।৮) —তিনি এটা নয় ওটা নয়, স্থূল নয় সূক্ষ্ম নয়, হ্রস্ব নয় দীর্ঘ নয় ইত্যাদি। এই ব্রহ্মবস্তু কিভাবে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে আছেন? তিনি না থাকলে তো কোন বস্তুর প্রতিষ্ঠাই নেই। যে

জাগতিক বৈচিত্র্য দর্শন করি সবই যদি তাঁর প্রকাশ হয় তাহলে তিনি সর্বব্যাপী হলেন— 'বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্'। এইভাবেই সমস্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের মধ্যে তিনি প্রসৃত, বরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম। এমনি করে ব্রহ্মকে আমরা গৌণভাবে জানছি। তিনি কি তা যখন মুখে বলা যায় না, তখন তিনি কি নয় সেই ব্যাতিরেকমুখেই আমাদের চিন্তাধারা যাচ্ছে। 'জানছি' এ-কথার অর্থও কোন কিছুর সাহায্যে জানা নয় —'প্রতিবোধবিদিতং' (কেন উপ., ২।৪) —বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের আত্মারূপে তিনি বিদিত হচ্ছেন। বুদ্ধিবৃত্তি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকাশ হচ্ছে, তাই তাঁকে জানছি। বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায় না কিন্তু প্রতিটি বৃত্তির ভিতর দিয়ে যিনি জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত রয়েছেন, বৃত্তির প্রকাশের ভিতর দিয়ে তাঁরই প্রকাশ— এই হলো বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই শ্লোকে এইভাবে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিতার উপসংহার করা হলো।

এ ছাড়া আর একটি দৃষ্টি আছে। সেটি উপাসনার দৃষ্টি। ব্রহ্মের প্রকাশ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড —এই দৃষ্টি গ্রহণ না করে যদি ব্রহ্ম সর্ববস্তুতে আছেন, এইরূপ ধারণা করি অর্থাৎ ব্রহ্মের অতিরিক্ত অপর বস্তুর সত্তা স্বীকার করে উপাসক যদি অগ্রসর হন, তাহলেও সর্বত্র সেই ব্রহ্মচিন্তা করতে করতে তাঁর দ্বৈতাসক্তি —দ্বৈত জগতের প্রতি মনের যে ঝোঁক তা ক্রমশ কমে যাবে। এই সত্য উপলব্ধ হবে যে, ব্রহ্মই জগতের একমাত্র অধিষ্ঠান, আশ্রয়।

যে অক্ষর পুরুষকে জানলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সংশয় দূর হয়, সংসারের মূল উৎপাটিত হয় তাঁকে কি উপায়ে জানা যায় দ্বিতীয় মুণ্ডকে তা আলোচনা করা হয়েছে। তারই আনুষঙ্গিক অন্যান্য সাধন প্রণালী বলা হচ্ছে তৃতীয় মুণ্ডকে।

ব্রহ্মবস্তুকে জানা এত দুরূহ যে, নানাদিক থেকে তাঁকে আলোচনা করা প্রয়োজন এবং শাস্ত্র বিভিন্ন ভাবে বার বার সে আলোচনা করেছেন। সেইজন্য অন্যত্র যে পুনরুক্তি দোষের, শাস্ত্রে তা কোন সময়েই দূষণীয় নয়। এই দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বকে এখানে দুটি পাখির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হচ্ছে—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥' (৩।১।১)

সযুজা (=সযুজৌ, সর্বদা সম্মিলিত) সখায়া (=সখায়ৌ 'আত্মা' এই সমান নামধারী) দ্বা (=দ্বৌ, দুইটি) সুপর্ণা (পক্ষী, [অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা]) সমানম্ (একই) বৃক্ষম্ (বৃক্ষকে, শরীরকে) পরিষস্বজাতে (আলিঙ্গন করে বসে আছে); তয়োঃ (ওদের মধ্যে) অন্যঃ (একটি জীব) স্বাদু ([বিচিত্র] আস্বাদযুক্ত) পিপ্পলং (ফল, কর্মফল) অত্তি (ভোগ করে), অন্যঃ (অপরটি ঈশ্বর) অনশ্নন্ (ভোগ না করে) অভিচাকশীতি (দর্শন করে)।

সর্বদা সম্মিলিত ও সমনামধারী দুটি পাখি একই গাছে থাকে, এদের মধ্যে একটি পাখি তিক্ত স্বাদু সবরকম ফলই খায়, অন্যটি কোন ফলই খায় না, শুধু দেখে।

দুটি পাখি একই গাছে থাকে। একটি পাখি তিক্ত স্বাদু সবরকম ফল খায় এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করে। আর একটি পাখি কোন ফল খায় না, শুধু দেখে অথচ আনন্দে থাকে। তেমনি দেহরূপ বৃক্ষে দুটি পাখি থাকে, একটি জীবাত্মা অপরটি পরমাত্মা। জীবাত্মা দেহ মন ইন্দ্রিয়াদিতে আমি-বুদ্ধি করছে এবং দেহ-ইন্দ্রিয়াদির পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিণামী অর্থাৎ সুখী বা দুঃখী বোধ করছে। আমরা সর্বদাই দেখতে পাই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্কের ফলে আমাদের সুখ-দুঃখের বোধ হয়। গীতায় বলেছেন— 'মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ' (২।১৪) —ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়াদির সংযোগেই শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের অনুভব হয়। আমি এই জগতের সকল বিষয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়ে সুখ-দুঃখ ভোগ করছি কিন্তু এর পশ্চাতে আর একটি সত্তা রয়েছে যা সদা স্বমহিমায় অপরিণামীরূপে প্রকাশিত। একটি অপরিণামী বস্তুকে কল্পনা না করলে পরিণামী বস্তুকে বোঝা যায় না। যে আমি এখন সুখী পরক্ষণেই দুঃখী তার পিছনে একটি অপরিবর্তনশীল বস্তু না থাকলে সুখ-দুঃখাদিবিশিষ্ট আত্মার প্রকাশ হতো না। কারণ যেখানে পরিণাম সেখানে পরিণামের অপর দ্রষ্টা না থাকলে পরিণামের অনুভব হবে না। সেই অপরিবর্তনশীল তত্ত্বকে বলে পরমাত্মা বা কেবল আত্মা, যিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যাঁকে আশ্রয় না করে কোন বস্তুর প্রকাশ হতে পারে না অথচ তিনি প্রকাশ্য বস্তুগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কিন্তু আত্মা শব্দের অর্থই হচ্ছে সর্বব্যাপী। সুতরাং তা দুটি হতে পারে না, কারণ তাহলে একটি বস্তু আর একটিকে সীমিত করবে। দুটি সর্বব্যাপী বস্তুর কল্পনা যুক্তিবিরোধী। স্বরূপত দুটি বস্তু এক কিন্তু একটিকে আমরা যেন ভিন্নভাবে ভ্রান্তভাবে কল্পনা করে পৃথক করে ফেলছি —কল্পিত পৃথকত্ব। এই দুটি জিনিসকেই আত্মা বলা হলো কেন? না, দুই-ই চেতন। একটি চৈতন্যধর্মবিশিষ্ট অপরটি হচ্ছে চৈতন্যের স্বরূপ— দুই-ই প্রকাশধর্মী।

এইজন্য দুটিকেই পাখি বলা হলো। একটি পরমাত্মা অপরটি জীবাত্মা। উভয়ে স্বরূপত ভিন্ন নয়, তাই বলা হয়েছে 'সযুজা' —সর্বদা এই পাখি দুটি সম্মিলিত এবং তারা 'সখায়া' —আত্মা, এই সমান নামধারী, স্বজাতীয় সমধর্মী অর্থাৎ চৈতন্যধর্মী। একই গাছে অর্থাৎ দেহে থেকে দেহের অধীশ্বর এবং অধিষ্ঠানরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। অধিষ্ঠান এবং তার সঙ্গে সম্বদ্ধরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। অধিষ্ঠান —যেমন স্ফটিক, সে লাল রঙের সঙ্গে সম্বদ্ধ নয়, তার লাল রঙ নেই কিন্তু জবা ফুল বা লাল ফুলের সান্নিধ্যবশত লাল রঙ স্ফটিকে আরোপিত হওয়ায় তাকে লাল দেখাচ্ছে। এই আরোপের অধিষ্ঠান হলো স্ফটিক। জীবাত্মার যে পরিবর্তনশীল রূপ সেটি আরোপিত আর আরোপের অধিষ্ঠান হচ্ছে পরমাত্মা।

কিন্তু জীবাত্মাই বলি আর যে নামই দিই তাতে যদি আত্মধর্ম থাকে তাহলে সুখ-দুঃখাদির সঙ্গে তার সম্বন্ধ হতে পারে না কারণ ওগুলি জড়ের ধর্ম। সম্বন্ধ হতে পারে না অথচ সম্বন্ধের প্রতীতি হচ্ছে— এইজন্য বলা হচ্ছে এগুলি আরোপিত। স্ফটিকের রঙ লাল হতে পারে না কিন্তু লাল দেখাচ্ছে। সেখানে লাল রঙ আরোপিত। জীবাত্মাকে বিশ্লেষণ করার আগে একটি পৃথক অস্তিত্ববিশিষ্ট বলে মনে করি আর বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারি সেটি স্বরূপত শুদ্ধ চৈতন্য, উপাধি-সম্বন্ধের জন্য তাকে যেন পরিবর্তনশীল মনে হচ্ছে। সেইজন্য তাকে ভিন্ন বলে ধরে নিয়ে ভ্রমানুভূতির অনুসরণ করে বলছি দুটি প্রকাশ, আসলে বিচার করলে দাঁড়াবে একটিই প্রকাশ। একটি চৈতন্যই জগৎকে প্রকাশ করছে আমরা তার ভিতর তারতম্য করে দুটি চৈতন্য বলে কল্পনা করছি। একটি চৈতন্যের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার হয় আর একটি অব্যবহার্য। এইজন্য দুটি পাখি বলা হলো। তারা সর্বদা সংযুক্ত হয়ে থাকে, তাদের সমান আত্মা— নাম বা স্বরূপ।

আত্মা মানে সর্বব্যাপী— 'আ সমন্তাৎ তনোতি ব্যাপ্নোতি' —সর্বদিকে যিনি পরিব্যাপ্ত। জীবাত্মা এই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতে এবং পরমাত্মা সর্ব বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। আর একই হৃদয়গুহাতে তাদের উপলব্ধি হয়, সেজন্য বলা হয়েছে— 'সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে' —একই বৃক্ষ বা একই স্থানকে অবলম্বন করে তারা থাকে। এই বৃক্ষ হলো দেহ-ইন্দ্রিয়-সংঘাত। একে বৃক্ষ বলবার কারণ 'ব্রশ্চনাৎ ক্ষরণাৎ বৃক্ষ'। দেহ ও ইন্দ্রিয় উভয়েই নশ্বর ক্ষয়িষ্ণু এবং উভয়কেই অতিক্রম করে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার ঐক্য উপলব্ধি

করতে হবে। তাছাড়া ফল ভক্ষণ করবার জন্য পাখি যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করে তেমনি এখানেও দেহকে অবলম্বন করেই জীবাত্মার কর্মফল ভোগ হয়, এই ধারণাটিও এই উপমার দ্বারা সূচিত হচ্ছে।

'ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।' (কঠ উপ., ২।৩।১) —শ্রুতির এই উক্তিও বৃক্ষের সঙ্গে সংসারের সাদৃশ্য জ্ঞাপন করে। এই সংসার-বৃক্ষের মূল অব্যক্ত ব্রহ্ম ও নিচের দিকে ব্রহ্মবিপরীত অনাত্ম বস্তুর দিকে প্রসারিত তার শাখা-প্রশাখা। সংসারের উৎপত্তি সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম থেকে। কর্মফলের আশ্রয়স্বরূপ এই সংসারে দুটি পাখি রয়েছে। অবিদ্যা-কাম-কর্ম-বাসনা-লিঙ্গ-উপাধি আশ্রয় করে যে রয়েছে সেই সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী আত্মা একটি এবং ঈশ্বর যিনি সকলের নিয়ন্তা তিনি আর একটি। যদিও দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের সংঘাতের মধ্যেই এই পাখিদুটির উপলব্ধি হচ্ছে তবুও তাদের মধ্যে একটি, যাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে সে দেহ-ইন্দ্রিয়াদি উপাধিরূপ বৃক্ষের নানাবিধ ফল খাচ্ছে অর্থাৎ কর্মের দ্বারা যে সুখ-দুঃখাদি অর্জন করছে, তা বোধ করছে, আনন্দ-বেদনা নানা বৈচিত্র্য ভোগ করছে। অজ্ঞতাই এই ভোগের কারণ। নিজেকে সে এই দেহাদি থেকে ভিন্ন বলে ভাবতে পারছে না বলে তার এই ভোগ।

আর একটি পাখি হলো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব সর্বজ্ঞ পরমাত্মা—সর্বপ্রাণীরূপ যে উপাধি, তার ঈশ্বর প্রেরয়িতা, ভোজ্য এবং ভোক্তা সকলের সাক্ষী এবং নিয়ন্তা কিন্তু স্বয়ং অভোক্তা। সে কোন ফল খাচ্ছে না অর্থাৎ কোন কর্মফল ভোগ করছে না, সে কেবলমাত্র সেখানে অবস্থান করছে, দর্শন করছে— 'অনশ্নন্ অভিচাকশীতি'। তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন মাত্র কিন্তু তাঁর সেই প্রকাশই, তাঁর সান্নিধ্যমাত্রই জীবকে কর্মে প্রবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে। ঈশ্বর অন্য কোনভাবে জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করেন না কেবল তাঁর চৈতন্যরূপে উপস্থিতিই কর্মের প্রেরক। এই জগৎ ব্যাপার থেকে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক এর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক হচ্ছে না অথচ তাঁর প্রকাশের দ্বারাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত। এইভাবে একটি পাখি ফলভোক্তা অপরটি সাক্ষীরূপে যখন একই বৃক্ষে অবস্থিত থাকে তখন—

'সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্
অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥' (৩।১।২)

পুরুষঃ (ভোক্তা জীব) সমানে (একই) বৃক্ষে (বৃক্ষে, অর্থাৎ দেহে) নিমগ্নঃ (আসক্ত হয়ে) অনীশয়া (দীনভাব প্রাপ্ত হওয়ায়) মুহ্যমানঃ (দুশ্চিন্তাসহকারে) শোচতি (সন্তাপ করে থাকে); যদা (যখন) জুষ্টম্ ([ধার্মিকগণের] সেবিত) অন্যম্ ([শরীর থেকে] বিলক্ষণ) ঈশম্ (ঈশ্বরকে) [এবং] অস্য (এঁর) ইতি (এই বিশ্বব্যাপী) মহিমানম্ (বিভূতিকে) পশ্যতি (দর্শন করে) [তখন] বীতশোকঃ (শোকমুক্ত হয়, সংসার অতিক্রম করে)।

জীবও ঐরকম একই (সংসার) বৃক্ষে আসক্ত হয়ে শোকে মুহ্যমান হয় এবং সন্তাপ করে থাকে। যখন সে বহুজন দ্বারা আরাধিত এবং দেহ থেকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরকে এবং তাঁর এইরকম মহিমাকে (নিজের দেহ থেকে অভিন্ন) দর্শন করে, তখন শোকমুক্ত হয়।

সেই ভোক্তা পাখিটি অর্থাৎ জীব সংসারে নিমগ্ন হয়ে পরতন্ত্রতাবশত শোকে মুহ্যমান হয়। 'অনীশয়া' যিনি নিয়ন্তা বা ঈশ তাঁর থেকে ভিন্ন, এই বুদ্ধিবশত জীব কর্মফলে যে আসক্তি তাতে ডুবে যায়। দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি থাকায় সে ডুবে যাচ্ছে, নানাপ্রকার দুঃখাদি ভোগের ফলে শোকগ্রস্ত চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছে। এইজন্য সে নিয়ন্তা না হয়ে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তার এই দীনভাব তার 'অনীশা'।

এইরকম কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ববশত স্বাধীনতা হারিয়ে যখন সে নিজেকে হীনমন্য এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে করে সেইসময় অন্য পাখিটিকে দেখে তার মনে বিচার উঠছে— সুখ-দুঃখাদি যাঁকে অভিভূত করছে না, কোন কর্মফল যাঁকে লিপ্ত করছে না, যিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ও উপাস্য হয়ে এখানে বিরাজ করছেন তিনি কে? তখন সে ধীরে ধীরে উপরের পাখিটির দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে এবং শেষকালে দেখে যে, তারা দুজনে যেন একই হয়ে গিয়েছে। তখন তার নিজের পৃথক সত্তার লোপ হয়ে যায়। সে উপলব্ধি করে যে, যাকে সে এতক্ষণ পৃথক পাখিরূপে দেখছিল, যার বিভূতিতে সে বিমোহিত হচ্ছিল সেই পাখির সঙ্গে তার কোন পার্থক্যই নেই। অপর পাখিটির মহিমা তার নিজেরই মহিমা এইটি অনুভব করে সে তখন শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল।

এর তাৎপর্য এই, যতক্ষণ আমরা নিজেদের ঈশ্বর থেকে ভিন্ন বলে মনে করি, নিজেদের কর্মের কর্তা ও সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলে দেখি ততক্ষণই আমাদের পরতন্ত্রতা। বহুজন্মের দ্বারা শুভ সংস্কার অর্জন করে চিত্তশুদ্ধি হলে গুরু বা শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনপন্থা অনুসরণ করে মানুষ যখন পরম তত্ত্বে মনকে সমাহিত করে তখনই জানতে পারে আমিই সেই অসংসারী আত্মা,

যে শুদ্ধস্বরূপ ও সর্বব্যাপী। সে আরও জানবে যে, এই জগতে যা কিছু অর্থাৎ নামরূপাদি সব আমারই মহিমা, বিভূতি আমারই প্রভা। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ববোধ দূর হলেই আমরা বীতশোক হই কারণ ভোক্তৃত্ব যে আমার নয় এটি জানলেই কর্মফল আমাদের লিপ্ত করতে পারে না। রোগ-শোক সুখ-দুঃখাদি দেহমনের ধর্ম। যে আমি দেহমন থেকে ভিন্ন তার আর শোক মোহ কোথায়? তাই ঠাকুর বলতেন, শরীর জানে আর দুঃখ জানে মন তুমি আনন্দে থাক। সে তখন বোঝে, সে নয়, তার দেহমনই সুখ-দুঃখের আশ্রয় এবং এইভাবে সুখ-দুঃখের পারে যায়। এরই নাম বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ পৃথকজ্ঞান। এই বিবেকজ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বরের মহিমা যে তার নিজেরই মহিমা এটিও সে উপলব্ধি করে— 'পশ্যত্যন্যমীশম্ অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।'

'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥' (৩।১।৩)

যদা (যখন) পশ্যঃ (দ্রষ্টা, অর্থাৎ সাক্ষাৎকামী বিদ্বান সাধক) রুক্মবর্ণম্ (সুবর্ণের ন্যায় স্বয়ং-জ্যোতিঃ), কর্তারম্ ([সর্বজগতের অবিনাশী] কর্তা), ঈশম্ (পরমেশ্বর), পুরুষম্ (পরিপূর্ণস্বরূপ), ব্রহ্মযোনিম্ (জগৎকারণ ব্রহ্মকে) পশ্যতে (=পশ্যতি, দর্শন করে) তদা (তৎকালে) বিদ্বান্ (সেই সাক্ষাৎকারী) পুণ্য-পাপে (পুণ্য ও পাপ) বিধূয় (সমূলে নিরাস করে) নিরঞ্জনঃ (নির্লেপ, বিগত ক্লেশ হয়ে) পরমম্ (নিরতিশয়, অদ্বৈতরূপ) সাম্যম্ (সমতা, অভেদ) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়)।

যখন দ্রষ্টা সাধক সেই সুবর্ণ বর্ণ কর্তা ঈশ্বর পুরুষ জগৎকারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন তখন সেই বিদ্বান সকল পাপপুণ্য থেকে মুক্ত হয়ে সর্বমালিন্যরহিত হয়ে পরম সাম্য প্রাপ্ত হন।

'যদা পশ্যঃ'—অর্থাৎ দ্রষ্টা বা সাক্ষাৎকারী জ্ঞানী সাধক যখন সেই 'রুক্মবর্ণং' —সুবর্ণবর্ণ কর্তা ঈশ্বরপুরুষ ব্রহ্মযোনিকে দর্শন করেন তখন সেই বিদ্বান 'পুণ্যপাপে বিধূয়' অর্থাৎ সকল পাপপুণ্য থেকে মুক্ত হয়ে 'নিরঞ্জনঃ' —অঞ্জনশূন্য, সর্বমালিন্যরহিত হয়ে পরম সাম্য প্রাপ্ত হন।

পূর্ববর্তী মন্ত্রদ্বয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বর, যিনি দ্রষ্টারূপে সাক্ষীরূপে বিরাজ করছেন, যিনি স্বাদু বা তিক্ত কোন ফলই গ্রহণ করছেন না তাঁকে দেখে তাঁর সেবা করে সাধক যখন অনুভব করেন ইনিই সেই শুদ্ধ পরমাত্মা

এবং তাঁর মহিমাকে নিজের সঙ্গে অভিন্ন বলে অনুভব করেন তখন তিনি বীতশোক হন। শুধু তাই নয়, সাধক আরও অনুভব করেন যে, বিবিধপ্রকাশরূপ এই জগৎ তাঁরই মহিমা। তখন 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' এ অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে যায়, পরন্তু তিনি অনুভব করেন, তিনি আর সেই শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ অভিন্ন তাই তিনি জগৎকে ঈশ্বরের মহিমা বলে যেমন জানলেন তেমনি তাঁর সঙ্গে সাম্য অর্থাৎ একত্ব অনুভব করে জগৎকে নিজের মহিমা বলেও উপলব্ধি করলেন। এটি হলো অদ্বৈতবাদীর ব্যাখ্যা। কিন্তু এখানে আপত্তি এই যে, মূল শ্লোকে এ-কথা নেই। সেখানে আছে, এরই মহিমা এই জগৎ। সুতরাং অদ্বৈতবাদী এ ব্যাখ্যা কোথায় পেলেন? তার উত্তর এই যে, তাঁকে জানলে সকল বৈষম্য বিলুপ্ত হয়, জীব তাঁর সমত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন তার আর কোন কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না সুতরাং এই জগৎ যে তাঁরই মহিমা এই অনুভবের সঙ্গে কোন বিরোধ হয় না। জগৎ যদি আমার থেকে ভিন্ন হয় তবে তো জগতের অনেক কিছুই আমার কাছে অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য রয়ে গেল। সুতরাং না পাওয়ার দুঃখ আর পাওয়ার সুখের হাত থেকেও নিষ্কৃতি হচ্ছে না। ঈশ্বরকে জানলাম, তাঁকে মহান বলে বুঝলাম কিন্তু তাতে আমার সুখ-দুঃখের নিবৃত্তি কেমন করে হবে? ভক্ত বলেন, ঈশ্বরকৃপায় হতে পারে কিন্তু জ্ঞানীর মত এই যে, যদি জানি এ জগৎ আমারই মহিমা, আমারই সত্তায় সব সত্তাবান তখনই সুখ-দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি ঘটে, প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য আর কিছু থাকে না। সমস্ত জগৎ আমাতেই উৎপন্ন, আমাতেই অবস্থিত, মহিমা শব্দের এই তাৎপর্য। আমি সর্বব্যাপী সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি, জগতে এমন কোন বস্তু নেই যা আমা ছাড়া, অতএব আমার আর শোকের হেতু নেই কারণ আমার পাবারও কিছু নেই হারাবারও কিছু নেই। যদি এই জগৎকে আমারই স্বরূপ আমারই মহিমা বলে জানা যায় তাহলে জীবের দুঃখের দুটি মূল কারণই বিনষ্ট হয়। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা পরম-ব্রহ্মকে যদি আমার থেকে অভিন্ন বলে বোধ হয় সেই মুহূর্তেই জগৎ আমার মহিমা বলে বোধ হবে। তাই বলছেন, ঐ যে আর একটি পাখির কথা বলা হয়েছে সে অপর কেউ নয়, আমারই স্বরূপ প্রথম পাখিটি অর্থাৎ পরমেশ্বর থেকে নিজেকে যতক্ষণ পৃথক বলে মনে হয় ততক্ষণই জীবের সুখ-দুঃখ, তাঁর সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন জানলে আর কোন দুঃখ থাকে না। অর্থাৎ পরমেশ্বরের সঙ্গে একত্ববোধই বীতশোক হবার একমাত্র উপায়।

আলোচ্য শ্লোকে এই কথাই বলছেন। 'পশ্যঃ' অর্থাৎ জ্ঞানী সেই পরমেশ্বরকে দেখছেন সত্যকে উপলব্ধি করছেন। দেখছেন কি ভাবে? 'রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্' —হিরণ্যবর্ণ জগৎকর্তা পরমেশ্বর পরিপূর্ণস্বরূপ ও জগৎকারণরূপে। যিনি সর্বগুণাতীত সর্ববর্ণাতীত তিনি রুক্ম বা সুবর্ণবর্ণ হলেন কেন? সুবর্ণের ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা তাঁর জ্যোতির্ময় প্রকাশময় রূপটি বোঝানো হলো। তাঁর প্রকাশ অন্যপ্রকাশ নিরপেক্ষ তো নিশ্চয়ই, উপরন্তু তাঁরই প্রকাশে অন্য সমস্ত বস্তু প্রকাশিত। তিনি নিজে স্বয়ংপ্রকাশ, আপন আলোকে আলোকিত তো বটেই উপরন্তু সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদের আপাতদৃশ্য আলোর মধ্যেও তাঁরই প্রকাশ— রুক্মবর্ণ বিশেষণের তাৎপর্য এই।

'কর্তারম্' বিশেষণটিতেও আপাতবিরোধ হয়। যাঁকে অকর্তা অভোক্তা বলা হয়েছে তাঁতেই কর্তৃত্ব অরোপিত হচ্ছে। দ্বৈতবাদীরা এই বিশেষণটি সাগ্রহে মেনে নিলেও জ্ঞানী বলেন যে, ব্রহ্মের কর্তৃত্ব স্বীকার করলে তাঁর বিকার এবং পরিণাম মেনে নেওয়া হয়, তিনি পরিণামী বস্তুর মতো অনিত্য হয়ে যান। জগৎকর্তা যদি অনিত্য হন তবে জগৎ সৃষ্টির কোন স্থিরতা থাকে না। কর্তা নিত্য না হলে সৃষ্টির নাশ হলে আবার কে সৃষ্টি করবে? যদি বলি কর্তা উৎপন্ন করবেন, তা হয় না কারণ কর্তা নিজেই অনিত্য, বিনাশী হয়ে যাচ্ছেন সুতরাং তাঁকে কর্তা বলা চলে না। এই হলো অদ্বৈত-বেদান্তীর মত। তবু যে জগৎকে কর্তার অধীন বলা হয় তার কারণ এই অনুভবগম্য জগতের একটি কর্তা থাকা দরকার কারণ জগৎ পরিবর্তনশীল, এর উৎপত্তি আছে লয় আছে। যদিও উৎপত্তি আমরা দেখিনি কিন্তু সেটি আমাদের অনুভবে আছে। যে বস্তুরই পরিবর্তন আছে তাই-ই জড়ভাবযুক্ত, তার উৎপত্তি স্থিতি বৃদ্ধি বিকৃতি ও লয় আছে। সুতরাং পরিবর্তনশীল জগতের উৎপত্তি প্রত্যক্ষের বিষয় না হলেও আমাদের অনুমান করে নিতে হয়। এখন, উৎপত্তি থাকলেই তার কর্তা থাকবে, নিজের থেকে নিজের উৎপত্তি হয় না, হলে দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী কর্তৃ-কর্ম বিরোধ ঘটে। ক্রিয়ার যে সম্পাদক বা আশ্রয় সে কর্ম বা ক্রিয়ার পরিণাম হতে পারে না। এখানে সে কর্তা কে হবে? জগতের অন্তর্ভুক্ত কেউ হতে পারে না। জগদতিরিক্ত কোন তত্ত্বকেই কর্তা বলতে হবে। সেই হিসাবেই ব্রহ্মকে কর্তা বলা হচ্ছে। কিন্তু পরমার্থত কর্তা বললেই তো বিকারী হবার আশঙ্কা, তাই অর্থ করতে হবে—যেন কর্তা। তাঁকে অবলম্বন করে কোথাও তাঁর একটি কর্তৃত্ব আছে ভেবে নিয়ে

তাঁকে কর্তা বলছি। সুতরাং জগৎ-কর্তৃত্ব জগৎকে অপেক্ষা করে হচ্ছে, নিরপেক্ষ কর্তৃত্ব নয়। যে কর্তৃত্ব জগৎকে অপেক্ষা করে হয় সে কর্তৃত্ব জগৎ না থাকলে থাকে না। জগৎ যদি মিথ্যাবস্তু হয় তবে জগৎ-কর্তৃত্বও মিথ্যা। এইভাবেই ব্রহ্মকে জগতের কর্তা বুঝতে হবে। অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর বাস্তবিক বা সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব নয় আরোপিত কর্তৃত্ব আসছে।

এরপর তাঁকে বলা হচ্ছে ঈশ অর্থাৎ নিয়ন্তা। হাঁড়ি কলসি তৈরি করার পর কুমোরের যেমন সেগুলির সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না ঈশ্বর কিন্তু সেরকম নন। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি, তিনি তার নিয়ন্তাও বটে। সকল জাগতিক বস্তুর সঙ্গে তিনি নিয়ন্তা, প্রেরয়িতারূপে রয়েছেন। কিন্তু কিভাবে তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন? যন্ত্রী যেমন যন্ত্র দ্বারা বাইরে থেকে কোন বস্তুকে চালায় তিনি যে সেইভাবে জগতের বাইরে অবস্থান করে জগৎ চালাচ্ছেন তা নয়। এইটি বোঝাবার জন্য তাঁকে বলা হয়েছে 'পুরুষম্'। 'পূর্ণম্ অনেন সর্বম্' অথবা 'পুরি শেতে ইতি পুরুষঃ' —যিনি এই সমস্ত ব্যাপ্ত করে রয়েছেন বা যিনি এই দেহরূপ পুরে অবস্থান করছেন তিনিই পুরুষ। এই পুরুষের নিয়ন্তৃত্ব অভ্যন্তরে থেকে নিয়ন্তৃত্ব, সমস্ত বস্তুর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে থেকে তিনি সব নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর শাসনে সমস্ত জগৎ যথাযথভাবে চলছে।

এরপর তাঁকে বলা হচ্ছে 'ব্রহ্মযোনি' —'ব্রহ্ম এব যোনি'। তিনি সর্বব্যাপী হয়ে এই জগৎকে তাঁর থেকে উৎপন্ন করছেন। যেমন, 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' —এই জগৎকে সৃষ্টি করে তিনি তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেন। এখন, তিনি কি আগে সৃষ্টি করে পরে প্রবিষ্ট হলেন? আপাতত তা মনে হলেও তা কিন্তু সত্য নয়। আমরা যেমন বাড়ি তৈরি করে তার মধ্যে প্রবেশ করি, এ তা নয়। জগৎ তদতিরিক্ত বস্তু হতে পারে না, সমস্ত অণু পরমাণুর মধ্যেই তো তিনি ব্যাপ্ত। একটি ঘটের যে কোন অংশেই তো মৃত্তিকা প্রবিষ্ট, তাই বলে মৃত্তিকা কি ঘট সৃষ্টির পর তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে? ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টিও সেইরূপ। 'তৎ সৃষ্ট্বা' বলতে একটি ঘটনার পর আর একটি ঘটনা নয়। সৃষ্টিক্রিয়া এবং অনুপ্রবেশ এককালীন ব্যাপার। মৃত্তিকা ঘটের কারণ হলেও ঘট সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকা তাতে অনুপ্রবিষ্ট। এক্ষেত্রেও তাই বুঝতে হবে। কিন্তু আবার প্রশ্ন ওঠে এই সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে যদি জগতের কারণই বলি তাহলে তো তিনি কার্য-কারণের অতীত

হতে পারলেন না, তাঁতে কার্য-কারণের সম্বন্ধ হলো। তিনি কি আর নিরপেক্ষ থাকছেন, জগৎ সম্বন্ধে তাঁর কি আপেক্ষিকতা এসে গেল না? তার উত্তর, না। কারণ জগৎকে অপেক্ষা করেই তাঁর জগৎ-কারণত্ব। জগতের দিকে যখন দৃষ্টি দিই একমাত্র তখনই তাঁকে বলি জগৎ-কারণ। কিন্তু জগৎকে যখন দেখি না তখন তাঁর কারণত্বও থাকে না, তিনি নিরপেক্ষ। তাই বলছেন 'ব্রহ্ম এব যোনি'।

এরপর বলছেন, যিনি এইভাবে ব্রহ্মকে জ্যোতির্ময়, কর্তা, ঈশ এবং ব্রহ্মযোনি বলে জেনেছেন সেই বিদ্বান পুরুষ 'পুণ্যপাপে বিধূয়' —পুণ্যপাপ থেকে মুক্ত হয়ে 'নিরঞ্জনঃ' —সম্পূর্ণভাবে অঞ্জনরহিত অর্থাৎ কলুষমুক্ত হয়ে 'পরমং সাম্যম্'— পরম সমতা, ঐক্য প্রাপ্ত হন। এই সমতা বা একত্বের অর্থ ব্রহ্মস্বরূপতা। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে পূর্বোক্তভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি অদ্বয় স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এখানে ভাল করে বুঝতে হবে জগৎকর্তাকে জানলে সে কি করে একত্ব প্রাপ্ত হতে পারে। যদি জগৎকর্তার সঙ্গে সে নিজেকে অভিন্ন করতে পারে এবং জগৎকর্তার থেকে অভিন্ন করে তবেই তার এই জ্ঞানের দ্বারা একত্ব প্রাপ্তি হয়। যদি জগৎ ও জগৎকর্তা ভিন্ন হন বা জগৎকর্তা এবং যে-আমি তাঁকে জানছি, দুই যদি ভিন্ন হয় তাহলে এই উভয়ক্ষেত্রেই দ্বৈতবুদ্ধি আসে। সুতরাং সমত্ব প্রাপ্তি হবে তখনই যখন জগৎকর্তা ও জগতে বা ব্রহ্ম ও যে-আমি তাঁকে উপাসনা করছি এই উভয়ের পার্থক্য লোপ পাবে। জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-র ভেদ চলে গেলে আসবে অদ্বৈতবোধ। জ্ঞানী তখন জগৎ ও ব্রহ্মের সঙ্গে আপনার পূর্ণ একত্ব উপলব্ধি করবেন। এই পূর্ণ একত্ব এলে আর পুণ্যপাপ থাকবে না, কর্তৃত্ববোধ না থাকলে পুণ্যপাপ থাকতে পারে না। সুতরাং বিদ্বান যখন নিজেকে অকর্তা অভোক্তা বলে উপলব্ধি করতে পারেন স্বভাবতই তখন তাঁর আর পুণ্যও নেই পাপও নেই, শুভ ও অশুভ ফলও আর নেই। পাপ-পুণ্যই হচ্ছে অঞ্জন বা কালিমা। সুতরাং ব্রহ্মকে অকর্তা অভোক্তা বলে জেনে যখন জীব নিজেকেও সেই ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন বলে বোধ করে তখনই সে নিরঞ্জন হয়ে পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়।

পরম কেন না এরপর আর কোন তত্ত্ব আর কোন সত্তা নেই। বিদ্বান তখন যেখানেই দৃষ্টিপাত করেন সেখানেই ব্রহ্মকে দর্শন করেন, নিজের মধ্যেও সেই ব্রহ্মকে দেখেন। তাঁর দৃষ্টিতে ব্রহ্মই সমস্ত জগতে

ওতপ্রোত হয়ে থাকেন। এই ওতপ্রোত থাকার অর্থ কি তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ কোন বস্তু নুনে জরে থাকার মতো নয়, রজ্জুতে সাপের অধিষ্ঠানের মতো। God is and all are not— এই বোধই হলো পরম সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি।

সাধনার প্রারম্ভে সাধকের অনুভূতি থাকে যে ব্রহ্ম আর তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই দুটি পাখির উল্লেখ করা হয়েছিল, একজন কর্তা, ভোক্তা, অপরজন অকর্তা, অভোক্তা। সাধ্য-সাধক, উপাস্য-উপাসকের ভেদ অবলম্বন করে সাধনপথে অগ্রসর হয়ে অন্তে উপলব্ধি হলো যে, উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই। পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জগৎকর্তার মধ্যেও কোন ভেদ নেই—'নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন'। প্রকৃতপক্ষে জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নেই। কুম্ভকারের হাঁড়ি কলসি তৈরির মতো জগৎকর্তা জগৎকে সৃষ্টি করেননি। সৃষ্টির জন্য তাঁর আলাদা উপকরণের প্রয়োজনও যেমন হয়নি তেমনি সৃষ্টির পর কুম্ভকারের মতো সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে তিনি সম্পর্করহিতও হননি। মাকড়সা যেমন নিজের মধ্য থেকেই সুতা উৎপন্ন করে ও তাকে আত্মসাৎ করে, ব্রহ্মের সৃষ্টি-সংহার লীলাও তদ্রূপ। ব্রহ্ম স্বয়ং নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। সেই পরম সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত জীব ব্রহ্মের সঙ্গে আপনার একটি ভেদ কল্পনা করে। তাঁকে পূর্ণ এবং নিজেকে অংশ, তাঁকে অগ্নি এবং নিজেকে স্ফুলিঙ্গ মনে করে।

কিন্তু যিনি অখণ্ড তাঁর আর অংশই বা কি করে হয়; আর যিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তাঁকে বাদ দিয়ে ভিন্ন বস্তুর অস্তিত্বই বা কি করে সম্ভব? এই দ্বৈতবোধের বিলয় যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ জীবের মুক্তি সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে নিজের থেকে ভিন্ন বলে জানা এবং তাঁর কৃপায় মুক্তি —দ্বৈতবাদীদের এই মতের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদীর প্রধান আপত্তি এই যে, মুক্তি তাহলে উৎপাদ্য বস্তু হচ্ছে। কিন্তু যার উৎপত্তি আছে তার লয়ও আছে, সুতরাং তা নিত্য হচ্ছে না। এককালে যা লাভ করলাম তা চিরকাল থাকবে না, শাশ্বত হবে না। অর্থাৎ মুক্তিটি আপেক্ষিক। দ্বৈতবাদীরা এর উত্তরে বলে থাকেন যে, লৌকিক বিষয় সম্বন্ধে যে যুক্তি খাটে আলৌকিক বিষয়ে সে যুক্তির অবতারণা করা চলে না। যিনি মায়াপ্রভাবে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্থূল জগতের অতীত একটি লোক আছে, তিনি কৃপা করে

ভক্তদের সেখানে নিয়ে গেলে মায়ার জগতের যুক্তি সেখানে খাটবে না। প্রাকৃত বুদ্ধি নিয়ে অপ্রাকৃতকে বোঝা যায় না। তাঁরা বলছেন—

'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ।
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্তস্য লক্ষণম্॥'

—যেসব বস্তু অচিন্ত্য তাদের সম্বন্ধে যুক্তির প্রয়োগ করা উচিত নয়। অচিন্ত্য বস্তুর লক্ষণ হলো যা ইন্দ্রিয়ের অগোচর। মুক্তি সম্বন্ধে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর এই বিরোধের কোন মীমাংসা সম্ভব নয়। কারণ তর্কের প্রণালী সম্বন্ধেই মতভেদ আছে। গোড়ায় কতকগুলি বস্তু মেনে নিয়ে তবে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া চলে। কিন্তু এই গোড়ার বস্তুগুলি বা আধারের বিভিন্নতা নিয়েই বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব। এ তত্ত্বের বিরোধ অনাদিকাল ধরে চলছে এবং অনন্তকাল ধরে চলবেও। তর্ক দ্বারা কোনদিন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। সুতরাং এইটি আমরা বলতে পারি সে দ্বন্দ্বের সমাধানে প্রবৃত্ত না হয়ে বিদ্বান সাধক পরম সমতা প্রাপ্ত হন, আপনাকে ব্রহ্ম থেকে অভিন্নরূপে উপলব্ধি করেন— অদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত।

তিনিই সেই পরমেশ্বর যদিও তিনি আমাদের কাছে সীমিত ব্যক্তিরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। তিনিই সেই প্রাণের প্রাণ যদিও তিনি সর্বভূতরূপে বহুভাবে প্রকাশিত হচ্ছেন— এই কথাটিই চতুর্থ মন্ত্রে উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

'প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥' (৩।১।৪)

যঃ হি (যিনিই) প্রাণঃ (প্রাণের প্রাণ), এষঃ (সেই ইনিই) সর্বভূতৈঃ (ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতরূপে) বিভাতি (বিবিধ প্রকারে প্রকাশিত হন), বিজানন্ (ইঁহাতে বাক্যার্থমাত্র থেকে জেনে) বিদ্বান্ (বিদ্বান) অতিবাদী (অতিবাদী) ন ভবতে (= ন ভবতি, হন না); [এই বিদ্বান] আত্মক্রীড়ঃ (আপনাতেই ক্রীড়াশীল) আত্মরতিঃ (আপনাতেই প্রীতিযুক্ত) ক্রিয়াবান্ (ধ্যান বৈরাগ্যাদি ক্রিয়াশীল) —এষঃ (এইরূপ ব্যক্তিই) ব্রহ্মবিদাং (ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে) বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ)।

এই যে প্রাণ অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্বভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন, এঁকে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান, তিনি প্রগল্‌ভ হন না। তিনি আপনাতে ক্রীড়াশীল, আপনাতে প্রীতিযুক্ত, ধ্যানবৈরাগ্যাদি ক্রিয়াশীল, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই যে প্রাণ অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্বভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। 'ইত্থম্ভূতলক্ষণে' —এই সূত্র অনুযায়ী এখানে 'সর্বভূত' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। 'জটাভিঃ তাপসং পশ্যামি'— এই উদাহরণে যেমন জটার দ্বারা তাপস লক্ষিত হন এখানেও সেই অবাঙ্‌মনসগোচর পরমাত্মা সর্বভূতরূপে লক্ষিত হচ্ছেন। তাঁকে যিনি জানেন, তাঁর থেকে নিজেকে অভিন্ন বলে সর্বভূতের আত্মারূপে জানেন, তিনিই বিদ্বান বা ব্রহ্মজ্ঞ হন এবং অতিবাদী হন না। 'অতিবাদী' এই বৈদিক শব্দটি ভর্ৎসনাসূচক। এর অর্থ প্রগল্‌ভ, বাচাল বা যিনি অপরকে অতিক্রম করে কথা বলেন। এখন, যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন না, যাঁর কাছে আত্মেতর দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তিনি সব ভিন্ন নামাদিকে অতিক্রম করে আত্মবস্তুকে বলতে পারেন না। কিন্তু যিনি দর্শন করেন যে, সর্ববস্তুই আত্মা, অন্য কিছুই নেই, তিনি কাকে অতিক্রম করে কথা বলবেন? অতএব তিনি অতিবাদী হন না। অবশ্য অতিবাদীর আর একটি অর্থ হয়— যিনি সকলকে অতিক্রম করে কথা বলতে পারেন, যাঁকে আর কেউ অতিক্রম করতে পারে না অর্থাৎ যিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এখানে নাতিবাদী বলা হয়েছে তাই প্রশংসাসূচক দ্বিতীয় অর্থটি এখানে সঙ্গত নয়।

এই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি 'আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্' হন। অর্থাৎ সর্বকর্মের চরমফল যা তিনি তা-ও লাভ করেন। আত্মাকে নিয়েই তাঁর ক্রীড়া। ক্রীড়া বা খেলা করতে গেলে যেরকম বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা রাখে আত্মার সেরকম বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন নেই। তাই তাঁকে আত্মক্রীড় বলা হলো। আত্মাকে নিয়ে যাঁর সর্বসুখভোগ তিনি আত্মরতি, আত্মাতেই তাঁর প্রীতি। আর তিনি ক্রিয়াবান, ধ্যান জপ বৈরাগ্যাদি সর্বকর্মের স্বতঃ অনুষ্ঠানকারী, চেষ্টার দ্বারা তাঁকে এগুলি করতে হয় না। এই তিনটি বিশেষণ যাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য তিনিই হলেন 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ'— ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ক্রীড়া উপভোগের জন্য, আনন্দ লাভ করার জন্য তাঁর অন্য উপকরণের প্রয়োজন হয় না, আপনাতে আপনি থেকেই তিনি আনন্দ উপভোগ করেন।

তিনি 'ক্রিয়াবান্'— সমস্ত ক্রিয়া যাঁর সমাপ্ত হয়েছে, আর কোন কর্তব্য নেই। এখন, এই ক্রিয়াবান শব্দটি নিয়ে মীমাংসকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মীমাংসকদের মতে এখানে অস্ত্যর্থে 'বতুপ্' প্রত্যয় হয়েছে যাঁর ক্রিয়া আছে এই অর্থে। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে নৈষ্কর্ম্য সম্ভব নয়,

যাগযজ্ঞাদিরূপ ক্রিয়াকর্মে তাঁকে নিযুক্ত থাকতে হবে। সুতরাং বেদান্তবাদী যে বলেন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নিষ্ক্রিয়, তাঁর কোন কর্মাপেক্ষা নেই শ্রুতিতে তার বিরুদ্ধ কথাই পাওয়া যাচ্ছে। অপর পক্ষে অদ্বৈতবাদী বলেন, অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাবার জন্য যে চেষ্টা তাই হলো ক্রিয়া। কিন্তু আত্মাতেই যাঁর আনন্দের পরাকাষ্ঠা তাঁর কাছে আর অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্তু কি আছে যা পাবার জন্য তিনি কর্মে লিপ্ত হবেন? সুতরাং এখানে ক্রিয়াবান কথাটির তাৎপর্য যাগযজ্ঞাদিরূপ ক্রিয়া নয়, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে ক্রিয়া করা হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ তো তাঁর হয়েই গিয়েছে তবে আর ক্রিয়ার প্রয়োজন কি? কিন্তু দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কর্ম ব্যতীত মুহূর্তকালও থাকা সম্ভব নয় সেজন্য ক্রিয়াবান হতে হবে— সে ক্রিয়া জ্ঞান-ধ্যান-বৈরাগ্য। ব্রহ্মবিচার ব্রহ্মধ্যানে রত থাকা সকল বিষয়-বাসনা থেকে চিত্তের উপরতি— এই হলো ক্রিয়াবান শব্দটির তাৎপর্য। বেদান্ত বিচারে আচার্য শঙ্কর জ্ঞান ও কর্মের সহাবস্থান স্বীকার করেন না, এ দুটির পরস্পর বিরোধিতার উপরই তিনি জোর দিয়েছেন। তাই ক্রিয়া বলতে তিনি কোন বাহ্যক্রিয়া স্বীকার না করে বলছেন যে, ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ সর্বদা আত্মানন্দে বিভোর থাকবেন এবং আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ধ্যানপরায়ণ ও বৈরাগ্যবান হবেন। এটিই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য। আলোক এবং অন্ধকারের মতো ব্রহ্মজ্ঞান ও যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া পরস্পর বিরোধী কারণ যে কোন যাগযজ্ঞই হচ্ছে সকাম। কিন্তু আপ্তকাম পুরুষ কোন্ কামনায় যাগযজ্ঞে লিপ্ত হবেন? যিনি ঐরকম আত্মজ্ঞ পুরুষ তিনিই হলেন 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ'। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ব্রহ্মবিদ্দের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে। যিনি শাস্ত্রাদি পাঠ করে ব্রহ্মস্বরূপ জেনেছেন তিনিও এক অর্থে ব্রহ্মবিদ্; যিনি শাস্ত্রাদি পাঠের সঙ্গে সাধন ভজন করে ব্রহ্মের স্বরূপ আরও কিছুটা উপলব্ধি করেছেন অথচ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সেই ব্রহ্মানুভূতি তাঁর থাকে না তিনিও ব্রহ্মবিদ্। কিন্তু যিনি ব্রহ্মকে নিজের থেকে অভিন্ন বলে জেনে ব্রহ্মতেই প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বব্যবহার করেন তিনিই বরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্।

ব্রহ্মের স্বরূপ এবং ব্রহ্মবিদের লক্ষণ বলে পরের মন্ত্রে সেই ব্রহ্মপদ লাভের উপায় বলা হচ্ছে। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা এবং সেই উপলব্ধ সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা সাধনা ভিন্ন সম্ভব নয়।

সাধনার দ্বারা মন শুদ্ধ না হলে ব্রহ্মকে ধারণা করা যায় না বা ধারণা হলেও তাতে স্থির হওয়া যায় না। এইজন্যই সাধনের প্রয়োজন। তাই আগেই বলেছেন— 'শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত' (২।২।৩)—জীবাত্মারূপ শরকে উপাসনার দ্বারা তীক্ষ্ণ করে তারপর লক্ষ্যবস্তু ব্রহ্মে শরসন্ধান করতে হবে। বর্তমান শ্লোকে সেই উপাসনার কথা বলেছেন—

'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।।' (৩।১।৫)

যম্ (যাঁকে) ক্ষীণদোষাঃ (চিত্তমলশূন্য) যতয়ঃ (যত্নশীল সন্ন্যাসিগণ) পশ্যন্তি (উপলব্ধি করেন) এষঃ (সেই এই) জ্যোতির্ময়ঃ (হিরণ্ময়) শুভ্রঃ (শুদ্ধ) আত্মা হি (আত্মাই) অন্তঃশরীরে (হৃদয়াকাশে) নিত্যম্ (অবিরাম) সত্যেন (অসত্য ত্যাগের দ্বারা), তপসা (ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতা দ্বারা), সম্যক্ জ্ঞানেন (যথাযথ আত্মদর্শনের দ্বারা) [এবং] ব্রহ্মচর্যেন হি (ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই) লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য)।

যাঁকে চিত্তমালিন্যরহিত সন্ন্যাসীরা উপলব্ধি করেন, সেই জ্যোতির্ময় শুদ্ধ আত্মাকে অবিচল সত্য, অবিরাম একাগ্রতা, নিত্য সম্যক আত্মদর্শন ও অটুট ব্রহ্মচর্যের দ্বারা হৃদয়াকাশে লাভ করতে হয়।

'সত্যেন লভ্য'— এর অর্থ মিথ্যাকে ত্যাগ করা। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সর্বাগ্রে মিথ্যা থেকে নিবৃত্ত হতে হবে, অনৃতকে পরিত্যাগ করতে হবে। তারপর বলছেন 'তপসা'— তপস্যার দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মনের একাগ্রতার দ্বারা। স্মৃতিতেও বলা হয়েছে— 'মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চৈকাগ্রং পরমং তপঃ'— মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে যাবতীয় বিষয় থেকে উপরত করে ব্রহ্মে একাগ্র করার চেষ্টাই তপস্যা। তপস্যা দ্বারা কোন কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বলা হয়নি। চতুর্দিকে সতত ধাবমান মনকে ফিরিয়ে এনে এক লক্ষ্যে স্থিত করাতে হবে। সেটাই তপস্যা। চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্রসাধন কোন সময়েই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল নয়। তিনি সম্যক জ্ঞানের দ্বারা লভ্য। সম্যক জ্ঞানের অর্থ ব্রহ্মের যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখা। জগৎকে অনাত্মবস্তুরূপে, ব্রহ্মভিন্নরূপে দেখা হলো অযথার্থ জ্ঞান— ইতিপূর্বেই এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

এরপর বলছেন, 'ব্রহ্মচর্যেণ'। সাধারণভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযমকেই

ব্রহ্মচর্য বলা হয়। বিশেষ অর্থে প্রথম রিপু বা কামের সংযমই হলো ব্রহ্মচর্য এবং এই সাধন করতে হবে 'নিত্যম্'। প্রতি মুহূর্তেই সাধন সংযম ব্রহ্মচর্য ঈশ্বরচিন্তা করতে হবে। 'ন যেষু জৃম্ভম্ অনৃতম্ ন মায়া'— যাঁদের ভিতরে কপটতা মিথ্যা মায়া বা ছলনা এসব নেই তাঁরাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন। তারপর বলা হচ্ছে 'অন্তঃশরীরে'— সাধন দ্বারা লভ্য আত্মা দেহের মধ্যে হৃদয়রূপ যে গুহা তাতে যে আকাশ সেখানে অবস্থিত। তিনি 'জ্যোতির্ময়ঃ' অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ। 'শুভ্রঃ' অর্থাৎ শুদ্ধ, সর্বকলুষরহিত, তাঁকেই যতিরা দেখেন। যতি বলতে শঙ্কর বলছেন সন্ন্যাসী কারণ তাঁরাই সর্বত্যাগী এবং ব্রহ্মকে পেতে হলে ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে চলে না তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু সন্ন্যাসী শব্দের রূঢ় অর্থ এই যে, যিনি বিহিত কর্মকে বিধিপূর্বক পরিত্যাগ করেছেন। এমনিতে কর্মত্যাগ অশাস্ত্রীয় কিন্তু বৈরাগ্যবশত সমস্ত কর্মের উপর বিতৃষ্ণা আসায় যে কর্মত্যাগ তাই হলো বিহিত কর্মের বিধিপূর্বক ত্যাগ এবং সেটি অশাস্ত্রীয় নয়। এ হলো বিরজাহোমপূর্বক সন্ন্যাসের কথা এবং শঙ্কর সেই অর্থই করেছেন। কিন্তু মূলে যখন এই প্রকার অর্থবোধক কোন বিশেষ শব্দ নেই তখন সন্ন্যাসী শব্দের যৌগিক অর্থ অর্থাৎ যিনি সর্বত্যাগী, অন্তরসন্ন্যাস যাঁর তাঁকেও আমরা বুঝতে পারি। সুতরাং এখানে যতি শব্দের দ্বারা শাস্ত্রসম্মত সন্ন্যাসী বা গীতায় উক্ত সর্বত্যাগী গৃহী উভয়েই উপলক্ষিত হচ্ছেন। যতি শব্দের অর্থ এখানে যতনশীল, চেষ্টাশীল এবং চেষ্টাতেই যিনি প্রতিষ্ঠিত। মূল কথা— 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ'।

এ যুগে ঠাকুরও তাই বলেছেন, যে সবকিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরকে ডাকে সে-ই তাঁকে পায়। স্বামীজী আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায় 'ত্যাগেনৈকেন'। —'একেন' শব্দটির উপর জোর দেওয়া দরকার। ছুঁচে সুতো পরাবার সময় তাতে একটুও আঁশ থাকলে যেমন সুতোকে ছিদ্র দিয়ে গলানো যায় না তেমনি যতক্ষণ মনে বাসনার লেশমাত্রও থাকে ততক্ষণ তাঁকে লাভ করা, অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া যায় না। ভগবান শঙ্কর বহিঃসন্ন্যাসের কথা বললেন, ঠাকুর কিন্তু অন্তরে ত্যাগের কথা বিশেষ করে বলেছেন। যাঁর মন থেকে বিষয়-বাসনা সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে তিনি গৃহী হলেও সন্ন্যাসী। তবে বহিঃসন্ন্যাসের প্রয়োজন নজিরের জন্য, অপরের কাছে ত্যাগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য —এই হলো ঠাকুরের মত। গৃহী সর্ববাসনা ত্যাগ করলেও তার চতুষ্পার্শ্বে

যে ভোগোপকরণ ছড়ানো থাকে, অনেক সময় সাধারণ লোকে তা দেখে ত্যাগের অনুপ্রেরণা পায় না। সেই গৃহী যে এগুলি ভোগ করে না বা করলেও অনাসক্ত ভাবে করে তা উপলব্ধি করে না। সেইজন্য তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন এই সন্ন্যাসীরাই যাঁরা অন্তরে বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই ত্যাগ করেছেন। গৃহীর পক্ষে আন্তরত্যাগই যে যথেষ্ট তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রাজর্ষি জনক এবং ইদানীং কালে বীরভদ্র, নাগ মহাশয় প্রভৃতি। প্রভূত ভোগবিলাসের মধ্যে থেকেও এঁদের মন কখনো পরম পদ থেকে বিচ্যুত হতো না। কিন্তু সে সাধনা অত্যন্ত কঠিন তাই সাধারণের মধ্যে ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ প্রচার করার জন্য প্রয়োজন বহিঃসন্ন্যাসের —এ বিষয়টির উপর ঠাকুর বিশেষ জোর দিয়েছেন। আচার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে বাইরের দিক থেকেও ভোগ পরিবৃত হয়ে থাকা চলবে না। তাই শাস্ত্রের এবং মহাপুরুষদের উপদেশে সন্ন্যাসের কঠোর নিয়মের কথা আছে। ভাগবতেও আছে, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ 'ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপি অকুণ্ঠ স্মৃতিঃ'— ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য পরিবৃত থাকলেও যাঁর ঈশ্বরচিন্তা ম্লান হয় না। তবুও তিনি জগদ্‌গুরু হতে পারেন না কারণ সাধারণ লোকের তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই জগতের কল্যাণের জন্য বহিঃসন্ন্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা ঠাকুর বার বার বলেছেন।

সুতরাং ত্যাগী গৃহী বা সন্ন্যাসী যাই হোন ক্ষীণদোষ বা দোষমুক্ত হয়ে তিনি আপন হৃদয়াকাশে পরমাত্মার দর্শন পান। হৃদয়াকাশই হলো ধ্যানের স্থান। সুতরাং যাঁরা পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে চান, যতি হতে চান, তাঁরা তাঁকে হৃদয়পদ্মে শুদ্ধ আত্মারূপে ধ্যান করলে 'ক্ষীণদোষাঃ' অর্থাৎ সর্ববিধ চিত্তমালিন্যরহিত হয়ে তাঁর দর্শন পাবেন। দোষ শব্দের অর্থ রাগ দ্বেষ প্রভৃতি। যাঁর মন থেকে ঐগুলি চলে গিয়েছে তিনিই ক্ষীণদোষ। সাধন করতে করতে ক্ষীণদোষ হলে ব্রহ্মদর্শন ঘটে।

এইভাবে এই মন্ত্রে প্রথমে সত্য তপস্যা সম্যগ্‌জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্যরূপ নিরবচ্ছিন্ন সাধনের কথা বলা হয়েছে। সাধন করতে করতে সাধক যখন রাগদ্বেষাদি বিনির্মুক্ত হয়ে ক্ষীণদোষ হন তখন তিনি সাধনের আরও সূক্ষ্ম স্তরে উপনীত হয়ে হৃদয়াকাশে শুদ্ধ স্বপ্রকাশ আত্মাকে আপনার থেকে অভিন্ন বলে উপলব্ধি করেন। সাধন ছাড়া শুধু তত্ত্ব আলোচনার দ্বারা কখনো সত্যোপলব্ধি হয় না। কেবলমাত্র তত্ত্বালোচনা বা শাস্ত্রোপদেশ ঊষর ভূমিতে

বীজবপনের মতো। উপাসনার দ্বারা মনকে শাণিত করতে না পারলে সবই বৃথা হয়ে যায়। সেজন্যই বললেন, অনুক্ষণ সত্যে স্থিতি, বিরামবিহীন একাগ্রতা, নিত্য সম্যগ্‌জ্ঞান ও অটুট ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সাধককে অগ্রসর হতে হবে। কেবলমাত্র শাব্দজ্ঞান নিরর্থক —এটিই এই মন্ত্রের বিশেষ তাৎপর্য।

'সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥' (৩।১।৬)

সত্যম এব (সত্যই, অর্থাৎ সত্যবাদীই) জয়তে (জয়যুক্ত হয়) ন অনৃতম্ (মিথ্যা, অর্থাৎ মিথ্যাবাদী, নয়); যত্র (যেখানে) সত্যস্য (উত্তম সাধন সত্যের সম্বন্ধী) তৎ (সেই) পরমম্ (সর্বোত্তম) নিধানম্ ([পুরুষার্থরূপ] নিধি) [আছে, সেখানে] আপ্তকামাঃ (বিগতস্পৃহ) ঋষয়ঃ (তত্ত্বদর্শিগণ) যেন হি (যে পথেই) আক্রমন্তি (=আক্রমন্তে, গমন করেন) [সেই] দেবযানঃ (উত্তরমার্গ নামক) পন্থাঃ (পথ) সত্যেন (সত্যের দ্বারা) বিততঃ (বিস্তৃত, আস্তীর্ণ)।

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়। দেবত্ব প্রাপ্তির মার্গ সত্যের দ্বারা বিস্তৃত। এই সত্যকে অবলম্বন করে ঋষিরা আপ্তকাম হন। সত্যরূপ সাধনের দ্বারাই পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায়।

এর আগে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনের কথা বলেছেন। সেই সাধনের মধ্যে যে সত্যের কথা রয়েছে এই শ্লোকে তারই বিস্তার। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং'— সত্যের এবং সত্যবাদীরই জয় হয় মিথ্যা বা মিথ্যাবাদীর নয়। সত্যের দ্বারাই এই দেবযান বিস্তৃত। দেবযান ও পিতৃযান —মৃত্যুর পর স্বকর্মফল ভোগের জন্য জীবের গমনের এই দুটি পথ। দেবযান মানে দেবত্ব প্রাপ্তির মার্গ, এটি ক্রমমুক্তির পথ অর্থাৎ এই পথে উপাসক ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন এবং অবশেষে ব্রহ্মরূপেই অবস্থান করেন। এই পথ সত্যের দ্বারা বিস্তৃত অর্থাৎ জীবকে সর্বদা সত্যকে অবলম্বন করে এই পথে যেতে হবে। সত্যের প্রশংসা করে পুনরায় বলছেন, এই সত্যকে অবলম্বন করেই ঋষিরা ক্রমশ আপ্তকাম হন, তাঁদের সমস্ত প্রাপ্তব্য বস্তু পাওয়া হয়ে যায় অধিক কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং পরিশেষে তাঁরা উপনীত হন সেখানে যেখানে সত্যরূপ সাধনের দ্বারা লভ্য পরম পুরুষার্থ আছে —তাঁরা সত্যের চরম গন্তব্য বস্তুকে লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সত্যই কলির তপস্যা, যে এই সত্যকে ধরে থাকে সে সত্যের ভগবানকে পায়। সত্যের ভগবান অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ভগবান। সুতরাং যে সত্যকে অবলম্বন করে চলে সে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে পায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ উক্তি যেন উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি। পরবর্তী মন্ত্রে 'সত্যস্য যৎ পরমং নিধানম্'— মনের মধ্যে ধারণাটিকে দৃঢ় করে দেবার জন্য সর্বোত্তম পুরুষার্থ বা ব্রহ্মের স্বরূপের কথা আবার বলছেন।

'বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥' (৩।১।৭)

বৃহৎ (মহান) চ (এবং) দিব্যম্ (স্বয়ংপ্রকাশ) অচিন্ত্যরূপম্ (অচিন্ত্যস্বরূপ) চ (এবং) সূক্ষ্মাৎ (সূক্ষ্ম থেকেও) সূক্ষ্মতরম্ (অতিশয় সূক্ষ্ম) তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) বিভাতি (বিবিধরূপে প্রকাশ পান)। তৎ (উহা) [অজ্ঞানীর কাছে] দূরাৎ (দূর থেকে) সুদূরে (অতি দূরে) চ (অথচ) [জ্ঞানীর কাছে] অন্তিকে (সমীপে) ইহ (এই দেহেই প্রকাশিত), ইহ (এই জগতে) পশ্যৎসু (চেতন জীবগণের মধ্যে) তৎ (উহা) গুহায়াম্ এব (বুদ্ধিতেই) নিহিতম্ (স্থিত)।

তিনি সর্বব্যাপী, প্রকাশশীল অচিন্ত্যস্বরূপ; তিনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর এবং বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ পান; তিনি দূর থেকেও দূরে অথচ এই দেহেরই অতি নিকটে— এই জগতে চেতন জীবগণের হৃদয়কন্দরে তিনি অবস্থিত।

'বৃহৎ' শব্দের অর্থ ব্যাপক। তিনি সর্বব্যাপী, তাঁর কোন সীমা নেই, আদি অন্তহীন, সর্ববস্তুতে তিনি ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন তাই তিনি বৃহৎ। তারপর বলা হচ্ছে 'দিব্যম্'— 'দিব্' ধাতুর থেকে উৎপন্ন শব্দ দীপ্যমান, দ্যোতনশীল বা প্রকাশশীল এই অর্থ। অর্থাৎ তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি ইন্দ্রিয়াদির গোচর নন, তাঁর প্রকাশের জন্য অন্য কিছুর অপেক্ষা নেই। আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় এই স্বপ্রকাশ লক্ষণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন বস্তুর লক্ষণ তাকেই বলে —যে বৈশিষ্ট্য কেবল সেই বস্তুতেই আছে অন্য কিছুতে নেই, যা অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষরহিত। যেমন, গরুর লক্ষণ হচ্ছে গলকম্বল বিশিষ্টত্ব যা অন্য কোন প্রাণীর নেই। সুতরাং এই লক্ষণে যেমন অতিব্যাপ্তি দোষ নেই তেমনি সমস্ত গরুরই গলকম্বল আছে সুতরাং এতে অব্যাপ্তি দোষও নেই। ব্রহ্মের এই স্বপ্রকাশ লক্ষণটিও তেমনি। এই ধর্মটি একমাত্র

ব্রহ্ম বস্তুতেই আছে, অন্য কোথাও নেই। ব্রহ্মই একমাত্র স্বপ্রকাশ আর সবই পরপ্রকাশ। তাঁর যদি কোন প্রকাশক কল্পনা করি তবে ব্রহ্মকে আগে অপ্রকাশ হতে হয়। তিনি কোন সময়ই অপ্রকাশ নন। আবার এই স্বপ্রকাশত্ব তাঁর গুণ নয় কারণ গুণ কখনো থাকতে পারে আবার কখনো না-ও থাকতে পারে। এটি তাঁর ধর্ম, স্বরূপ। আত্মা বলতে যাঁকে বোঝায় স্বপ্রকাশ বলতেও তাঁকেই বোঝায়। সূর্যকে তা বলা যায় না কারণ আত্মবস্তু যদি না থাকেন তবে সূর্য প্রকাশিত হবে না। স্বপ্রকাশ আত্মাকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না। 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' —অর্থাৎ জ্ঞান বা জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার তিনি কর্ম নন। তাঁকে জানার কোন কারণও নেই জগতের শুরুতে এই একটিই স্বপ্রকাশ বস্তু ছিল এবং শেষেও এই একটিই বস্তু থাকবে। যা দেশ কাল বা নিমিত্তের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ এটি নিত্য অপরিছিন্ন নিরপেক্ষ, সর্ব সম্বন্ধশূন্য, যাকে বলা হয় Absolute.

এই যে সর্ব সম্বন্ধশূন্য প্রকাশ এটি তাঁর গুণ বলা চলে না, এটি তিনি স্বয়ং এই বুঝতে হবে। এইখানে একটু ন্যায়শাস্ত্রের বিচার আছে। আত্মা যদি একটি দ্রব্য হয় তাতে জ্ঞান একটি গুণ। নৈয়ায়িকদের মতে আত্মাতে জ্ঞানরূপ গুণ উৎপন্ন হয়। আত্মার সঙ্গে যখন মনের সংযোগ হয় তখন জ্ঞানরূপ গুণ উৎপন্ন হয় কিন্তু যখন সংযোগ থাকে না তখন জ্ঞানও থাকে না। অর্থাৎ আত্মা ও মনের সংযোগের ফলেই জ্ঞানের উৎপত্তি। এইজন্য বেদান্তীরা নৈয়ায়িকদের উপহাস করে বলেন জড়, কারণ তাঁদের কাছে আত্মা জড়বস্তু কিন্তু বেদান্তীর কাছে আত্মা নিত্য প্রকাশমান —'দিব্যম্'।

সেই আত্মার আর কি স্বভাব? 'অচিন্ত্যরূপম্' —তাঁর স্বরূপ চিন্তার অগোচর। কারণ যে সমস্ত বস্তু চিন্তার গোচর তা ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা প্রকাশ্য। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ —এই পাঁচটি বিষয়কে প্রকাশ করে তত্তৎ সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়গুলি। কিন্তু এই আত্মাতে শব্দ স্পর্শাদি কোন কিছু নেই তাই তা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর নয়। আবার মনেরও গোচর নয় তাহলে আত্মাতে পরিচ্ছিন্নতা গুণ থাকতে হয়। মন পরিচ্ছিন্ন বস্তু, অপরিচ্ছিন্ন বস্তুকে সে ব্যাপ্ত করতে পারে না। মনকে পরিচ্ছিন্ন বলা হয় এইজন্য যে, তা নাহলে আমাদের এককালে সর্বত্র মনের সংযোগ থাকত। অপরিচ্ছিন্ন বস্তু সর্বত্র পরিব্যাপ্ত কিন্তু মন সেরকম নয়। সেরকম হলে সর্বক্ষণই শব্দ স্পর্শ রূপাদিজনিত যে জ্ঞান তা অনুভব হতো কিন্তু তা হয় না। মন যখন

যে বিষয়ে যুক্ত থাকে তখন সেই বিষয়ের জ্ঞানটি উৎপন্ন হয়, অন্যথায় বাহ্য বা আন্তর কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। এইভাবে মনের পরিচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হলে বোঝা যায় যে, তার গোচর ব্রহ্ম হতে পারেন না।

আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর কেন তার আরও একটা কারণ বলছেন—'সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি'। ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশ করে স্থূল বস্তুকে। স্থূল বস্তুর প্রকাশক ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম। তিনি তাদেরও প্রকাশক বলে সূক্ষ্মতর। তাঁকে ইন্দ্রিয় প্রকাশ করবে কি করে? অথচ সকল কিছুর অগোচর হয়েও তিনি 'বিভাতি' —'বিশিষ্টরূপেণ ভাতি' —বিশেষ রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। তাঁর এই প্রকাশ অনুভূতির দ্বারা বুঝি। তিনি আমাদের কাছে বিষয়রূপে অনুভূত নন, তাঁকে আমরা স্বরূপে অনুভব করি। অর্থাৎ তিনি অনুভবের যোগ্য ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয় নন এইটাই বুঝতে হবে। কারণ আবার সেই একই কথা আসছে যে, তাঁকে কেউ প্রকাশ করছে না অথচ তিনি প্রকাশিত হচ্ছেন কারণ তিনি স্বপ্রকাশ। যদি বলি যে তাঁরও কিছু প্রকাশক থাকবে তাহলে আবার সেই বস্তুরও প্রকাশক থাকা প্রয়োজন এই অনবস্থা দোষ হয়। সুতরাং আত্মাকে স্বপ্রকাশ বললে এই দোষ হয় না। আরও বলছেন, 'দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ' —তিনি দূরের থেকেও দূরে আবার কাছেও, এইখানেই। যা সর্বব্যাপী সর্ব পরিচ্ছেদরহিত তা-ই একমাত্র দূরে থাকতে পারে আবার নিকটেও থাকতে পারে। তাঁকে আমরা অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরূপে আত্মস্বরূপে অনুভব করছি অন্য বস্তুর দ্বারা অসংস্পৃষ্টরূপে তো অনুভব হচ্ছে না —এই একটি প্রশ্ন এখানে আসে। যাঁরা আত্মজ্ঞ তাঁরা কিন্তু আত্মাকে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আত্মস্বরূপে অনুভব করেন। 'পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্' —যাঁরা তাঁকে দেখেন সেই যোগীরা তাঁকে এখানেই দেখেন। 'পশ্যৎসু চেতনাবৎসু' —অর্থাৎ চেতনাবিশিষ্ট সেই যোগীরা তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিতরূপে দর্শনাদি ক্রিয়ার অধিষ্ঠানরূপে তাঁকে উপলব্ধি করেন। যা কিছু অনুভব করছেন সেই আত্মসত্তার জন্যই অনুভব করছেন। আত্মা থেকে পৃথকরূপে অন্য বস্তুর সঙ্গে অসংস্পৃষ্টরূপে অনুভব হচ্ছে না। এই আত্মা কোথায় অনুভূত হচ্ছেন? গুহাতে। 'নিহিতং গুহায়াম্' —বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত আছেন —এইভাবে জ্ঞানীরা তাঁকে দেখেন। কেন দেখেন? তার উত্তরে বলছেন, 'হৃদয়েনৈব এণং বিজানাতি'। তিনি হৃদয়ে অবস্থিত আছেন তাই হৃদয়ের দ্বারাই জ্ঞানীরা সর্বত্র তাঁকে উপলব্ধি করেন। এছাড়া

অন্য কোন উপায়ে আত্মার অনুভব হয় না। 'পশ্যন্ শৃণ্বন্ জিঘ্রন্' —সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যের ভিতর দিয়ে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন। 'চক্ষুষা পশ্যতি কর্ণেন শৃণোতি রসনয়া আস্বাদয়তি' ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্মের ভিতর দিয়ে তিনি প্রকাশমান। জড় ইন্দ্রিয়ের কিছু প্রকাশ করার সামর্থ্য নেই, তারা যা কিছু প্রকাশ করছে তার মূলে সেই আত্মসত্তার অবস্থিতি। আত্মপ্রকাশের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং তার পরিণাম প্রকাশিত হচ্ছে। এটি সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করার উপায় নেই বলে যোগীরা তাঁকে এই সমস্ত কর্মের ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করছেন। 'প্রতিবোধবিদিতং মতম্' —প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশরূপে তাঁর উপলব্ধি হচ্ছে বলে জ্ঞানীরা অনুভব করেন। জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছু প্রকাশ সম্ভব নয় —তাদের প্রকাশের জন্য তাদের অতিরিক্ত অন্য বস্তুর প্রয়োজন এবং সেটিই আত্মা —এইভাবে জ্ঞানীরা উপলব্ধি করেন।

এই স্বপ্রকাশ আত্মা আকাশের মতো সর্বব্যাপক, তাই তিনি দূরেও আছেন নিকটেও আছেন এবং চিত্তের পরিণামরূপে যে প্রকাশ তারও তিনি প্রকাশক বলেই হৃদয়রূপ গুহাতে তাঁর উপলব্ধি হচ্ছে। অন্যান্য বস্তুকে অনুভব করতে হয় হৃদয়ে অর্থাৎ অন্তঃকরণ দিয়ে কিন্তু হৃদয়ের পরিণামকে বুঝতে হলে তারও কোন ভাসক থাকা দরকার। সেই ভাসকই হলেন আত্মা যিনি 'নিহিতং গুহায়াম্' —অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে হৃদয়গুহাতে লুক্কায়িত আছেন। নিত্য প্রকাশমান আত্মা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়ে আছেন তাই তাঁকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না। এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, নিত্য প্রকাশমান আলোককে অন্ধকার কখনো ঢাকতে পারে কি? সুতরাং অবিদ্যা কি করে আত্মাকে আবৃত করে? তার উত্তরে বলছেন, অবিদ্যার বৈশিষ্ট্য এই যে, সে জড় হয়েও চেতনকে আচ্ছন্ন করে।

এই আচ্ছন্ন করার অর্থ একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যায়। আমরা বলি মেঘ সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে কিন্তু বিচারে দেখা যায় যে, মেঘের সাধ্য নেই যে সূর্যকে ঢাকে, মেঘ ঢাকে আমাদের দৃষ্টিকে। 'ঘনাচ্ছন্ন দৃষ্টিঃ ঘনাচ্ছন্নমর্কম্ মন্যতে' —মেঘ আমাদের দৃষ্টিকে ব্যাহত করে, আমরা বলি মেঘ সূর্যকে ঢেকেছে। সেইরকম আমরা জীবেরা মনে করি যে, অবিদ্যা আত্মাকে ঢেকে দিয়েছে কিন্তু তা তো নয়। নিজেরা অজ্ঞানের দ্বারা পরিছিন্ন হচ্ছি, ব্যক্তিত্ব সীমিত হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছি যে, আত্মা পরিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন।

এইটি বিচার করলে বুঝব যে, নিত্য অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে আবৃত করার ক্ষমতা অবিদ্যার নেই। অবিদ্যার আবরণ শক্তি, বিক্ষেপ শক্তি আছে সত্য কিন্তু সে আবৃত করছে জীবকেই, আত্মাকে নয়। আত্মা যেখানে অপরিচ্ছিন্ন হয়েও পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীত হচ্ছেন তাকেই জীব বলা হয় বটে কিন্তু জীবও সত্য হতে পারে না। জীবও প্রতীতি মাত্র —এইটি হলো বিচার্য বিষয়। বিচারে দেখা যাবে এই প্রতীতি মিথ্যা। দড়িকে যে সাপ বলে ভ্রম হচ্ছে সেই সাপের প্রতীতি যেমন মিথ্যা জীবের প্রতীতিও তেমনি মিথ্যা। জীব জড় হতে পারে না কারণ তাহলে তার প্রকাশ হতো না এবং জীব জড় ও চেতনের সংমিশ্রণও নয় কারণ তা হতে পারে না, আলো ও অন্ধকারের যেমন মিশ্রণ হয় না। সুতরাং 'আমি' বলে কোন বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্বই থাকতে পারে না।

'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥' (৩।১।৮)

[ব্রহ্ম] চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা) ন গৃহ্যতে (গৃহীত হন না), বাচা অপি (বাক্যের দ্বারাও) ন (না), অন্যৈঃ (অপর) দেবৈঃ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা), তপসা (তপস্যাদ্বারা) বা (অথবা) কর্মণা (অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারা) ন (না); [যেহেতু লোক] জ্ঞান-প্রসাদেন (বুদ্ধির স্থিরতা বা নির্মলতার দ্বারা) বিশুদ্ধ-সত্ত্বঃ (শুদ্ধচিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞানযোগ্য হয়), ততঃ তু (সেই জন্যই) ধ্যায়মানঃ (সতত ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি) তম্ (সেই) নিষ্কলম্ (নিরবয়ব ব্রহ্মকে) পশ্যতে (দর্শন করেন)।

ব্রহ্ম চক্ষুদ্বারা গ্রাহ্য নন, বাক্যের দ্বারাও নন; তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা, তপস্যা দ্বারা অথবা অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারাও অনুভূত হন না। যিনি জ্ঞানের নির্মলতা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হয়েছেন এমন সতত ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি নিরবয়ব ব্রহ্মকে দর্শন করেন।

পূর্ববর্তী মন্ত্রে বলা হয়েছে আত্মা 'নিহিতং গুহায়াম্' —তিনি জীবের হৃদয়গুহাতে অবস্থিত কিন্তু সাধারণ চক্ষুর গোচর নন, কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর নন। কেন তাঁকে সাধারণ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করা যায় না, কিভাবেই বা তাঁর উপলব্ধি হয়, তাঁকে দর্শন করা যায় আলোচ্য শ্লোকে তাই বলছেন।

ইন্দ্রিয়ের বিষয় হলেই ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় অর্থাৎ শব্দ

স্পর্শ রূপ রস গন্ধকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু আত্মার মধ্যে তো এই পাঁচটির একটিও নেই। তিনি 'অশব্দমস্পর্শমরূপমরসমগন্ধম্', ইন্দ্রিয় তাঁকে কি করে জানবে? এখানে চক্ষু শব্দের দ্বারা সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় উপলক্ষিত হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে কোন কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাও তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। বাক্, এই ইন্দ্রিয়টি এখানে সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ের প্রতীক। সুতরাং অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও গৃহীত হন না। উপরন্তু তিনি তপস্যা বা কর্মের দ্বারা লভ্য নন। যে সমস্ত বস্তু আমরা লৌকিক উপায়ে লাভ করতে পারি না তপস্যার দ্বারা সেগুলি পেতে চেষ্টা করি, পাই-ও, কিন্তু ব্রহ্মবস্তুকে তপস্যার দ্বারাও পাওয়া যায় না। তাহলে ব্রহ্ম যে আছেন তারই বা প্রমাণ কোথায়? থাকলেও যদি তিনি জ্ঞান কর্ম কোন কিছুরই বিষয় না হন তাহলে তাঁকে পাবার উপায়ই বা কি? তারই উত্তরে বলছেন, 'জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ' —বিশুদ্ধসত্ত্ব হয়েই তাঁকে জানা যায়, দেখা যায়, পাওয়া যায়। কে সেই অধিকারী? যিনি জ্ঞানের নির্মলতা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হয়েছেন, যাঁর চিত্ত সমস্ত মলিনতা বর্জিত হয়েছে একমাত্র সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তাঁকে দর্শন করতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মকে দর্শন করা যায় এর অর্থ কি তিনি সাবয়ব? তা নয়। তিনি 'নিষ্কলং' —নিরবয়ব, তাঁর দর্শন হয় ধ্যানের দ্বারা। ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি হৃদয় মধ্যে তাঁকে ধ্যান করতে করতে দর্শন করেন। এমন ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি কে হতে সমর্থ সে কথা আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে —'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা' (৩।১।৫) ইত্যাদি মন্ত্রে। যিনি এই মন্ত্রোক্ত উপায় অবলম্বন করে শুদ্ধচিত্ত হয়েছেন একমাত্র তিনিই একাগ্রচিত্তে তাঁকে ধ্যান করে দর্শন করতে পারেন। আত্মাকে ধ্যান বা চিন্তা করার অর্থ কি? আত্মার উপর যে সমস্ত আবরণ রয়েছে তার সঙ্গে যে আত্মার কোন সম্বন্ধ নেই এইটি বিচার করে জানতে হবে। এই আবরণ বা আরোপিত ধর্মগুলি সমস্তই পরিবর্তনশীল কিন্তু তার পশ্চাতে যে আত্মা রয়েছেন তিনি অপরিবর্তনশীল, অপরিণামী তত্ত্ব। এইটি বুঝে তাঁকে সমস্ত ইন্দ্রিয় ধর্ম থেকে মুক্ত বলে নিশ্চিত করে জানতে হয়।

তাহলে দেখা গেল যে, তাঁকে জানতে হলে প্রথমে চাই শুদ্ধ অন্তঃকরণ এবং তারপর চাই ধ্যান ধারণা। শুদ্ধ অন্তঃকরণ হলো যন্ত্র বিশেষ, তাকে নিযুক্ত করতে হবে পরমাত্মার ধ্যানে। কিন্তু পূর্বে যখন বলা হয়েছে তিনি মনেরও জ্ঞেয় নন তখন মনের দ্বারা তাঁকে জানতে পারা যাবে কি করে?

আমরা সাধারণত মন বলতে যা বুঝি সেটি হলো পরিণামী, রাগদ্বেষাদিযুক্ত চঞ্চল। সেই মন দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে জানা সম্ভব নয়, যেমন মলিন দর্পণে বা চঞ্চল জলরাশিতে কোন বস্তু স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হতে পারে না। কিন্তু মনটি যদি হয় স্বচ্ছ দর্পণের মতো, অচঞ্চল জলাশয়ের মতো তাহলে আত্মবস্তু তাতে প্রতিবিম্বিত হন। কিন্তু প্রতিবিম্ব তো পড়ে সাবয়ব বস্তুর, নিরবয়ব ব্রহ্মের প্রতিবিম্বনের অর্থ কি? সুতরাং বুঝতে হবে এগুলি সবই উপমার জন্য বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নিরবয়ব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভবই নয়। তিনি অপরোক্ষ কিন্তু নিত্য প্রকাশ কারণ তাঁকে আমরা সবাই জানছি 'আমি' রূপে। আত্মা বা এই 'আমি'-র অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেউই অচেতন নয়। কিন্তু আমরা এই আত্মাকে আবরণযুক্ত করে নানা ধর্ম তাঁর উপর আরোপ করে তাঁকে কর্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী ইত্যাদি ভেবে তাঁর প্রকৃত স্বরূপটি হারিয়ে ফেলি বলে আত্মা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য ইত্যাদি বলা হয়। আমাদের অন্তঃকরণ স্বভাবত স্বচ্ছ কিন্তু স্ফটিকের উপর বিভিন্ন বস্তু প্রতিফলনের ফলে তাতে যেমন বিভিন্ন রঙের সমাবেশ দেখা যায় তেমনি এই অন্তঃকরণেও আত্মা নানা উপাধিবিশিষ্ট হয়ে প্রতিফলিত হচ্ছেন। অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করার অর্থ তাকে সর্ব উপাধি বর্জিত করা, তাহলে অন্তঃকরণ ব্রহ্মবস্তুকে ধারণা করতে সমর্থ হবে।

কিভাবে ধারণা করতে হবে? বলছেন, 'জ্ঞান প্রসাদেন' —যে জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা আমরা বিষয় উপলব্ধি করি সেই বুদ্ধিকে আগে নির্মল করে নিতে হবে। বুদ্ধি নির্মল হলে তবেই ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্যতা আসে। তখন আত্মার উপর যে আবরণগুলি আরোপ করা হয়েছিল সেগুলি খসে যায়, তাঁর স্বরূপটি প্রকাশিত হয়। স্বপ্রকাশ আত্মাকে প্রকাশ করা যায় বললে বিরোধ ঘটে কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত অন্তঃকরণে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত এ-কথা বললে আর বিরোধ থাকে না। উপাধিমুক্ত অন্তঃকরণ আত্মার উপর আর কোন উপাধি আরোপ করে না বলেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপটি উদ্ভাসিত হয় এবং আত্মার স্বরূপ প্রকাশে অন্তঃকরণ আর অন্তরায় হয় না বলেই ঘুরিয়ে বলা হয় যে, অন্তঃকরণ তাঁকে প্রকাশ করে। লৌকিক ব্যবহারে বস্তুর প্রকাশ বলতে আমরা বুঝি যে, আমরা যখন কোন বিষয়ের চিন্তা করি তখন আমাদের অন্তঃকরণ সেই বিষয়াকারে আকারিত হয় এবং অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা সেই আকার প্রকাশিত হয়। যেমন, যখন ঘট দেখি তখন প্রথম চোখের সঙ্গে ঘটের সংযোগ হয়। তারপর চোখ অন্তঃকরণে

সেই বস্তুটি পৌঁছে দেয় এবং অন্তঃকরণ সেই ঘটাকারে আকারিত হয়। এই আকারিত হওয়ার অর্থ অন্তঃকরণে তখন ঘটের বৃত্তি ওঠে। একটি বস্তুকে ভিন্ন বস্তু থেকে পৃথক করে যেটি, সেটি তার আকার। এইভাবে নিরবয়ব সুখদুঃখাদিও আকার এবং অন্তঃকরণও সেইভাবে আকারিত হয়ে অবিচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন হয়। তেমনি ভাবেই যখন আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করি তখন তাঁর একটি ধারণা হয়। অনাত্মবস্তু থেকে ভিন্নত্বই হচ্ছে সেখানে আত্মার আকার। অন্তঃকরণ এই ভিন্নত্বটি জানছে এবং সেই অন্তঃকরণ তখন সর্ব উপাধি বিনির্মুক্ত বলে আত্মার উপরেও কোন উপাধি আরোপ করছে না। এইভাবেই স্বপ্রকাশ আত্মা অন্তঃকরণ-অবচ্ছিন্ন বা অন্তঃকরণে অনুস্যূত যে চৈতন্য তার সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। অর্থাৎ আত্মাকারা বৃত্তি আত্মা সম্বন্ধে যে অজ্ঞান তাকে দূর করছে।

এখানে আত্মা হচ্ছেন ব্যাপক চৈতন্য এবং অন্তঃকরণে অবচ্ছেদ কল্পনা করলে অন্তঃকরণেরও মধ্যে যে আত্মচৈতন্য —উভয় চৈতন্য সেখানে এক। কর্তা-কর্ম-করণ, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সব এক হয়েছে এই আত্মস্বরূপের জ্ঞানে। এরই নাম ত্রিপুটিলয়। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য হতে হবে 'ধ্যায়মানঃ'। যোগীরাও বলেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়, স্থির নিস্তরঙ্গ নিরুদ্ধ চিত্তে আত্মা স্বতঃপ্রকাশ, তাঁদের মতে আর কিছু করার নেই। কিন্তু তাঁদের প্রণালীর সঙ্গে জ্ঞানীর প্রণালীর পার্থক্য আছে। কারণ বেদান্তী বলছেন চিত্তকে শুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আত্মাতে সংবদ্ধ হতে, আত্মা সম্বন্ধে ধ্যানপরায়ণ হতে। এ দুটি প্রণালীর ভালমন্দ নিয়ে বিচার চলে না। যিনি যে পন্থা অনুসরণ করে সিদ্ধিলাভ করেন সেটাই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ।

মন্ত্রে বলা হয়েছে সেই শুদ্ধচিত্ত ধ্যানপরায়ণ সাধক 'তৎ নিষ্কলং পশ্যতে'। 'পশ্যতে' শব্দের অর্থ অতীন্দ্রিয় অনুভব হওয়া এবং তার কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তবে দুর্জ্ঞেয় হলেও, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভবযোগ্য না হলেও তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং জীবের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলে না— এই হলো 'পশ্যতে' শব্দের তাৎপর্য।

পরবর্তী মন্ত্রেও এই কথা বলা হয়েছে—

'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥' (৩।১।৯)

যস্মিন্ (যে চিত্ত) বিশুদ্ধে (নির্মল হলে) এষঃ (এই) আত্মা (আত্মা) বিভবতি (বিশেষরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন) [সেই] চেতসা (চিত্তের দ্বারা) —যস্মিন্ (যে দেহে) প্রাণঃ (প্রাণ) পঞ্চধা (পঞ্চ প্রকারে) সংবিবেশ (প্রবেশ করেছে) [সেই দেহের মধ্যেই] —এষঃ (এই) অণুঃ (সূক্ষ্ম) আত্মা (আত্মা) বেদিতব্যঃ (জ্ঞেয়)— [যে আত্মার দ্বারা] প্রজানাম্ (প্রাণিগণের) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়বর্গসহ) সর্বম্ চিত্তম্ (সমুদয় চিত্ত) ওতম্ (ওতপ্রোত)।

এই দেহে প্রাণ পঞ্চপ্রকারে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে —এই দেহের মধ্যেই বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা আত্মাকে জানতে হয়। প্রাণসমূহ বা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা এই চিত্ত আত্মার সঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, চিত্ত নির্মল হলে এই আত্মা সেখানে নিজেকে প্রকাশ করেন।

চিত্তের দ্বারাই এই অণু বা সূক্ষ্ম আত্মাকে জানতে হবে। সূক্ষ্ম বলার উদ্দেশ্য তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ইন্দ্রিয়ের শক্তি যতই বাড়ানো হোক তার দ্বারা যা জ্ঞেয় হয় না তাই সূক্ষ্ম। অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণের দ্বারাও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে আত্মাকে দেখা যায় না তাঁকেও কিন্তু জানা যায়। কি ভাবে? না, 'চেতসা' অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা। কি করে জ্ঞানের দ্বারা জানা যায়? তার উত্তরে বলছেন, 'যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ' —যে দেহে প্রাণবায়ু —প্রাণ অপান সমান ব্যান উদান —এই পঞ্চ প্রকারে নিজেকে সম্যগ্‌রূপে বিভক্ত করে প্রবিষ্ট করে সেই দেহের মধ্যেই বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এই আত্মাকে জানতে হয়। এই চিত্ত কিরকম? তার উত্তরে বলছেন, 'প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং' —প্রাণসমূহ দ্বারা জীবের চিত্ত এই আত্মার সহিত ওত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু শুধু তো চিত্ত নয়, ব্রহ্ম দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে সর্বত্রই ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। তবে তাঁকে চিত্তের দ্বারা বিশেষ করে জানব কেন? কারণ চিত্তেই তাঁর বিশেষ প্রকাশ। সেইজন্য বলছেন, 'যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা' —চিত্ত নির্মল হলে এই আত্মা সেখানে নিজেকে প্রকাশ করেন।

এই একই কথা পুনঃ পুনঃ বলার তাৎপর্য এই যে, আত্মাকে জানবার আর কোন করণ বা যন্ত্র নেই। অন্তঃকরণ বা চিত্তই তাঁকে জানার একমাত্র উপায় কিন্তু চিত্তের বর্তমান অবস্থায় এর দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। রাগদ্বেষাদিশূন্য সর্বমলিনতা বিবর্জিত প্রসন্ন চিত্তই হলো তাঁর প্রকাশভূমি। যতক্ষণ চিত্তশুদ্ধ না হচ্ছে ততক্ষণই সেখানে আত্মার ঘটপটাদি অনাত্মরূপে প্রকাশ— এই হলো বেদান্তীর মত। কারণ তাদের কাছে আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর সত্তা নেই। স্থূল সূক্ষ্ম বা কারণরূপে জগতে যা-ই অনুভূত হোক না কেন

সে সমস্তই হচ্ছে ব্রহ্ম বস্তুর উপর আরোপ মাত্র, প্রকাশ পাচ্ছেন একমাত্র ব্রহ্মই। কিন্তু বিভিন্ন বস্তুধর্মের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন। স্ফটিকের ক্ষেত্রে যেমন স্ফটিকই সত্য, বর্ণগুলি আরোপিত মাত্র, বেদান্তীর মতে তেমনি ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র সত্য আর সমস্ত তাঁতে আরোপিত। সুতরাং তাঁকে জানতে গেলে এই আরোপিত বস্তুগুলি সরাতে হবে। একেই বলে 'নেতি নেতি' বিচার। 'অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্' ইত্যাদি করে যেখানে আমরা থামি সেটিই ব্রহ্ম। স্বামীজী বলেছেন, 'নেতি নেতি বিরাম যথায়'। অনাত্ম ধর্মকে বাদ দিতে দিতে যখন অনাত্ম কিছু থাকে না তখন এই বাদ দেওয়াটা থেমে যায়। সেইজন্যই ব্রহ্মবস্তু আমাদের বাক্যমনের অগোচর, তিনি তখন সত্তা মাত্র। আত্মবস্তুর কখনো বিপরিলোপ হয় না— 'ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে' —দ্রষ্টার দৃষ্টির কখনো লোপ হয় না। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নিত্য বিরাজমান কিন্তু আমাদের অজ্ঞানবশত ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে হচ্ছে ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান। তাঁর অখণ্ড রূপের দর্শন হচ্ছে না, হচ্ছে খণ্ড জ্ঞান। সুতরাং চিত্ত শুদ্ধ করে আমাদের সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার উপলব্ধি করতে হবে—এই হলো শ্রুতির নির্দেশ।

যিনি বহুরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রকাশ পচ্ছেন সেই সর্বব্যাপী আত্মাকে যে নির্মলচিত্ত ব্যক্তি জেনে আত্মবিদ্ হন তাঁর কি হয় সে সম্পর্কে বলছেন, উপাসক যিনি তিনি উপাসনা করতে করতে উপাস্যস্বরূপ হয়ে যান। উপাসনার দ্বারা 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হয়ে যান। এর তাৎপর্য কি? এই যে বিন্দুর সিন্ধু হয়ে যাওয়া, জীবের ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া এর অর্থ এই যে, বিন্দু বিন্দু নয় সিন্ধুই। সিন্ধুই অজ্ঞানবশত ভ্রমবশত বিন্দুরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে এবং বিন্দুর সিন্ধু হওয়া মানে সেই ভ্রমের নিরসন। বিন্দু বলে কোন বস্তুই নেই। এটি নতুন কিছু পাওয়া নয় নিত্যপ্রাপ্ত বস্তুর বিস্মৃতি দূর হচ্ছে মাত্র। এটি হলো জ্ঞানীর দৃষ্টি। কিন্তু উপাস্য উপাসকের ভেদ যদি আমরা স্বীকার করি তবে উপাসক উপাস্যের চিন্তা করতে করতে উপাস্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এই অর্থ বুঝতে হবে। ঠাকুর যেমন বলতেন, আরশুলা কুমরে পোকার চিন্তা করতে করতে কুমরে পোকাই হয়ে যায়। একাগ্রভাবে যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর চিন্তা করতে থাকলে আমরা তদ্রূপতা প্রাপ্ত হই, এটি হলো উপাসনার রহস্য।

এ বিষয়ে একটি লৌকিক গল্প আছে। এক শিষ্য গুরুকে বলল

যে, সে কিছুতেই মনকে একাগ্র করতে পারছে না। গুরু শিষ্যকে প্রশ্ন করলেন সে জগতে কাকে সব থেকে ভালবাসে? শিষ্য বলল, তার একটি মহিষ আছে সেইটি তার সব থেকে প্রিয়। গুরু তখন তাকে একমনে সেই মহিষটিকে চিন্তা করতে বললেন। কিছুদিন পর গুরু শিষ্যকে একদিন ঘরের মধ্যে আসবার জন্য ডাকছেন, শিষ্য উত্তর দিল সে ভিতরে ঢুকতে পারছে না, তার শিং দুটো দরজায় আটকে যাচ্ছে। গুরু বললেন, এতদিনে তোমার উপাসনা শেষ হলো।

উপাসকের সত্তা উপাস্যের সত্তার সঙ্গে এক হয়ে গেলেই উপাসনার পরিসমাপ্তি। শঙ্কর 'উপাসনা' শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেছেন— 'উপগম্য আসনং চিন্তনম্' —তাঁর সমীপে থেকে তাঁর চিন্তা করা যতদিন না তাঁর স্বরূপতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মের উপাসনার অর্থ কি হবে? তার উত্তর এই যে, ব্রহ্ম সেখানে ধ্যেয় ব্রহ্ম-ধ্যানীর মতে উপাস্যের স্বরূপই উপাসকের স্বরূপ। তাই সেখানে 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এটিই উপাসনা করতে হবে। ধ্যেয় ব্রহ্ম ও জ্ঞেয় ব্রহ্ম— এঁদের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। যিনি জ্ঞান পথের পথিক তিনি নিজেকে সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত করে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। আর ধ্যানী যিনি তিনি ব্রহ্মের ধ্যান করেন এবং ধ্যান করতে করতে তাঁর সমস্ত উপাধি দূর হয়ে যায়। একজনের পথ বিচার অপরজনের পথ ধ্যান। যে ভাবেই হোক যখন সাধক সেই ব্রহ্মের স্বরূপ লাভ করেন তখন তিনিও ব্রহ্মের মতো অপরিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এই কথাটিই দশম মন্ত্রে বলেছেন—

'যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ।।' (৩।১।১০)

বিশুদ্ধসত্ত্ব (নির্মলান্তঃকরণ ব্যক্তি) যম্ যম্ (যে যে) লোকম্ (লোক) মনসা (মনের দ্বারা) সংবিভাতি (সঙ্কল্প করেন) যান্ চ কামান্ (এবং যে সকল ভোগ) কাময়তে (প্রার্থনা করেন) তম্ তম্ (সেই সেই) লোকম্ (লোক) চ (এবং) তান্ (সেই সকল) কামান্ (ভোগ) জয়তে (প্রাপ্ত হন); তস্মাৎ (সুতরাং) ভূতিকামঃ (বিভূতিকামী ব্যক্তি) আত্মজ্ঞম্ হি (আত্মজ্ঞানীকেই) অর্চয়েৎ (পূজা করবেন)।

বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ নির্মলান্তঃকরণ ব্যক্তি যে যে ভোগ্যবস্তু সম্বন্ধে মনের সাহায্যে

সঙ্কল্প করেন, প্রার্থনা করেন তিনি তৎসমুদয় প্রাপ্ত হন। সুতরাং যিনি বিভূতি বা ঐশ্বর্য চান তিনি আত্মজ্ঞানীকে অর্চনা করেন।

লোক শব্দের অর্থ ভোগ্যবস্তু বা ভোগের স্থান যেখানে মানুষ তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পায়। সূর্যলোক চন্দ্রলোক ইত্যাদি শাস্ত্রে যা যা বলা হয় সবই ভোগের স্থান। যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব রাগদ্বেষাদি বিনির্মুক্ত নির্মলচিত্ত আত্মজ্ঞ পুরুষ তাঁর যে যে লোক বিষয়ে সঙ্কল্প জাগে সেই সেই লোকই তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু যিনি বাসনাশূন্য হয়েছেন, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি ভোগের বাসনা করবেন কেন? তাই বুঝতে হবে যদি তিনি কামনা করেন তাহলে কাম্য বস্তুকে পেতে পারেন কিংবা যদি তিনি অপর কারও জন্য কোন লোক প্রার্থনা করেন তাহলে সেই ব্যক্তিও সেই ভোগ্যবস্তু বা ভোগস্থান প্রাপ্ত হবে। সেইজন্য বলেছেন, 'তস্মাৎ আত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ'। 'ভূতিকামঃ' —বিভূতি বা ঐশ্বর্য যে চায় সে আত্মজ্ঞ পুরুষকে অর্চনা করবে কারণ তাঁর মধ্যে সেই অসাধারণ শক্তি থাকে যার দ্বারা তিনি ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত করিয়ে দিতে পারেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি যেমন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন আত্মজ্ঞ ব্যক্তিও সেই রকম প্রার্থীর অভীষ্ট পূরণে সক্ষম হন। ব্রহ্মের উপাসনা করলে যেমন ফললাভ হয় ব্রহ্মজ্ঞের উপাসনা করলেও একই রকম ফললাভ হয়।

এই মন্ত্রটিকে অর্থবাদ বলে মনে করা চলে। কোন ব্যাখ্যাত তত্ত্বের প্রতি সাধারণের মন আকৃষ্ট করার জন্য সেই তত্ত্বের প্রশংসাসূচক বাক্যকে বলে অর্থবাদ। এ মন্ত্রের তাৎপর্য এই নয় যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ইচ্ছামতো সব ভোগ করবেন এবং অপরকে ভোগে সহায়তা করবেন। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা এবং ব্রহ্মজ্ঞের মাহাত্ম্য বর্ণনই এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। অজ্ঞান ব্যক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির দিকে আকৃষ্ট করার জন্যই এই স্তুতিবাক্য। অন্যত্রও এইভাবে স্তুতি করা হয়েছে— 'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি...।' (ছা. উপ., ৮।২।১) "অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি...।" (ছা. উপ., ৮।২।২) অর্থাৎ তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন তাঁর সঙ্কল্পমাত্রেই পিতৃগণ তাঁর কাছে উপস্থিত হন, তিনি যদি মাতৃলোক কামনা করেন তাঁর সঙ্কল্পমাত্রেই মাতৃগণ তাঁর কাছে উপস্থিত হন। এই পিতৃগণ মাতৃগণ— এঁরা দেবতাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মধ্যস্তরবর্তী এক শ্রেণী। এক কথায় ব্রহ্মবিদ্

সমস্ত ভোগ্যবস্তুই পেতে সক্ষম, তাঁর অপ্রাপ্য কিছু থাকে না। তিনি যে অন্যান্য বস্তু ভোগ করতে চান তাও না কারণ তখন তাঁর অবস্থা গীতায় যেমন বলা হয়েছে সেইরকম—'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' (৬।২২)। তা না হলে যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, জগতের অনিত্যতা যাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়েছে তিনি অন্য কোন ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্ত হবেন কেন? এ সকল বস্তু তখন তাঁর 'করামলকমৎ' তবুও তিনি এসবের দিকে ফিরেও তাকান না, এটিই হলো মূল কথা। তখন জাগতিক ভোগ এবং দুঃখ যন্ত্রণা সবই তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়— 'সুখ দুঃখ সমান হলো আনন্দসাগর উথলে'। সুখেতেও নিস্পৃহ দুঃখেতেও তাঁর বিরাগ নেই, ব্রহ্মজ্ঞানীর এই বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই বলা হয় তাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়। যাঁর কাছে সমস্ত জগৎই মিথ্যা তিনি চাইবেনই বা কি আর ভোগ করবেনই বা কি? সুতরাং ত্যাগ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

ব্রহ্মবিদ্ পুরুষকে যাঁরা সেবা করেন তাঁদের কি গতি হয় তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম দুটি মন্ত্রে সেই কথা বলছেন—

'স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ।' (৩।২।১)

সঃ (তিনি) পরমম্ (উৎকৃষ্ট) ধাম (সর্বকামনার আশ্রয়) এতৎ (এই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) বেদ (জানেন) —যত্র (যে ব্রহ্মে) বিশ্বম্ (সমস্ত জগৎ) নিহিতম্ (সমর্পিত রয়েছে) [এবং যে ব্রহ্ম] শুভ্রম্ ভাতি ([স্বজ্যোতিতে] বিমলরূপে প্রকাশিত হন)। [সেইজন্য] অকামাঃ (নিষ্কাম, বিভূতিতৃষ্ণা-বর্জিত) যে ধীরাঃ হি (যে সকল ধীমান) পুরুষম্ (আত্মজ্ঞ পুরুষকে) উপাসতে (সেবা করেন) তে (তাঁরা) এতৎ (এই) শুক্রম্ (জন্ম কারণকে) অতিবর্তন্তি (অতিক্রম করেন)।

যে ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ সমর্পিত হয়েছে এবং যিনি শুদ্ধ জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সেই পরম তত্ত্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন। নিষ্কাম যেসব ধীমান আত্মজ্ঞ পুরুষকে সেবা করেন তাঁরা জন্মের কারণকে অতিক্রম করেন।

'স' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি 'পরমং ব্রহ্ম ধাম' —পরম তত্ত্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁকে জেনেছেন। ধাম শব্দের অর্থ যেখানে ভোগ্যবস্তু থাকে। ব্রহ্ম হলেন সেই ধাম অর্থাৎ সমস্ত আরোপিত ভোগ্যবস্তুর অধিষ্ঠান। সমস্ত জগৎ

যাঁতে অধিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠিত সেই ব্রহ্মকে তিনি জেনেছেন। ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ সমর্পিত এবং তিনি 'ভাতি শুভ্রং' অর্থাৎ শুদ্ধ জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। সমস্ত জগৎ তাঁতে অথচ তিনি শুদ্ধ এই স্ববিরোধের মীমাংসা পাওয়া যায় কঠোপনিষদে— 'সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।' (২।২।১১) —সূর্য সমস্ত লোককে প্রকাশ করছেন। সকল শুদ্ধ বস্তুর যেমন, তেমন সকল অশুদ্ধ বস্তুরও তিনি প্রকাশক। কিন্তু সে সমস্ত প্রকাশ্য বস্তুর দোষের দ্বারা তিনি লিপ্ত হচ্ছেন না, দূষিত বা মলিনত্ব প্রাপ্ত হচ্ছেন না। তেমনি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তিনি 'শুভ্রং ভাতি', এতে কোন বিরোধ হয় না কারণ তিনিও সূর্যের মতো প্রকাশক মাত্র।

এখন, এইরকম ব্রহ্মকে যিনি জানেন তাঁকে দু-ভাবে লোকে উপাসনা বা সেবা করে— সকাম ভাবে বা নিষ্কাম ভাবে। সকাম উপাসকদের পরিণতির কথা আগেই বলা হয়েছে— তারা যে ভোগ্যবস্তু চায় তাই পেয়ে থাকে। এখন বলছেন 'অকামা'দের কথা। ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষারহিত অকাম ধীর বা ধীমান সেবকরা 'শুক্রমেতদ্ অতিবর্তন্তি'— জন্মের যা কারণ তাকে অতিক্রম করেন, আর জন্মমরণের আবর্তে পতিত হন না অথবা শুদ্ধাভক্তি, ভগবানের সঙ্গে নিত্যবিলাস করারূপ মুক্তি লাভ করেন। এই সকাম ও অকাম ব্যক্তিদের পরিণতির পার্থক্য বলছেন পরবর্তী মন্ত্রে—

'কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥' (৩।২।২)

যঃ (যে ব্যক্তি) কামান্ (ভোগ্যবিষয়সমূহকে) মন্যমানঃ (তদ্গুণের চিন্তা সহকারে) কাময়তে (কামনা করেন) সঃ (তিনি) কামভিঃ (বিষয়বাসনা সহ) তত্র তত্র (কাম্য সেই সেই বিষয়ের মধ্যে) জায়তে (জন্মলাভ করেন) ; তু (কিন্তু) পর্যাপ্ত-কামস্য (পূর্ণকাম) কৃতাত্মনঃ (লব্ধাত্ম ব্যক্তির) সর্বে (সকল) কামাঃ ([প্রবৃত্তির হেতু] কামসমূহ) ইহ এব (জীবিতাবস্থায়ই) প্রবিলীয়ন্তি (বিলয় প্রাপ্ত হয়)।

যারা বিষয়সমূহকে চিন্তা করতে করতে সেই বিষয়ভোগের কামনা করে তারা সেই ভোগ্যবস্তুগুলির দ্বারা পরিবৃত হয় এবং (মৃত্যুর পর) যেখানে যেখানে এই কাম্যবস্তুগুলি লাভ করা যায় সেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ণকাম ব্যক্তি, যিনি আত্মাকে লাভ করেছেন তাঁর এই লোকেই সমস্ত কামনার লোপ হয়ে যায়।

কামনাপরায়ণ ব্যক্তি কাম্যবস্তুর চিন্তা করতে করতে মৃত্যুর পর ঠিক সেই সেই অবস্থা লাভ করে অর্থাৎ যার ভিতরে যেমন বাসনা তদনুসারে তার দেহান্তর প্রাপ্তি হয়। এখানে সাধারণভাবে সকলের জন্য বলা হলো যে, যারা 'কামান্' অর্থাৎ বিষয়সমূহকে চিন্তা করতে করতে সেই বিষয় ভোগের কামনা করে তারা সেই ভোগ্যবস্তুগুলির দ্বারা পরিবৃত হয় এবং 'জায়তে তত্র তত্র' —যেখানে যেখানে এই কাম্যবস্তুগুলি লাভ করা যায় সেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করে। প্রায়শ আমাদের মনে এ প্রশ্ন ওঠে, মৃত্যুর পরে কি হবে? তার উত্তর মোটামুটিভাবে এখান থেকেই বলা যায় যে, অন্তরকে নিরীক্ষণ করে, বিচার করে দেখতে হবে আমরা কি চাই। যা চাই সেই বাসনা বা সঙ্কল্প দ্বারা প্রেরিত হয়ে পরবর্তী জন্ম হয়।

কিন্তু আমরা তো ভাল জিনিস চাই, সুখ চাই, দুঃখ বা অশুভ বস্তু চাই না। তাহলে দুঃখময় জন্ম হচ্ছে কেন? তার উত্তরে বলছেন, সুখ এবং দুঃখ একই বস্তুর নামান্তর। বস্তুটি আমাদের কামনা বা কর্তৃত্ববুদ্ধির ফল। যেখানে কামনা আছে সেখানে কর্তৃত্ববুদ্ধিও আছে। আমি কর্তা হয়ে ভাল-মন্দ কাজ করছি, সেই কৃতকর্মের ভাল-মন্দ ফল আমাকেই ভোগ করতে হবে। কর্ম করব আমি আর ফল ভোগ করবে অপরে, তা তো হয় না এবং সেই ফলভোগ এ জীবনে যদি না শেষ হয় তাহলে আবার জন্ম নিতে হবে এবং কর্ম প্রবাহ যতদিন চলবে জন্ম পরিগ্রহও ততদিন চলতে থাকবে। যে মুহূর্তে নিজেকে অকর্তা বলে বোধ করব সে মুহূর্তে জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি পাব।

তাহলে মুক্তির উপায় কি? মীমাংসকরা বলছেন, মুক্তি কর্মের ভিতর দিয়ে পাওয়া যেতে পারে। শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি তাঁরা করতে বলছেন, তা নাহলে প্রত্যবায় হবে, তবে নিষ্কামভাবে করতে হবে। আর বলছেন, নিষিদ্ধ কর্মগুলি করবে না, তাহলে নতুন কর্মের সঞ্চয় হবে না। আর সঞ্চিত কর্মগুলি ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়ে যাবে। কিন্তু কতদিন ধরে এইরকম ভোগ করে সব কর্ম শেষ হবে? অনন্তকাল ভোগ করেও তো ক্ষয় হয় না। আর কর্তৃত্ব-বুদ্ধি যতক্ষণ রয়েছে, ততক্ষণ নতুন কর্ম সঞ্চয় হবেই। ঠাকুর বলছেন, তুমি মনে করছ নিষ্কামভাবে করছ কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে যাবে। তাহলে মুক্তির উপায় কি? উপায় আছে। সকল কর্মের ক্ষয় হয়ে যায় এমন একটি কৌশল বের করতে হবে, এটি প্রধান উপায়।

ভাগবতে বলছেন, সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে শুভ এবং অশুভ কর্মের পরিণাম। সুতরাং সুখদুঃখ ভোগের দ্বারাই কর্মের পরিসমাপ্তি হতে পারবে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, ভগবানকে না পেয়ে গোপীদের যে তীব্র দুঃখ তার দ্বারা তাঁদের সকল অশুভ কর্মের নাশ হয়ে গিয়েছে আর ভগবানকে পেয়ে তাঁদের যে আনন্দ তাতে তাঁদের জন্মজন্মান্তরের শুভকর্মের ফললাভ হয়েছে। সুতরাং শুভাশুভ কর্মের বন্ধন থেকে তাঁরা মুক্ত হয়ে গিয়েছেন। ভক্তের দৃষ্টিতে এ হলো শুভাশুভ কর্ম থেকে মুক্তির উপায়।

জ্ঞানীর ভগবানকে নিয়ে লীলাবিলাসে আকর্ষণ নেই। তাঁর মতে যে আনন্দের উৎপত্তি আছে তার নাশও আছে। ভক্ত তদুত্তরে বলেন, লৌকিক বিষয়ের উৎপত্তি হলেই বিনাশ হবে কিন্তু অলৌকিক ভগবানের সঙ্গে নিত্য লীলায় যে আনন্দ তার উৎপত্তি আছে নাশ নেই। তা দিনে দিনে বাড়ে, তার সীমা থাকে না। রায় রামানন্দ বলছেন, 'অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল' (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা)। উৎপন্ন বস্তু মাত্রেরই নাশ হয় এই যুক্তি অনুসারে একথাও বলা যায় ব্রহ্মজ্ঞানের যখন উৎপত্তি হয়েছে তখন তার নাশও হয়ে যাবে। জ্ঞানী বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উৎপত্তি ও নাশ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলতে বৃত্তিজ্ঞানকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে। বৃত্তিজ্ঞান যদিও নিত্য নয় তবুও বৃত্তি নাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের নাশ হয় না। যেমন, ঘটাকাশ— ঘটের নাশের সঙ্গে সঙ্গে ঘটাকাশের নাশ হয় না। ঘট ভেঙে গেলে পরিচ্ছিন্নতার নাশ হয় অবচ্ছেদ্যরূপে। অবচ্ছেদ মানে সীমা। ব্রহ্মজ্ঞানের যদি উৎপত্তি হয় তার নাশ হয় কি অর্থে? না, তার অবচ্ছেদ বা সীমার নাশ হয়। বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে চৈতন্য তার সীমার নাশ হয়। যে জ্ঞানস্বরূপ সে যেমন ছিল তেমনি থাকে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপাদ্য নয়, বৃত্তিজ্ঞানরূপে তার উৎপত্তি হলেও জ্ঞানস্বরূপরূপে তার উৎপত্তি হয় না কারণ এই স্বরূপ-জ্ঞান নিত্য। এখন, বৃত্তির যখন নাশ হয় তখন চৈতন্য আর বৃত্তি অবচ্ছিন্নরূপে থাকে না। কিন্তু অবচ্ছেদরহিত অসংশ্লিষ্ট জ্ঞান থাকে।

বিষয়টি সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা বড় কঠিন। জ্ঞান থাকে না আর বৃত্তিজ্ঞান থাকে না এ দুটি যে এক বস্তু নয় একথা বুঝতে হবে। জ্ঞানমার্গের ব্যাখ্যাতারা বলেন, সূর্যের প্রকাশ যখন হচ্ছে তখন সেখানে কোন বস্তু থাকলে তার প্রকাশ হয়। কিন্তু যদি বস্তু না থাকে তবে স্বপ্রকাশ

সূর্য নিজেই প্রকাশিত থাকেন। সূর্যের প্রকাশ্য বস্তুগুলি যদি একে একে ভেঙে কিংবা সরিয়ে ফেলা যায়, সেগুলি লোপ পেয়ে যায় তাহলে সূর্যের প্রকাশও কি লোপ পাবে? পাবে না। সূর্য স্বপ্রকাশ থাকবে। যদি বস্তু থাকে তো প্রকাশিত হবে, না থাকে তো স্বপ্রকাশ নিজে প্রকাশিত থাকবে। সেইরকম বৃত্তি যদি ওঠে জ্ঞান তাকে প্রকাশ করবে, বৃত্তি না থাকলে স্বয়ং জ্ঞান স্বপ্রকাশ থাকবে। এই জ্ঞানের উত্থান-পতন উৎপত্তি-লয় নেই, বৃত্তিজ্ঞানের উৎপত্তি-লয় আছে। সূর্যের আলো যেখানে পড়ছে সেখানে বস্তু প্রকাশিত হচ্ছে, বস্তুর পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশেরও পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু যে আলো দিয়ে বস্তুর প্রকাশ সেই আলোর পরিবর্তন হচ্ছে না, সূর্য সমানই রয়েছে। ঠিক সেইরকম জ্ঞান সমভাবে স্বপ্রকাশ রয়েছে, তার প্রকাশ্য বস্তুগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে, উঠছে যাচ্ছে। সেই তরঙ্গ উঠছে কোথায়? বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণকে প্রকাশ করছে যে আলোক—আত্মা-আলোক, সেই আলোকও প্রকাশমান হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত বৃত্তি তরঙ্গ যদি দূর হয়ে যায় শান্ত হয়ে যায় তাহলে কি জ্ঞানের প্রকাশ থাকবে না? অবশ্যই থাকবে। প্রকাশ বস্তুটি যেমন তেমনই আছে। অন্য বস্তু তার সম্পর্কে এসে প্রকাশিত হচ্ছে এবং লোপ পাচ্ছে। বস্তু না থাকলে প্রকাশ স্বরূপ যিনি তিনি একাই থাকবেন তাঁর প্রকাশ্য কিছু থাকবে না। জ্ঞানী বলেন, সেই প্রকাশ স্বরূপই হচ্ছেন ব্রহ্ম। 'নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ম্প্রভা' —সম্বিত অর্থাৎ জ্ঞান স্বপ্রকাশ, তার উদয় হয় না অস্তও হয় না। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা বোঝা কঠিন। আমরা সবসময় বৃত্তিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত কাজেই সেইরকম জ্ঞানকে আমরা বুঝতে পারি। যেখানে আমি আছি জ্ঞাতা, আমার জ্ঞানরূপ ক্রিয়া আছে এবং সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার একটি কর্ম থাকে আমরা জানছি তাও আছে। জ্ঞান জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়— এই তিনটির সঙ্গে আমাদের পরিচয়। কিন্তু এখানে যে জ্ঞানের কথ বলা হচ্ছে যা বৃত্তিজ্ঞানের পারে সেখানে জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এই তিনটি নেই, এক হয়ে গিয়েছে। তিনটির লোপ হলে জ্ঞানেরও লোপ হয়ে যায় না। জ্ঞানের বিষয় লোপ পেয়ে গেলে জ্ঞান কি লোপ পেয়ে যায়? যায় না। ঘটের নাশে আকাশের নাশ হয় না। এই অপরিবর্তনশীল নিত্যজ্ঞান —তাতেই নিজেকে অবসান করে দেওয়াই জ্ঞানীর লক্ষ্য।

প্রকৃতপক্ষে কামনা ত্যাগই হচ্ছে মুক্তিকামী ব্যক্তির প্রধান সোপান।

কামনার কখনো পরিতৃপ্তি হয় না, কামনা ত্যাগেই আসে পরিতৃপ্তি। যিনি কামনা ত্যাগ করেছেন তিনিই হচ্ছেন পূর্ণকাম বা পর্যাপ্তকাম এবং কৃতাত্মা। কৃতাত্মা অর্থ আত্মাকে যিনি লাভ করেছেন, সমস্ত অবিদ্যা দূর হয়ে যাঁর আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাঁর মনটি লক্ষ্যে স্থির হয়েছে তাঁর 'ইহৈব' —এই লোকেতেই, এই দেহেতেই 'সর্বে কামাঃ প্রবিলীয়ন্তে' —সমস্ত কামনার লোপ হয়ে যায়। যে মুহূর্তে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই মুহূর্তেই মন থেকে সমস্ত কামনা অন্তর্হিত হয়ে যায়, দেহের বিনাশের জন্য অপেক্ষা থাকে না।

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥' (২।২।৮)

—স্বর্গাদি লাভ হয় মৃত্যুর পরে, এই জগতে তাকে পরীক্ষা করে নেওয়া যায় না কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এই জগতেই যাচাই করে নেওয়া যায়। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই মানুষের মুক্তি হয়ে যায়। দেহান্তর বা কালান্তরের প্রয়োজন নেই। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি যে সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম হয়ে যাচ্ছেন তা তাঁর বাক্য ও ব্যবহার থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে। তাঁরা তখন বলছেন, 'কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক' (বৃ. উপ., ৪।৪।২২)। প্রজা বা সন্তানাদির দ্বারা ইহলোক ভোগ্য হয়, ধর্ম বা পুণ্য দ্বারা স্বর্গাদি পরলোক ভোগ্য হয় কিন্তু জ্ঞানীর এই দুটির কোনটিরই প্রয়োজন নেই, তাঁর আত্মাই সব।

এই হলো অকাম ব্রহ্মজ্ঞদের কথা। কিন্তু পাশাপাশি আছেন সকামরা যাঁদের কথা এই শ্লোকের পূর্বার্ধে বলা হয়েছে।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥' (৩।২।৩)

অয়ম্ (উক্ত) আত্মা (আত্মা) প্রবচনেন (বহু শাস্ত্রত্যাগের দ্বারা) ন লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য নন), মেধয়া (গ্রন্থার্থধারণের শক্তি দ্বারা) ন (নন) বহুনা (বহু) শ্রুতেন (শ্রবণের দ্বারা) ন (নন); এষঃ (এই বিদ্বান, সাধক) যম্ এব (যে পরমাত্মাকেই) বৃণুতে (পেতে ইচ্ছা করেন) তেন (সেই বরণের দ্বারা) লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য); তস্য (সেই মুমুক্ষুর) এষঃ (এই) আত্মা স্বাম্ (স্বীয়) তনুম্ (পারমার্থিক স্বরূপ) বিবৃণুতে (প্রকাশ করেন)।

শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা আত্মা লভ্য নন, শাস্ত্রধারণশক্তি দ্বারাও লভ্য নন; বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না। যে সাধক এই আত্মাকে বরণ করেন, তাঁর সেই বরণের দ্বারাই আত্মা লভ্য হন, সেই সাধকের কাছে এই আত্মা নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করেন।

'অয়ম্ আত্মা প্রবচনেন ন লভ্য'— উক্ত আত্মাকে প্রবচনের দ্বারা লাভ করা যাবে না। প্রবচন মানে বেদ অধ্যয়ন অভ্যাস। অর্থাৎ শাস্ত্রব্যাখ্যার দ্বারা আত্মা লভ্য নন। 'ন মেধয়া' —মেধার দ্বারাও লাভ হবে না। শাস্ত্রার্থ ধারণ শক্তিকে মেধা বলে। 'ন বহুনা শ্রুতেন'—এবং বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না। পরন্তু 'যমেব এষ বৃণুতে' —যে সাধক এই আত্মাকে বরণ করেন, 'তেন লভ্যঃ' —তাঁর এই বরণের দ্বারাই আত্মা লভ্য হন। 'তস্য এষ আত্মা স্বাম্ তনুং বিবৃণুতে' —সেই সাধকের কাছে এই আত্মা নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করেন। এই হলো শঙ্করের মতে ব্যাখ্যা।

আর একটু ভক্তির ভাব নিয়ে বলা যায় 'যমেব সাধকং এষ আত্মা বৃণুতে'— যে সাধককে এই আত্মা বরণ করেন যাঁকে আপনার বলে গ্রহণ করেন কৃপা করেন, 'তেন' সেই সাধকের দ্বারা 'এষ আত্মা লভ্যঃ', এই আত্মা লভ্য হন। দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে একটু তফাত আছে। শঙ্কর বলছেন, 'যমেব আত্মানং বিদ্বান বৃণুতে' —যে আত্মাকে এই সাধক বরণ করেন 'তেন বরণেন' —সেই বরণের দ্বারাই আত্মা লভ্য। অর্থাৎ অন্য সব ত্যাগ করে আত্মাকে বরণ করলেই আত্মা লভ্য হন, অমৃতত্ব লাভের এই উপায়। আর অপর ব্যাখ্যা হলো, যে সাধককে এই আত্মা বরণ করেন সেই সাধকের দ্বারাই আত্মা লভ্য হন।

শঙ্কর ভাষ্যে বলছেন, যদি সকল লাভ অপেক্ষা আত্মলাভ শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে তো তাঁকে লাভ করবার জন্য প্রবচন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করতে হবে এইরকম আশঙ্কার সম্ভাবনা আছে, তাই বলছেন, এই যে আত্মাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেই আত্মার লাভই হলো পরম পুরুষার্থ, পুরুষের প্রয়োজন।

যদি প্রবচনাদির দ্বারা তাঁকে লাভ করা না যায় তাহলে কি করে তিনি লভ্য হন? বিদ্বান ব্যক্তি যে পরমাত্মাকে পেতে ইচ্ছা করেন 'তেন বরণেন' —সেই বরণ অর্থাৎ আত্মাকে নির্দিষ্ট রূপে পাবার যে ইচ্ছা তার

দ্বারাই 'এষ পরমাত্মা লভ্যঃ' —এই পরমাত্মা লভ্য হন, অন্য সাধন দ্বারা নয়। কেন? না, আত্মা হচ্ছেন নিত্যলব্ধ স্বভাব। তিনি সবসময় আমাদেরই রয়েছেন তাই তাঁকে লাভ করব কি? বিদ্বানের এই আত্মলাভটা কি রকম? বলছেন, এই আত্মা অবিদ্যাসমাচ্ছন্ন স্বীয় উৎকৃষ্ট তনু অর্থাৎ আত্মার যে তত্ত্বস্বরূপ তা প্রকাশ করেন। আলোকে ঘটাদি দ্রব্যের ন্যায় যেখানে বিদ্যার প্রকাশ সেখানে আত্মা 'আবির্ভবতি' —স্বস্বরূপে প্রকাশিত হন। অতএব অন্যবস্তু ত্যাগপূর্বক আত্মলাভের প্রার্থনাই— আত্মাকে পাওয়ার ইচ্ছাই তাঁকে লাভ করার উপায়। অন্যান্য কামনা বাসনার দ্বারা আত্মা যেন ঢাকা রয়েছেন। আত্মা আছেন কেবল এই অবিদ্যার জন্য তাঁকে দেখা যায় না। বাসনারূপ অবিদ্যা দূর হয়ে গেলেই আত্মা প্রকাশিত হন। আত্মাকে পাবার জন্য অন্য চেষ্টার দরকার হয় না। যেমন, কোন দূরের বস্তুকে যদি পেতে হয় তাহলে সেই বস্তুটির বিষয়ে শুনে তার নিকটে যেতে হয় এবং গিয়ে তারপর তাকে পেতে হয়। এখানে সেরকম কিছু নয়, আত্মলাভের ইচ্ছা থাকলে অন্য বস্তুগুলিকে মন থেকে সরিয়ে ফেলতে হয়। যখন বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা দূর হয় জ্ঞানলাভ হয় তখনই আত্মার প্রকাশ হয়, অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম'॥ (৩।২।৪)

অয়ম্ (এই) আত্মা (আত্মা) বলহীনেন (মিথ্যাজ্ঞানে অভিভূত ব্যক্তির দ্বারা, আত্মনিষ্ঠা-জনিত বীর্য যার নেই তার দ্বারা) ন লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য নন), প্রমাদাৎ (আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগ, লৌকিক বস্তুতে আসক্তি) বা (অথবা) অলিঙ্গাৎ (সন্ন্যাসরহিত) তপসঃ অপিচ (জ্ঞান হতেও) ন ([লভ্য] নন); তু (কিন্তু) এতৈঃ উপায়ৈঃ (এই সকল সাধন অর্থাৎ বল, অপ্রমাদ, সন্ন্যাস ও জ্ঞানসহায়ে) যঃ বিদ্বান্ (যে বিবেকী) যততে (যত্ন করেন) তস্য (তাঁর) এষঃ আত্মা (এই আত্মা) ব্রহ্মধাম (সর্বাশ্রয় ব্রহ্মে) বিশতে (প্রবেশ করেন)।

বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করতে পারে না। আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগের দ্বারা বা চিহ্নবিহীন তপস্যার দ্বারা এই আত্মা লভ্য নন। যে বিবেকী ব্যক্তি এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা অর্থাৎ বল, অপ্রমাদ, লিঙ্গযুক্ত তপস্যা এই কয়টির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন, তিনিই সেই সর্বাশ্রয় ব্রহ্মে প্রবেশ করেন।

বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করতে পারে না। যদি প্রমাদ বা অনবধানতা থাকে, অবহিত না হওয়া যায় তাহলেও ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। লিঙ্গবিহীন বা চিহ্নবিহীন তপস্যার দ্বারা এই আত্মা লভ্য নন। কিন্তু যে বিবেকী ব্যক্তি এই সমস্ত উপায় অবলম্বনপূর্বক আত্মজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করেন তাঁরই আত্মা সকলের আশ্রয়রূপ যে ব্রহ্মরূপ ধাম তাঁতে প্রবেশ করে।

এখানে 'বলহীন' শব্দের অর্থ শারীরিক দুর্বলতা নয়, বল শব্দের অর্থ আত্মনিষ্ঠাজনিত বীর্য। অবশ্য সুস্থ সবল শরীর ব্যতীত তপস্যা সম্ভব নয়, এ-কথাও ব্যবহারিকভাবে সত্য এবং স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন এখানে শারীরিক বলের কথাও বলা হয়েছে। বল, অপ্রমাদ, লিঙ্গযুক্ত তপস্যা —এই কয়টি উপায়ের দ্বারা আত্মাকে লাভ করবার চেষ্টা করতে হবে। অপ্রমাদ অর্থাৎ আত্মাকে ভুলে না যাওয়া, আত্মা সম্বন্ধে উদাসীন না থাকা, আত্মবিষয়ে সর্বদা অবহিত থাকা। পুত্রবিত্তাদির প্রতি আসক্তিবশতই এই প্রমাদ ঘটে থাকে আত্মাকে আমরা ভুলে থাকি। তাই সাংসারিক সর্ব ভোগ্যবস্তুতে অনাসক্ত হয়ে নিরন্তর আত্মবস্তুকে চিন্তা করা, আত্মা সম্বন্ধে অনুক্ষণ অবহিত থাকাই অপ্রমাদ।

আর প্রয়োজন লিঙ্গযুক্ত তপস্যা। লিঙ্গ শব্দের অর্থ বলা যেতে পারে সাম্প্রদায়িক চিহ্নবিশেষ, তবে শঙ্কর এর অর্থ করেছেন সন্ন্যাস— সর্ব সঙ্কল্প ত্যাগরূপ সন্ন্যাস। তপস্যা বলতে আমরা সাধারণত কৃচ্ছ্রসাধন বুঝি। তপস্যা কায়িক বাচিক মানসিক ত্রিবিধ হতে পারে। কিন্তু অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধন করে যে কায়িক তপস্যা, শাস্ত্র তাকে খুব সমর্থন করেন না। ভোগবিলাসে রত না হওয়াই শাস্ত্রের নির্দেশ। শরীরের সুখ-দুঃখ থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে ব্রহ্মবস্তুতে স্থির করাই হলো কায়িক তপস্যা, শরীরকে অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া নয়। এ-কথা গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে এবং সাধক মহাপুরুষদের আচরণে ও উপদেশে বার বার পাওয়া যায়। বিনা প্রয়োজনে বাক্যালাপ না করা, মিথ্যা না বলা এই হলো বাচিক তপস্যা। আর 'অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ' —ব্রহ্মবিষয়ক ব্যতীত অন্য কথা না বলা, অন্য চিন্তা না করা, সতত তাঁর চিন্তা করা— এই হলো মানস তপস্যা। এই তিনটির মধ্যে সাধারণত কায়িক তপস্যার উপর আমরা বেশি জোর দিয়ে থাকি কারণ সেটিই সব থেকে সহজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি গৌণ তপস্যা। এখানে লিঙ্গ সহিত তপস্যা অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিসম্মত তপস্যার কথা বলছেন অথবা বিশেষ বিশেষ

সম্প্রদায়ের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন আছে সেগুলি গ্রহণ করে যে তপস্যা তার কথা। কিন্তু আগেই বলেছি শঙ্কর লিঙ্গ শব্দের এ অর্থ করেননি, তিনি অর্থ করেছেন সন্ন্যাস।

তাহলে প্রশ্ন জাগে সকলকেই কি সন্ন্যাস নিতে হবে? তা নাহলে ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান হবে না? তা নয় —টীকাকার বলছেন, 'সন্ন্যাসঃ সর্বত্যাগাত্মকঃ, তেষামপি স্বত্বাভিমানাভাবঃ।' এই হলো আন্তরসন্ন্যাস, অর্থাৎ আমি আমার এই ভাব ত্যাগ। এই আন্তরসন্ন্যাসই এখানে অভিপ্রেত, বাহ্যসন্ন্যাস নয় কারণ ইন্দ্র জনক গার্গী প্রভৃতিরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন যদিও তাঁদের কোন বাহ্যিক চিহ্ন ছিল না। অর্থাৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্মানুভূতির জন্য বাহ্যসন্ন্যাস না হলেও চলে কিন্তু আন্তরসন্ন্যাস না হলে চলে না —'তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ' দ্বারা এই কথাই বোঝানো হয়েছে। যদিও শঙ্কর বাহ্যসন্ন্যাসের কথাই বলতে চান এরকম একটি মত আছে এবং এ-কথা সত্য যে, বহু ক্ষেত্রেই তিনি বাহ্যসন্ন্যাসের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তবে এ অর্থ আমাদের ঠিক সঙ্গত মনে হয় না কারণ যার আন্তরসন্ন্যাস হয়েছে তার আর বাহ্যসন্ন্যাসের প্রয়োজন কি? কিন্তু যদি আন্তরসন্ন্যাস না হয়ে থাকে তাহলে কেবল বাহ্যসন্ন্যাস নিয়ে কোন লাভ হয় না। যাঁরা লোকশিক্ষা দেবেন, যাঁরা আচার্য তাঁদের পক্ষে অবশ্যই অন্তরে বাইরে উভয় প্রকার ত্যাগই প্রয়োজন যেমন ঠাকুর বলেছেন। কিন্তু এখানে সে প্রসঙ্গ তো বলা হচ্ছে না সুতরাং যে সাধক আত্মনিষ্ঠাজনিত বীর্য, অনবধানতা এবং আন্তরসন্ন্যাস —এই তিনটি সম্পদের অধিকারী তাঁর জীবাত্মা সর্বাশ্রয়রূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে। যে সর্ব বাসনা ত্যাগ করেছে সে কোন বিশেষ লোকে কেন যেতে চাইবে? তাই ধাম অর্থাৎ লোক শব্দের অর্থ এখানে বুঝতে হবে স্বস্বরূপতা।

'সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥' (৩।২।৫)

এনম্ (এই আত্মাকে) সম্প্রাপ্য (সম্যক অবগত হয়ে) ঋষয়ঃ (সত্যদর্শিগণ), জ্ঞানতৃপ্তাঃ (জ্ঞানমাত্রের দ্বারাই তৃপ্ত), কৃতাত্মানঃ (পরমাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত), বীতরাগাঃ (আসক্তিশূন্য) প্রশান্তাঃ (উপরতেন্দ্রিয়)-তে (এবম্ভূত) ধীরাঃ (অত্যন্ত বিবেকী) যুক্তাত্মানঃ (নিত্যসমাহিত স্বভাব ব্যক্তিগণ) সর্বগম্ (সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে) সর্বতঃ (সর্বত্র) প্রাপ্য (আত্মস্বরূপে পেয়ে) [দেহপাতকালেও] সর্বম্ এব (সর্বস্বরূপেই) আবিশন্তি (প্রবেশ করেন)।

ঋষিগণ এই আত্মাকে অবগত হয়ে কেবল জ্ঞানদ্বারাই তৃপ্ত হন, তাঁদের আত্মা পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে, তাঁরা আসক্তিশূন্য হন, তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। এইভাবে বিবেকী ও নিত্যসমাহিত ব্যক্তিরা সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে সর্বদিক থেকে লাভ করে সর্বস্বরূপে প্রবেশ করেন।

ঋষিরা অর্থাৎ আত্মার সাক্ষাৎকার করেছেন এমন ব্যক্তিরা তাঁকে অবগত হয়ে তাঁর স্বরূপেই প্রবেশ করেন, সর্বাত্মতা লাভ করেন। তত্ত্বজ্ঞ এই ঋষিদের প্রথম বিশেষণ দেওয়া হচ্ছে 'জ্ঞানতৃপ্তাঃ' —ভোগোপকরণ যাঁদের তৃপ্ত করতে পারে না, একমাত্র আত্মজ্ঞানের দ্বারাই যাঁরা তৃপ্ত হন। দ্বিতীয় বিশেষণ 'কৃতাত্মানঃ' —যাঁদের আত্মা পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এই জীবাত্মা পরিচ্ছিন্ন, অবিদ্যাবশত নানা আবরণের দ্বারা আবৃত বা মলিন হয়েছে। যখন সেই আবরণ দূর হয়, মলিনত্ব লোপ পায়, অবিদ্যা বিনষ্ট হয় তখন জীবাত্মা কৃতাত্মা হয়। সোনার উপর ধূলিমাটি প্রভৃতি মলিন পদার্থ পড়লে যেমন তার ঔজ্জ্বল্য প্রতিহত হয় তেমনি আত্মার উপর অনিত্যত্ব পরিচ্ছিন্নত্ব প্রভৃতি অনাত্ম ধর্মের আরোপ হওয়ায় তাঁর স্বস্বরূপ ব্যাহত হয়। বিচারের দ্বারা তপস্যার দ্বারা অনাত্মধর্মগুলিকে অপসারণ করতে পারলেই জীব কৃতাত্মা হয়। আত্মার বিকৃতরূপ ঘুচে গিয়ে স্বস্বরূপের প্রকাশ —এরই নাম কৃতাত্মা হওয়া। এই কৃতাত্মা ব্যক্তিগণ তখন 'বীতরাগাঃ' ও 'প্রশান্তাঃ' হন। বীতরাগ মানে অনাসক্ত। বীতরাগ কেন? কারণ সকল বিষয়ের প্রতিই তখন অনাসক্তি এসেছে। ব্রহ্মবস্তুকে প্রাপ্ত হয়ে তাঁদের অন্য সকল বস্তুকেই তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আর বীতরাগ ব্যক্তি সর্বদাই প্রশান্ত, প্রকৃষ্টরূপে শান্ত, তাঁর ইন্দ্রিয়াদি উপরত অর্থাৎ বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। প্রশান্ত মানে সর্বপ্রকার বিকার ও চঞ্চলতার নিবৃত্তি।

'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে॥' (৩।২।৬)

বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিত-অর্থাঃ (বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁদের উত্তমরূপে নিশ্চিত হয়েছেন), সন্ন্যাস-যোগাৎ (সর্বকর্মত্যাগপূর্বক কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া রূপ যোগাবলম্বনে) শুদ্ধসত্ত্বাঃ (যাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত হয়েছেন), যতয়ঃ (যাঁরা যত্নশীল) ব্রহ্মলোকেষু পর অমৃতাঃ ([জীবদবস্থায়ই] ব্রহ্মরূপ লোকে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত, একাত্মভূত হয়ে) তে সর্বে (তাঁরা সকলে) পর-অন্ত-কালে (উত্তম বা চরম দেহত্যাগকালে) পরিমুচ্যন্তি ([দেশান্তরে না গিয়েও] সর্বত্র [প্রদীপনির্বাণবৎ] ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন)।

বেদান্তবিজ্ঞান বিষয়ে অর্থাৎ পরমতত্ত্বে যিনি সুনিশ্চিত হয়েছেন, সন্ন্যাস অবলম্বনে যে যোগী শুদ্ধচিত্ত হয়েছেন —এঁরা সবাই দেহত্যাগকালে পরম অমৃত লাভ করেন এবং মুক্তিপ্রাপ্ত হন।

যতি বা যত্নশীল ব্যক্তিগণ পরান্তকালে, দেহত্যাগকালে বা পরম মুক্তিকালে 'পরামৃতাঃ' —পরম অমৃত লাভ করে 'পরিমুচ্যন্তি' —মুক্তি প্রাপ্ত হন। মুক্তি-লাভকালে আত্মা অনাত্মধর্ম থেকে মুক্ত হন। মৃত্যুর পর আত্মার কি হয়, সে কোথায় যায় এ বিষয়ে বিভিন্ন উপনিষদে আলোচনা আছে। বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মজ্ঞানীর মৃত্যু প্রসঙ্গে আর্তভাগ প্রশ্ন করছেন— 'যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো৩ নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে॥' (৩।২।১১) —যখন জ্ঞানী পুরুষ মৃত্যুগ্রস্ত হন তখন তাঁর প্রাণসমূহ দেহ থেকে উৎক্রমণ করে কি না? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বললেন, না। প্রাণসমূহ এখানেই লয়প্রাপ্ত হয়। তাঁর দেহ ফুলে ওঠে বায়ুর দ্বারা পূর্ণ হয় এবং তা মৃত অবস্থায় নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোমরূপ যে পাঞ্চভৌতিক উপাদানে দেহ গঠিত সেগুলি মূল কারণে মিশে যায়। সাধারণ জীবের মৃত্যুকালে জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়গুলিও সূক্ষ্মরূপে উৎক্রান্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে তো আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রে সকল কার্যের কারণ পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ প্রাপ্ত হয়ে তাঁতেই বিলীন হয়ে যায়। জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম—মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে— এইভাবে বিলীন হয়। এইভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা আত্মাতে যে আবরণ ছিল সেগুলি দূর হয়ে যাওয়ায় আত্মা পরমাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ মুক্ত হওয়ার পর আত্মার যে কোন পরিবর্তন ঘটে তা নয়। কতকগুলি বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা জড়িয়ে রাখা হীরক খণ্ড আবৃত ও অনাবৃত উভয় অবস্থাতে যেমন একই, এক্ষেত্রেও তাই বুঝতে হবে। যা পরিবর্তন তা শুধু দ্রষ্টার দিক থেকেই, স্বরূপত নয়। আত্মার উপাধিগুলি দূরীভূত হয় এইমাত্র। যে গুণগুলির জন্য বস্তুর মূল রূপটি ঢাকা পড়ে যায় তাকেই বলে উপাধি। 'উপগম্য আধীয়তে স্বান্ ধর্মান্ অন্যত্র' —যে নিজের ধর্মসমূহকে অপরের উপর আরোপিত করে তার নাম হলো উপাধি। আত্মার উপাধি হলো তাঁর উপর অনাত্ম জড় বস্তুর ধর্মের আরোপ। জীবাত্মার এই উপাধি যখন দূর হয়ে যায়, 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি লোপ পায় তখন তাকে বলি মুক্ত। প্রকৃতপক্ষে আত্মা তো সর্বদাই মুক্ত কিন্তু তা আমাদের অনুভবের এবং বিচারের দ্বারা জানা

নিয়েই কথা। শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব আত্মাকে যখন আমরা পরিচ্ছিন্ন পরিণামী বা বিকারী বলে ভাবি তখনই সে বদ্ধ হয়। সেই ভাবা রোধ করার জন্য চাই অনুভব ও বিচার। এটি সর্প নয় রজ্জু এ-কথাটি মনে হলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, আলো এনে সত্যাসত্য নিরূপণ করলে তবেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যাঁরা positivist, অর্থাৎ অত্যন্ত বাহ্যবস্তুবাদী তাদের মতে ব্রহ্মবস্তু কল্পনা মাত্র। শোনা যায় আজকাল একপ্রকার মাদক দ্রব্য পাওয়া যায় যেটি খেলে নিজের একটা সম্প্রসারণের (expansion) অনুভূতি হয়। যাই হোক এ বিষয়ে বিচারের অবকাশ আছে। যে স্থূল বাহ্য জগৎটিকে সত্য বলে ধরে নিয়ে লোকব্যবহার চলছে তাকে সত্য বলে ধরে নেবার কোন যুক্তি নেই, এই হলো শাস্ত্রের মত। সুতরাং প্রয়োজন বিচারের। প্রত্যক্ষ অনুভব হলেও এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারও মতে এই জগতের মধ্যে আমাদের মনের অবদান কতখানি তা ভেবে দেখতে হবে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা জগৎকে যেরকম দেখি যার চারটি ইন্দ্রিয় আছে সে তার থেকে ভিন্ন ভাবে দেখে। আবার ছয়টি ইন্দ্রিয় থাকলে দেখবে আর একরকম। জগতের প্রকাশ যদি এইরকম ইন্দ্রিয়নির্ভর হয় তবে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ আত্মা সম্বন্ধে কিছু কি নিশ্চয় করে বলা যায়? কেউ বলেন, পরিদৃশ্যমান এই জগতের কিছুটা সত্য কিছু কাল্পনিক। এই যে সামনে একটি বস্তু দেখছি বিজ্ঞানের ভাষায় এর অর্থ এই যে, এ থেকে কতকগুলি আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং সেই রশ্মিগুলি চোখের মধ্য দিয়ে গিয়ে অক্ষিপটে (Retina) স্পন্দন সৃষ্টি করছে, যার ফলে দৃষ্ট বস্তুর অনুভূতি হচ্ছে। এ অনুভূতি কোন বিশেষ আকারের নয় কিন্তু মনের অভিক্ষেপ (projection) বশত এটি লম্বা বা গোল বা অন্য কিছু বলছি। আমরা কোন বস্তুকে দেখি তার গুণের সাহায্যে। এই গুণগুলির কতকগুলি মৌলিক, কতকগুলি গৌণ (Secondary)। মৌলিক যেগুলিকে বলছি তাদের মৌলিকত্ব নিয়েও সংশয় আছে কেন না কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে মৌলিক বলে কোন গুণই নেই। কোন কোন দার্শনিকের মতে বস্তু একটি আছে সত্য কিন্তু তা চিরকালই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। আবার তাকে মানার প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবে বহু দার্শনিক স্বীকারই করতে চান না। এই বিভিন্ন কূট প্রশ্নের আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় যে, দর্শন বা বিজ্ঞান কেউই জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ দিতে সমর্থ নন। প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করার জন্য বাহ্যজগৎকে বিশ্লেষণ করতে করতে এঁরা বহুদূর গিয়েছেন সত্য কিন্তু অন্ত এখনো পাননি, পাবেন বলে ভরসা রেখেছেন।

আর আমাদের শাস্ত্র অন্য পথে গিয়ে বিচার করে দুটি তত্ত্বের কথা বলেছেন —একটি দ্রষ্টা অপরটি দৃশ্য। এই দৃশ্য জগৎকে বিচার করতে করতে ক্রমশ স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে কারণে, কারণ থেকে মহাকারণে যাবার কথা বলেছেন। যত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অবস্থায় যাচ্ছি তত বৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে এবং শেষে থাকছে শুধু এক অব্যাকৃত অবস্থা বৈচিত্র্যহীন অনভিব্যক্ত অবস্থা। আর দ্রষ্টাকে নিয়ে বিচার করতে করতে তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন একটি চৈতন্যে যার ভিতরে স্বরূপত কোন পার্থক্য নেই কিন্তু পার্থক্য সৃষ্টি করছে এই আমিত্ব। অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয়ে চৈতন্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হচ্ছে। এই যে আমি ও আমার জগৎ এই দুটি বস্তু ক্রমশ এক চৈতন্যেই পর্যবসিত হচ্ছে, শেষপর্যন্ত একটিই দেখা যাবে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের বিচারে দ্রষ্টা ও দৃশ্য চলছে সমান্তরাল রেখায়, জ্ঞানীর অনুভবে তাদের সেই অন্তরালটি ঘুচে গিয়ে দুই-ই মিলেছে এক শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপে। সেই শুদ্ধ চৈতন্যের উপর অবিদ্যা প্রতিফলিত হওয়ায় তার বিভিন্ন রূপ দেখাচ্ছে। যদিও অবিদ্যাকে কারণ বলেছি কিন্তু তাকে আমরা চৈতন্য থেকে পৃথক সত্তাবিশিষ্ট বলতে পারি না। পৃথক সত্তা স্বীকার করলে এই দোষ হয় যে, আলোক ও অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞানের একত্র অবস্থান মানতে হয় যা অসম্ভব। সুতরাং অজ্ঞানের অনুভব কোনরূপে সম্ভব নয়। যুক্তির দিক দিয়ে এ-কথা সত্য হলেও জ্ঞানী দ্বৈতভূমি অতিক্রম করে অদ্বৈতভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর যে অনুভবের কথা বলেন তাকে অস্বীকার করা চলে না। অথচ অনুভূত বস্তু যুক্তিবিরোধী হলে তাকে মানাও যায় না।

‘গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্বে প্রতি দেবতাসু।
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি॥’ (৩।২।৭)

পঞ্চদশ কলাঃ (দেহারম্ভক প্রাণাদি পঞ্চদশ অবয়ব) প্রতিষ্ঠাঃ (স্ব স্ব কারণে) গতাঃ (গত হয়), সর্বে (সকল) দেবাঃ চ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও) প্রতি দেবতাসু (মূল দেবতা আদিত্যাদিতে) [গমন করেন]; কর্মাণি (অপ্রবৃত্ত ফল, সঞ্চিত কর্মসমূহ) চ (এবং) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধিতে উপহিত) আত্মা (জীবাত্মা) সর্বে (সর্বস্বরূপ) পরে (সর্বোত্তম) অব্যয়ে (অক্ষর ব্রহ্মে) একী-ভবন্তি (অবিশেষতা প্রাপ্ত হন)।

প্রাণাদি পঞ্চদশ কলা যে কারণগুলি থেকে এসেছে, সেই কারণগুলিতে তারা সব ফিরে যায়। দেবতারা ফিরে যান পতিদেবতাতে। (সঞ্চিত) কর্মসমূহ ও অন্তঃকরণ এবং উপাধি-পরিচ্ছিন্ন আত্মা এক অব্যয় স্বরূপে একীভূত, অভিন্ন হয়ে যায়।

কলা মানে অংশ। যে পঞ্চদশ অংশ দিয়ে দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট পুরুষ শব্দাদি অনুভব করছে সেই অবয়বগুলিকে বলা হচ্ছে কলা বা অংশ। 'পঞ্চদশ কলাঃ প্রতিষ্ঠা গতাঃ' —যাদের থেকে তারা এসেছে, যা তাদের কারণ সেই কারণে তারা সব ফিরে যায়। দেবতারা সব প্রতিদেবতাতে ফিরে যান। দেবতা বলতে ইন্দ্রিয়ে অভিমানী দেবতা। ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়গ্রহণ-শক্তি তাকে বলছেন তদভিমানী দেবতা, তাঁরা সব স্বস্বরূপে ফিরে যান অর্থাৎ বাক্ ইন্দ্রিয় যায় অগ্নিতে, দর্শন ইন্দ্রিয় সূর্যে, এইরকম প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক যে দেবতা আছেন তিনি তাঁর কারণে ফিরে যান অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হন। জীবের ভালমন্দ কর্ম যা কিছু সঞ্চিত আছে সেগুলিও তখন তার কারণ যে অহং-জ্ঞান সেই কারণে ফিরে যায়। আর বিজ্ঞানময় আত্মা মানে অন্তঃকরণ ও উপাধি পরিচ্ছিন্ন আত্মা, যে আত্মা বোধ করছে আমি অমুক ব্যক্তি, পরিচ্ছিন্ন হয়ে যে আত্মা প্রতীত হচ্ছে সেই পরিচ্ছিন্ন আত্মা এক অব্যয় স্বরূপে একীভূত, অভিন্ন হয়ে যায়, তাতে মিশে যায়। এই পঞ্চদশ কলা সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদে উল্লেখ আছে— 'স ঈক্ষাং চক্রে —কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি॥' (৬।৩)— সেই পুরুষ— 'ঈক্ষাং চক্রে' —দর্শন করলেন অর্থাৎ চিন্তা করলেন, কে শরীর ত্যাগ করে গেলে আমি শরীর ত্যাগ করে যাব, কে শরীরে প্রতিষ্ঠিত থাকলে আমি শরীরে প্রতিষ্ঠিত থাকব— এই বলে প্রশ্ন করছেন। তার উত্তরে বলছেন, তিনি প্রথমে প্রাণ সৃষ্টি করলেন, প্রাণ থেকে শ্রদ্ধাকে, শ্রদ্ধা থেকে আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী ও অন্নকে। অন্ন থেকে বীর্য শক্তি তপস্যা মন্ত্র কর্মসমূহ লোকসমূহ এবং বিভিন্ন লোকে অবস্থিত নামরূপাদি সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে সৃষ্টি করার কথা এখানে বর্ণনা করা হলো। কেন? এই বিভিন্ন সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন সেই আত্মা এই বিভিন্ন পদার্থগুলি থেকে পৃথক। দেহ ইন্দ্রিয়াদি যা কিছু আমাদের ব্যক্তিত্বকে গড়েছে সেই ব্যক্তিত্বের সবগুলি হলো আমার উপাধি মাত্র, বাস্তবিক আত্মা কিছুই করেন না বা কোন বস্তুর দ্বারা বিকৃত হন না। তবে এই যে সব জগতের বস্তুর উল্লেখ করা হলো তার দ্বারা বোঝাচ্ছে যে, আত্মার উপর এই সব বস্তুর ধর্ম আরোপিত হয়েছে। আরোপের জন্য আত্মাকে এই সব গুণবিশিষ্ট বলে মনে হচ্ছে কারণ আমরা আত্মার সঙ্গে এদের অভিন্ন করে ফেলেছি। আত্মা থেকে এদের সৃষ্টি হয়েছে মানে এই নয় যে, আত্মা এইগুলি বসে বসে তৈরি করেছেন। এই বিষয়গুলি আত্মার উপরে আরোপিত হয়েছে। সে আরোপের কারণ অজ্ঞান। কাজেই এক

হিসাবে অজ্ঞানের সৃষ্ট এই জগৎ। কিন্তু অজ্ঞান অভাব বস্তু তার থেকে কোন ভাব বস্তুর উৎপত্তি হয় না। অজ্ঞান যখন কোন চেতনকে আশ্রয় করে থাকে, চেতনের উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয় তখনই সে সৃষ্টি করে।

ব্রহ্ম যখন জীবভাবাপন্ন হচ্ছেন— তিনি ইচ্ছা করলেন, আমি এইসব সৃষ্টি করব, তারপর তিনি সব সৃষ্টি করলেন। জগৎ সৃষ্টি মানে তাঁর উপরে জগৎ আরোপিত হলো। কোথা থেকে আরোপিত হলো? অজ্ঞান থেকে। যদি ব্রহ্মকে সমস্ত উপাধিবর্জিত রূপে জানি তাহলে তাঁর উপরে উপাধি আরোপ করা যায় না, আমরা ভ্রান্ত হয়ে তাঁকে উপাধি ধর্মবিশিষ্ট বলে মনে করি। যেমন আত্মাকে দেহধর্মবিশিষ্ট বলে মনে করে বলছি যে, আমরা স্থূল আমরা কৃশ। এগুলি শরীরের ধর্ম, আত্মার নয়। অন্ধত্ব মূকত্ব প্রভৃতি অক্ষমতা আত্মার উপর আরোপ করে বলছি আমি অন্ধ আমি মূক আমি বধির। ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা আত্মাতে আরোপিত হচ্ছে। এইরকম যে পঞ্চদশ কলা বলছেন তার সবগুলি পুরুষের উপর আরোপিত।

আগের শ্লোকে বলেছেন, যখন বেদান্ত বিজ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বকে নিশ্চয় করা হলো তারপরে সর্বত্যাগ করে কেউ যখন অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করল তখন সে ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, হয়ে মৃত্যুর পর সে মুক্ত হয়ে যায়। তার মানে এই নয় যে, মৃত্যুকালে মুক্ত হবে। অজ্ঞান যখনই দূর হয় তখনই মুক্ত হয়ে যায়। অজ্ঞানের দ্বারা নিজেকে আচ্ছন্ন মনে করা, স্বস্বরূপ ভুলে যাওয়া, এটিই মৃত্যু। আর যখন ভ্রান্তি দূর হয়ে স্বরূপের জ্ঞান হয় তখন মুক্তি হয়। এই মুক্তির অবস্থাকেই পরান্তকাল বলা হয়। অন্তকাল মানে মৃত্যুকাল আর পরান্তকাল মানে যার পরে আর মৃত্যু হবে না, মৃত্যু ব্রহ্মের সম্বন্ধে অজ্ঞতা। ব্রহ্মের উপরে, আত্মার উপরে আমরা জগৎ অধ্যাস আর করব না। আত্মাকে যেমন শরীরধারী ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলে মনে করছি তা আর করব না। তাই বলছেন, যখন সেইভাবে আমাদের স্বরূপের জ্ঞান হবে তখন আমাদের যত কিছু উপাধি সেগুলি আমাদের মধ্যে লয় হবে। উপাধিগুলিকে এখানে কলা বলছেন। কলা বা অংশগুলি চৈতন্যকে পরিচ্ছিন্ন করছে, এইজন্য তারা উপাধিবিশিষ্ট। বাস্তবিক পরিচ্ছিন্ন করতে পারে না কিন্তু পরিচ্ছিন্নের মতো দেখায়, এইজন্য বলছেন তারা উপাধি। সেই উপাধিগুলি সব যার যার স্বরূপে ফিরে যায়। স্থূলগুলি সূক্ষ্মে লয় হয়, পঞ্চভূত থেকে যা সৃষ্ট হয়েছে সব সেই ভূতে লয়প্রাপ্ত হয়। যখন ইন্দ্রিয়গুলি অব্যয় পুরুষে লয় হয় তখনই জীবের মুক্তি।

যেসব উপাধি ব্রহ্মের উপরে আরোপিত হচ্ছে সেগুলি মৃত্যুকালে অর্থাৎ মুক্তিকালে কোথায় যায়? তারা যার যার স্বরূপে ফিরে যায় অর্থাৎ সব অজ্ঞানে ফিরে যায়। সেই অজ্ঞানটি কি? না, আত্ম বিষয়ক অজ্ঞান। ফিরে যায় মানে কি? তাঁর থেকে তাদের আর পৃথকত্ব থাকে না। এই ফিরে যাওয়া মানে সব তাঁতে লয় হয়ে যাওয়া, কেবল পুরুষ শুদ্ধরূপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রইলেন। মেঘ সরে গেলে সূর্য আপনি প্রকাশিত থাকে, সূর্যকে আর বাতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় না। সেইরকম উপাধিগুলি যখন আত্মা থেকে সরে যায় তখন আত্মাকে আর অন্য বস্তুর দ্বারা প্রকাশ করতে বা অন্য জ্ঞানের দ্বারা জানতে হয় না কারণ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ কেন বলে? এ সম্বন্ধে বেদান্তের যথেষ্ট যুক্তি আছে। আমরা দেখছি আমাদের যত কিছু জ্ঞান হচ্ছে তা বস্তুজ্ঞান। বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে আমরা জানি তাতে জ্ঞানের প্রকাশ হচ্ছে বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরূপে। যেমন, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ— এই বস্তুগুলি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রকাশিত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়গুলি আবার তাদের সূক্ষ্ম উপাদান থেকে আবির্ভূত হচ্ছে। সূক্ষ্ম উপাদানগুলি তাদের উপাদানকারণ থেকে আসছে। এইরকম করে করে যিনি পরম তত্ত্ব, অব্যয় আত্মা, মুক্তিকালে তাঁতে সকলে এক হয়ে যায় অর্থাৎ লয় হয়ে যায়। আমরা যখন দড়িকে চিনতে পারি তখন বলি, এটি দড়ি, সাপ নয়, সাপ বলে দেখছিলাম। সাপটি কোথায় গেল? সাপের কারণ যে অজ্ঞান সে অজ্ঞানে ফিরে গেল। অজ্ঞান তার উপাদান, অন্য উপাদান আর কিছু ছিল না। ঠিক এইরকম, জীবের এই সমস্ত উপাদান যারা অজ্ঞান থেকে সৃষ্ট তারা সেই অজ্ঞান স্বরূপে ফিরে যায়। আর অজ্ঞান কোথায় যায়? অজ্ঞান ছিলই না তা যাবে কোথায়? অজ্ঞান ছিল না কেবল আছে বলে মনে হচ্ছিল। সুতরাং যার উপরে অজ্ঞান আধারিত হচ্ছে তাতে ফিরে গেল অর্থাৎ লুপ্ত হয়ে গেল। জ্ঞানস্বরূপ তখন নির্বিঘ্নে অবাধরূপে প্রকাশিত রইল। এই হলো মুক্তির অবস্থা। মুক্তির অবস্থা বলার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই, বিচার করে এই সব উপাধিগুলিকে আমার থেকে ভিন্ন, আত্মা থেকে ভিন্ন বলে জানতে হবে। জানতে হবে যে উপাধিগুলি আত্মার উপরে আরোপিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, বাস্তবিক এদের ধর্মের দ্বারা আত্মা ধর্মবান হচ্ছেন না। পঞ্চদশ কলা তাদের প্রতিষ্ঠায় ফিরে গেল মানে যে ক্রমে জগতের সৃষ্টি দেখানো হয়েছে সেই ক্রমে স্থূল জগৎ ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে হতে সেই পরম কারণ যে অজ্ঞান তাতে ফিরে যাচ্ছে। অজ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে কারণ নয়, উপাধি চৈতন্যে উপহিত না

হয়ে প্রকাশ পায় না। কাজেই তারও প্রকাশ হচ্ছে চৈতন্যের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে। অর্থাৎ চৈতন্য প্রকাশমান, তার থেকে ধার করা আলোতে এরা প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং এই সব ব্যভিচারী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল অবয়বগুলি তাদের মূল কারণ অজ্ঞানে ফিরে যায়। তাই এখানে বলছেন, 'গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্বে প্রতি দেবতাসু' —ইন্দ্রিয়গুলি তাদের অভিমানী যে সব দেবতা যাঁদের থেকে তারা এল সেই মূল শক্তিতে ফিরে গেল। মূল শক্তি বলতে এই বোঝাচ্ছে যে, একই শক্তি, তা দর্শনশক্তি শ্রবণশক্তি ইত্যাদি বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, তার মূল হলো সেই অনভিব্যক্ত এক অজ্ঞান। সেই মূল অজ্ঞান হলো পরম কারণ। তবে আগেই বলা হয়েছে কেবল মূল অজ্ঞানকে পরম কারণরূপেও বলা যায় না। কেন না মূল অজ্ঞান চৈতন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হলে, তার আলোকে আলোকিত না হলে তারও প্রকাশ হয় না। এইজন্য বলছি সকলে সেই এক তত্ত্বে ফিরে গেল।

এক হয়ে গেল মানে কি? না, ভিন্নরূপে তার যে প্রতীতি হচ্ছিল সেই প্রতীতিগুলি দূর হয়ে গেল। ইন্দ্রিয়গুলি তাতে লয় পেল মানে ইন্দ্রিয়গুলি রইল তাদের কারণ রূপে। যেমন দর্শন ইন্দ্রিয়ের কারণ হচ্ছে সূর্য, অর্থাৎ সূর্যাভিমানী দেবতা, যে দেবতা সূর্যকে প্রকাশ করেন সেই দেবতার প্রকাশ হচ্ছে এক জ্ঞানের দ্বারা। সুতরাং এইভাবে পরস্পর আরোপ হয়ে হয়ে জগৎ বৈচিত্র্য আমাদের কাছে অনুভূত হচ্ছে। জগৎ বৈচিত্র্যের আবার ঐ বিপরীত ক্রমে লয় হবে অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্মে লয় হবে, সূক্ষ্ম কারণে এবং কারণ মহাকারণে লয় হবে। তখন কি হবে? 'পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি' —সকলে সেই পরম অব্যয় মানে অবিনাশী অপরিবর্তনশীল অপরিণামী যে তত্ত্ব তাতে এক হয়ে, লীন হয়ে যাবে। সব অধ্যারোপের তাতে নিবৃত্তি হবে। তখন কি থাকবে? এক সূর্যই থাকবে অর্থাৎ এক প্রকাশ-স্বরূপ আত্মাই থাকবেন।

সেইজন্য আবার পরের শ্লোকটিতে বলছেন—

'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽ-
স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥' (৩।২।৮)

স্যন্দমানাঃ (প্রবাহমান) নদ্যঃ (নদীসমূহ) যথা (যদ্রূপ) নামরূপে (নাম ও রূপ) বিহায় (ত্যাগ করে) সমুদ্রে (সাগরে) অস্তম্ গচ্ছতি (অবিশেষাত্মভাব প্রাপ্ত হয়), তথা

(তদ্রূপ) বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্) নামরূপাৎ (নাম ও রূপ থেকে) বিমুক্তঃ (বিমুক্ত হয়ে) পরাৎ (অব্যাকৃত থেকে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) দিব্যম্ (স্বপ্রকাশ) পুরুষম্ (পূর্ণকে, পরমাত্মাকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন)।

প্রবহমান নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ ত্যাগ করে সমুদ্রের সঙ্গে একতা প্রাপ্ত হয়, সেইরকম জ্ঞানী-পুরুষ নাম-রূপ থেকে মুক্ত হয়ে পরাৎপর শ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তাঁকে প্রাপ্ত হন।

প্রবহমান নদীসমূহ নাম ও রূপ ত্যাগ করে সমুদ্রের সঙ্গে একতা প্রাপ্ত হয়— 'সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি'। সমুদ্রে গিয়ে পড়লে কেউ আর এই নদীর জল সেই নদীর জল বলে না সবই তখন সমুদ্র হয়ে যায়। তাদের স্বতন্ত্র নাম বা রূপ কিছুই থাকে না। তারা সমুদ্রে অস্ত যায় অর্থাৎ তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে, পৃথক সত্তা থাকে না তবে নদীর জলরাশি সমুদ্রে গিয়ে পড়লে তাকে আর নদীর জল বলি না বটে কিন্তু জলগুলি কি বিনষ্ট হয়? হয় না। তাদের মূল স্বরূপ যা তাতেই পরিণত হয়। সমুদ্রের জল সূর্যের আকর্ষণে মেঘ হয় তার থেকে বৃষ্টি হয় সেই জলধারা পর্বত শিখর থেকে সমতল ভূমিতে নেমে আসে। তারপর নানা জনপদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুমদ্রে গিয়ে মিলিত হয়। সমুদ্রে পড়বার আগে পর্যন্ত তার একটা নাম ছিল রূপও ছিল। কিন্তু সমুদ্রে পড়লে নাম রূপ কোনটাই রইল না, সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে গেল।

সেইরকম জ্ঞানী পুরুষ নামরূপ থেকে মুক্ত হয়ে সেই পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হন। পর থেকেও পর, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম, কারণ থেকেও কারণ যে পরমতত্ত্ব তাঁকে তিনি 'উপৈতি'— প্রাপ্ত হন।

পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া মানে কি? না, পূর্বের যে পুরুষটি তিনি সেই স্বরূপতা প্রাপ্ত হলেন। জলরাশি সমুদ্রেই ছিল, সূর্য তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে বর্ষণ করল। আবার যখন তা সমুদ্রে পড়ল তখন যা ছিল তাই রইল, কোন পরিবর্তন হলো না। তেমনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়াও কোন অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি নয়। আমরা ব্রহ্মকে সর্বদা পেয়েই আছি কারণ তিনিই আমাদের স্বরূপ। কিন্তু আমরা মিথ্যা নামরূপ যুক্ত হয়ে যেন ব্রহ্ম থেকে পরিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছি, এইজন্য আমাদের অমুক অমুক ব্যক্তি বলা হয়। কেউ অজ্ঞান, মুমুক্ষু, জ্ঞানের পথে গিয়ে সে যখন জ্ঞানলাভ করে তখন তার কি হয়? তার পরিচ্ছেদের যেগুলি কারণ সেগুলি অন্তে লয় হয়ে যায়। আমরা যে পুরুষ থেকে জগৎ কল্পনা করছি সেই পুরুষে এই কল্পিত রূপ বিলীন হলো। দড়িতে সাপের কল্পনা করছিলাম, সাপটা

কোথায় গেল? দড়িতে রূপান্তরিত হলো, দড়ির সঙ্গে এক হয়ে গেল। দড়ির সঙ্গে এক হয়ে গেল মানে সাপটি কি দড়ি হয়ে গেল? তা তো হয় না, দড়ি এবং সাপ দুটি স্বতন্ত্র বস্তু। আধারের উপর উপাধি আরোপিত হয়ে সাপ-রূপ দেখাচ্ছিল। এখন, সেই সাপ গেল কোথায়? সাপের কারণ রজ্জুবিষয়ক যে অজ্ঞান —সেই অজ্ঞানে তার লয় হলো। তারপরে অজ্ঞান কোথায় গেল? অজ্ঞানের পৃথক অস্তিত্ব ছিল না, কোনকালেই থাকে না। অজ্ঞানের 'এক' জ্ঞানে পরিসমাপ্তি। সেই রকম পরাৎপর যে পুরুষ, যিনি শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম, কারণেরও কারণ তাঁতে এই উপাধিগুলি এক হয়ে যায়, লয় হয়ে যায়।

উপনিষদের মূল তাৎপর্য এইটি। উপনিষদ্ আমাদের শেখাচ্ছেন যে, তোমার ভিতরে তুমি বলে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নেই। 'তুমি' শুদ্ধ চৈতন্যের উপর দেহাদির আরোপবশত যেন চৈতন্য থেকে ভিন্ন একটি বস্তু। তুমি শুদ্ধ চৈতন্য, তাতে এই দেহাদির আরোপবশত নিজেকে দেহাদিবান মনে করছ। তুমি দেহধারী, তোমার জন্ম হয়েছে, মৃত্যু হবে; তুমি পুরুষ তুমি স্ত্রী, তুমি জ্ঞানী, তুমি অজ্ঞান এইরকম বিভিন্ন প্রকারের উপাধি ব্রহ্মবস্তুর উপর আরোপিত হচ্ছে। আরোপিত বস্তু ব্রহ্মকে বিকৃত করে না। যদি ব্রহ্মে বাস্তবিক অজ্ঞান থাকত তাহলে তা ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করতে পারত। তা পারে না। অন্ধকার কখনো আলোকে ঢেকে দিতে পারে না, কাজেই অজ্ঞান ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। কিন্তু আমরা অজ্ঞানসৃষ্ট জীবত্ব ভাবাপন্ন ব্যক্তি এটি মনে রাখতে হবে। ব্রহ্ম থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা একটি ব্যক্তিরূপে রয়েছি, আমাদের স্বরূপকে জানলে ব্যক্তির উপাধিগুলি পরম তত্ত্বে লয় হয়ে যায়। অজ্ঞান জ্ঞানে লয় হয় অর্থাৎ জ্ঞান হলে আর অজ্ঞান থাকে না। অন্ধকার ঘরে আলো নিয়ে গেলাম, তখন অন্ধকার কোথায় গেল? অন্ধকার মানে আলো বিষয়ক অজ্ঞান, সেই অজ্ঞান আলো আনতে দূর হয়ে গেল। আলো অন্ধকারের মতো ব্রহ্ম আর অব্রহ্ম, জ্ঞান এবং অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। জ্ঞানে পৌঁছালে অজ্ঞান লয় হয়ে যায়। জগতে যা কিছু দেখছি— বাইরের বা অন্তরের বস্তু, এমনকি আমি পর্যন্ত সমস্তই ব্রহ্মের উপর আরোপিত কতকগুলি কল্পনা। এই কাল্পনিক বস্তুগুলি জ্ঞানের সময় কি হয়? স্থূল সূক্ষ্মে লয় হয়, সূক্ষ্ম কারণে লয় হয়, এইরকম লয় হতে হতে যিনি অন্তিম জ্ঞানস্বরূপ তাঁতে সব কিছু লয় হয়। অর্থাৎ তাঁকে জানলে আর কোন উপাধি তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। দড়ি আধার, তাকে জানলে তার উপরে আর সাপের আরোপ রইল

না। সেইরকম আমার স্বরূপকে যখন জানব তখন আমার উপরে দেহাদি কোন বস্তু আর আরোপিত হবে না। নামরূপ থেকে আরম্ভ করে জগৎপ্রপঞ্চ সব যত কিছু অজ্ঞানের কার্য সমস্তই জ্ঞানে লয় হয় মানে তাদের অস্তিত্ব আর থাকে না। তাই বলছেন এখানে— 'পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি'— সেই পরম অপরিণামী যে সত্তা তাঁতে সব এক অর্থাৎ অভিন্ন হয়ে যায়।

তারপরে বলছেন এই ব্রহ্মজ্ঞানের ফল কি—

'স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥' (৩।২।৯)

যঃ হ বৈ (যে কেহই) তৎ (সেই) পরমম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মাই) ভবতি (হয়ে থাকেন); অস্য (এঁর) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ (অব্রহ্মজ্ঞ) ন ভবতি (হয় না); [তিনি] শোকম্ (মানস সন্তাপ) তরতি (অতিক্রম করেন), পাপ্মানম্ (পাপ) তরতি (অতিক্রম করেন); [তিনি] গুহাগ্রন্থিভ্যঃ (হৃদয়স্থ অবিদ্যাগ্রন্থিসমূহ থেকে) বিমুক্তঃ (নির্মুক্ত হয়ে) অমৃতঃ (অমর) ভবতি (হন)।

পরম তত্ত্বকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রহ্ম হয়ে যান। তাঁর কুলে কেউ অব্রহ্মবিৎ জন্মায় না। সেই ব্যক্তি শোক-দুঃখ-পাপ-তাপ থেকে মুক্ত হন। তিনি গুহাগ্রন্থিসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে অমরণধর্মী হন।

বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নরূপে পরম তত্ত্বকে জানবার চেষ্টা করছে, করে কেউ কেউ পরম তত্ত্বকে জানলেন; যিনি জানলেন 'স ব্রহ্মৈব ভবতি' —তিনি ব্রহ্মাই হয়ে যান। ব্রহ্ম হয়ে যান মানে ব্রহ্ম ছিলেনই, উপাধির আরোপগুলি তখন তাঁর থেকে দূর হয়ে যায়। এইজন্য বললেন, 'ব্রহ্মৈব ভবতি'। 'ন অস্য অব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি' —এইটি হলো অর্থবাদ, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসাবাচক। এই ব্রহ্মবিদের কুলে আর অব্রহ্মবিৎ কেউ জন্মায় না। এখানে প্রশ্ন উঠবে একজন ব্রহ্মবিৎ হলো বলে তাঁর বংশে সবাই ব্রহ্মবিৎ হবে? তা নয়। তাঁর আর কুল বলে কিছু থাকে না। তাৎপর্য বোঝাবার জন্য বলছেন, যদি একজন ব্রহ্মজ্ঞ হন তাঁর পরবর্তী শিষ্যেরা যারা ব্রহ্মের পথের অনুসরণ করে তারা যেন ব্রহ্মকুল, সেই কুলে আর অব্রহ্মবিৎ কেউ থাকে না। তারা সকলেই সেই ব্রহ্ম স্বরূপতাই প্রাপ্ত হয়। তখন সেই ব্যক্তি 'তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং' —শোক দুঃখ পাপ তাপ থেকে মুক্ত হন। পাপ মানে যার ফলে জীব বিভিন্নরূপে জন্ম নেয় সেগুলি থেকে মুক্ত

হন। 'গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ' —গুহাগ্রন্থিসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি 'অমৃত' —অমরণধর্মী হন। গুহাগ্রন্থি অর্থ হৃদয়ের মধ্যে শুভাশুভ সংস্কারজনিত যে বাসনাসমূহ, সেগুলি থেকে তিনি মুক্ত হন। কেন মুক্ত হন? না, যে তত্ত্বকে তিনি জেনেছেন সেই তত্ত্বের আলোকে সংস্কার বাসনাদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঐগুলি যেন আলোর নয়, অন্ধকারের ধর্ম। আলোর প্রকাশে অন্ধকার লয় হয়ে যাওয়ার মতো হৃদয়গুহাতে অবস্থিত যত কিছু বাসনা কামনা মলিনতা অব্রহ্ম সংস্কার সেগুলি থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যান। তারপরে অমৃত অমরণধর্মী হয়ে যান। অমরণধর্মী হয়ে যাওয়া মানে যে অমর ছিল তাই হয়ে যায়। সে অমৃতই ছিল, অজ্ঞানবশত নিজেকে মরণধর্মী বলে মনে করছিল, বার বার জন্মমৃত্যু প্রবাহের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছিল। যখন আত্মাকে জানা হলো তখন তার জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গেল। কারণ বাসনা থেকে জন্মাদি হয়। বাসনা চলে গেল, পুনরাবর্তনের চক্র থেকে মুক্তি পেল। বাসনা কেন চলে গেল? না, এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন বস্তু নেই তা জানলে কিসের বাসনা, কার বাসনা? যদি আমি ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন একজন পাশবদ্ধ জীব থাকতাম তাহলে আমার মধ্যে জগতের সুখভোগ করবার জন্য অনন্তপ্রকার চেষ্টা থাকত, তখন আমি আমার পৃথক সত্তা নিয়ে চলতাম। যখন ব্রহ্মসত্তায় আমার সত্তা লীন হয়ে গেল তখন আর অজ্ঞানরূপ মৃত্যুর কারণ কিছু রইল না। এখানে মৃত্যু মানে শুধু দেহ নাশ হওয়া নয় দেহের কারণ যা তারও নাশ। অজ্ঞানরূপ কারণ নাশ হয়ে গেল সুতরাং জীব তখন পরব্রহ্মে একীভূত হয়ে থাকে অর্থাৎ পরব্রহ্মে তার অবসান হয়। ঐ অবসান হলো নদীর নামরূপ নাশ হয়ে সমুদ্রে লীন হয়ে যাওয়ার মতো। নদীর জলের লোপ হয় না, নামরূপের দ্বারা তাকে বিভক্ত বলে মনে হচ্ছিল, সে বিভাগ সমুদ্রে গিয়ে লুপ্ত হয়ে গেল। নদী তখন সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে যায়। ব্রহ্মকে জানবার জন্য যে চেষ্টা করছে, যে মুমুক্ষু মুক্তি পেতে চায়, সে তখন সেই মুক্ত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই হলো অমৃত হওয়া। মানুষ অনেক সময় কল্পনা করে যে, দেহ অমর হবে। বলা হয় দেবতারা অমর কিন্তু ব্রহ্ম ব্যতীত কেউ অমর নয়। অমরত্বটি আমাদের কল্পনা। যখন ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ কিছু স্বীকার করছি, ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্নরূপে যে বস্তুটি দেখছি তা সর্বদাই মৃত্যুগ্রস্ত। কাজেই অমর কে হবে? যে অমর আছে সেই-ই অমর হবে অর্থাৎ মরণধর্মটি যে মিথ্যা সে বুঝতে পারবে। সুতরাং যে অমর ছিল তাই হয়ে গেল।

**'তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্—ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্।।' (৩।২।১০)**

তৎ (উক্ত ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক) এতৎ (এই সম্প্রদান বিধি) ঋচা (মন্ত্রে) অভ্যুক্তম্ (বলা হয়েছে) [যাঁরা] ক্রিয়াবন্তঃ (যথাবিধি কর্মপরায়ণ), শ্রোত্রিয়াঃ (বেদপরায়ণ), ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মোপাসক), শ্রদ্ধয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাশীল হয়ে) স্বয়ম্ (স্বয়ং) একর্ষিম্ (একর্ষি নামক অগ্নিকে) জুহ্বতে (= জুহ্বতি, আহুতি প্রদান করেন), যৈঃ তু (এবং যাঁদের দ্বারা) বিধিবৎ (যথাবিধি) শিরোব্রতম্ (মস্তকে অগ্নিধারণরূপ ব্রত) চীর্ণম্ (আচরিত হয়েছে), তেষাম্ এব (তাঁদেরই কাছে) এতাম্ (এই) ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) বদেত (বলবে)।

যাঁরা যথাশাস্ত্র কর্মানুশীলনে রত, বেদাভ্যাসকারী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, শ্রদ্ধাসহকারে একর্ষি নামক অগ্নিতে আহুতিদানকারী এবং যাঁরা যথাশাস্ত্র শিরোব্রত (মাথায় অগ্নিধারণরূপ ব্রত) অনুষ্ঠান করেন, তাঁদেরই ব্রহ্মবিদ্যা বলবে।

এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে কে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী। কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা নয়, যে কোন বিদ্যাদান সম্বন্ধেই আগে বিচার করে দেখতে হয় বিদ্যাদাতার যোগ্যতা আছে কি না এবং গ্রহীতাও বিদ্যা গ্রহণের অধিকারী কি না। তা নাহলে বিদ্যাদান সার্থক হয় না। শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক জ্ঞান না থাকলে সে শিক্ষা সে গ্রহণ করতে পারে না। সেইজন্য কি রকম অধিকারীকে কোন্ প্রণালীতে এই বিদ্যা দিতে হবে এখানে শাস্ত্র সেই কথাই বলছেন। বলছেন —'বিদ্যা সম্প্রদানবিধি প্রদর্শনেন' —বিদ্যাসম্প্রদানবিধির প্রদর্শন করে অর্থাৎ কি প্রকারে বিদ্যা অপরকে প্রদান করতে হবে সেকথা বলে এই উপনিষদ্‌টির উপসংহার করা হচ্ছে। বলছেন, যাঁরা 'শ্রোত্রিয়া' মানে বেদাভ্যাসকারী, 'ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ' অর্থাৎ বেদাভ্যাস করেই যাঁরা ক্ষান্ত নন উপরন্তু যাঁরা ব্রহ্মপরায়ণ এবং 'স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং' —একর্ষি নামক অগ্নিতে যাঁরা আহুতি দেন অর্থাৎ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতারা এবং যাঁরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাঁদেরই এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করবে। এঁদের সম্বন্ধে আরও বলা হচ্ছে, যাঁরা নিয়মপূর্বক শিরোব্রত আচরণ করেছেন অর্থাৎ মাথায় অগ্নিধারণরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করেছেন তাঁদেরই এই বিদ্যা বলবে। অর্থাৎ বেদাভ্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, একর্ষি নামক অগ্নিতে আহুতি দানকারী এবং যাঁরা শিরোব্রত অনুষ্ঠান করেছেন তাঁদেরই ব্রহ্মবিদ্যা দান করতে হবে, এই হলো বিধি। পূর্ব পূর্ব আচার্যরা এইরকম অনুষ্ঠান করে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছেন সেই পরম্পরাটির কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

এখন কথা হচ্ছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য অন্যত্রও তো এরকম অন্য বিধির কথা রয়েছে। যেমন, সাধন চতুষ্টয়, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ-বিরাগ, শমদমাদি প্রভৃতি ছয়টি সাধন সম্পদ এবং মুমুক্ষুত্ব —এইগুলি যাঁদের হয়েছে তাঁরাই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। তাহলে প্রশ্ন এই, যাঁরা উপরোক্ত আচরণের অনুষ্ঠাতা নন বা যাঁদের এই সাধন চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান হয়নি তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যার জন্য চেষ্টা করবেন না, এই কি শাস্ত্রের বিধান ? তা নয়, উপযুক্ত ফললাভের জন্য এইগুলির প্রয়োজন তবে তার পূর্বেও নিশ্চয়ই শাস্ত্রপাঠ করা চলবে। কারণ শাস্ত্রপাঠ করেই তো জানা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য এইগুলি প্রয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পড়া এক আর পড়ে লাভবান হওয়া আর এক কথা। যদি লাভবান হতে চাই, পরম সিদ্ধি পেতে চাই তবে কতকগুলি বিশেষ বিধি পালন করতে হবে, এই হলো মন্ত্রের অর্থ। এমনকি একর্ষি, শিরোব্রত ইত্যাদির অনুষ্ঠানও সকলের জন্য নয়, যাঁরা এই বিশেষ বৈধী রীতিতে অগ্রসর হতে চান তাঁদের পক্ষেই এইগুলি অনুষ্ঠেয়। তবে সাধন চতুষ্টয় সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য, এর কোন বিকল্প নেই। বেদাভ্যাস না করলেও ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে কিন্তু এই সাধন চতুষ্টয় না থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না।

'তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ। নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥' (৩।২।১১)

তৎ (সেই) সত্যম্ (সত্যস্বরূপ) এতৎ (এই অক্ষর পুরুষকে) পুরা (পূর্বকালে) অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরা) ঋষিঃ [শৌনকের কাছে] উবাচ (বলেছিলেন)। অচীর্ণব্রতঃ (যে ব্রত আচরণ করেনি সে) এতৎ (এই গ্রন্থ) ন অধিতে (পাঠ করে না)। পরম ঋষিভ্যঃ (পরম ঋষিদিগকে) নমঃ (নমস্কার)। পরমঋষিভ্যঃ নমঃ (পরম ঋষিদের নমস্কার)।

অঙ্গিরা ঋষি সেই সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষ-বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। যে চীর্ণব্রতের অনুষ্ঠান করেনি সে এই গ্রন্থ পাঠ করবে না। পরম ঋষিদের নমস্কার, পরম ঋষিদের নমস্কার।

অঙ্গিরা ঋষি প্রাচীনকালে এই উপদেশ দিয়েছেন। যে চীর্ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করেনি সে এই বিদ্যার অভ্যাস করবে না। যাঁরা এই পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন তাঁরাই হলেন পরম ঋষি। সেই পরম ঋষিদের বার বার প্রণাম জানানো হয়েছে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি বোঝাবার জন্য।

নির্দেশিকা

শ্লোক	পৃঃ
অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী	(২।১।৪)-৫৮
অতঃ সমুদ্রা	(২।১।৯)-৬৭
অথর্বণে যাং	(১।১।২)-২
অরা ইব রথনাভৌ	(২।২।৬)-৯০
অবিদ্যায়ামন্তরে	(১।২।৮)-৩৯
অবিদ্যায়াং বহুধা	(১।২।৯)-৪০
আবিঃ সন্নিহিতং	(২।২।১)-৭০
ইষ্টাপূর্তং	(১।২।১০)-৪২
এতস্মাজ্জায়তে	(২।১।৩)-৫৫
এতেষু যশ্চরতে	(১।২।৫)-৩২
এষোঽণুরাত্মা	(৩।১।৯)-১২৯
এহ্যেহীতি তম্	(১।২।৬)-৩২
কামান্ যঃ কাময়তে	(৩।২।২)-১৩৫
কালী করালী চ	(১।২।৪)-৩১
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া	(৩।২।১০)-১৫৬
গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ	(৩।২।৭)-১৪৭
তত্রাপরা ঋগ্বেদো	(১।১।৫)-৬
তদেতৎ সত্যমৃষি	(৩।২।১১)-১৫৭
তদেতৎ সত্যম্ মন্ত্রেষু	(১।২।১)-১৯
তদেতৎ সত্যম্ যথা	(২।১।১)-৫২
তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্	(৩।২।১০)-১৫৬
তপঃশ্রদ্ধে যে	(১।২।১১)-৪৪
তপসা চীয়তে ব্রহ্ম	(১।১।৮)-১২
তস্মাচ্চ দেবা বহুধা	(২।১।৭)-৬৬
তস্মাদগ্নিঃ সমিধো	(২।১।৫)-৬২
তস্মাদৃচঃ সাম	(২।১।৬)-৬৫
তস্মৈ স বিদ্বান্	(১।২।১৩)-৫১
তস্মৈ স হোবাচ	(১।১।৪)-৫
দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ	(২।১।২)-৫৩
দ্বা সুপর্ণা সযুজা	(৩।১।১)-১০৪
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে	(১।১।৪)-৫
ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং	(২।২।৩)-৮১
ন চক্ষুষা গৃহ্যতে	(৩।১।৮)-১২৬
ন তত্র সূর্যো ভাতি	(২।২।১০)-১০০
নায়মাত্মা প্রবচনেন	(৩।২।৩)-১৩৯
নায়মাত্মা বলহীনেন	(৩।২।৪)-১৪১
পরীক্ষ্য লোকান্	(১।২।১২)-৪৬
পুরুষ এবেদং বিশ্বং	(২।১।১০)-৬৮
প্রণবো ধনুঃ শরো	(২।২।৪)-৮২
প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব	(৩।১।৪)-১১৫
প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া	(১।২।৭)-৩৪
বৃহচ্চ তদ্দিব্যম্	(৩।১।৭)-১২২
ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ	(১।১।১)-১
ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্	(২।২।১১)-১০১
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ	(২।২।৮)-৯৩
যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম	(১।১।৬)-৯
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ	(৩।২।৮)-১৫১
যথা সুদীপ্তাৎ	(২।১।১)-৫২
যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে	(১।১।৭)-১১
যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ	(২।২।২)-৭৯
যদা পশ্যঃ পশ্যতে	(৩।১।৩)-১০৯
যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ	(১।২।২)-২৮
যং যং লোকং মনসা	(৩।১।১০)-১৩২
যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী	(২।২।৫)-৮৮
যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শম্	(১।২।৩)-২৯
যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্	(২।২।৭)-৯১
বেদান্তবিজ্ঞান	(৩।২।৬)-১৪৪
শৌনকো হ বৈ মহা	(১।১।৩)-৩
সত্যমেব জয়তে নানৃতং	(৩।১।৬)-১২১
সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ	(৩।১।৫)-১১৮
সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি	(২।১।৮)-৬৬
সমানে বৃক্ষে পুরুষো	(৩।১।২)-১০৭
সম্প্রাপ্যৈ এনম্ ঋষয়ঃ	(৩।২।৫)-১৪৩
স যো হ বৈ তৎ পরমং	(৩।২।৯)-১৫৪
স বেদৈতৎ পরমং	(৩।২।১)-১৩৪
হিরণ্ময়ে পরে কোশে	(২।২।৯)-৯৯